গোয়েন্দার চোখ ২০১৫

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

গোয়েন্দার চোখ
২০১৫
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

প্রকাশক : কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

সম্পাদনা : মোঃ তারেক মাহমুদ (সহকারী পরিচালক)
শেগুফতা মাহজাবীন (সহকারী পরিচালক)
ও
উম্মে নাহিদা আক্তার (সহকারী পরিচালক)

আলোকচিত্র : উম্মে নাহিদা আক্তার (সহকারী পরিচালক)

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : তারুণ্য, ৩১ (২য় তলা) পুরানা পল্টন, ঢাকা

ফোন : ০১৮১৮০৩৮২২৬, ০১৫৫৯৫৭৯৫৫৫

মুদ্রণ : প্রিন্ট ডট, ৩১ (২য় তলা) পুরানা পল্টন, ঢাকা

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৫

নিরাপদ বাণিজ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

কাস্টমস গোয়েন্দা

মাননীয় মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সাফল্যের ধারাবাহিকতায় কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অনবদ্য প্রকাশনা 'গোয়েন্দার চোখ, ২০১৫' এর দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের গোয়েন্দা নজরদারির পাশাপাশি মননশীল প্রকাশনার এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আশা করি গোয়েন্দা নজরদারি ও চোরাচালান প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত এ প্রকাশনাটি আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ করবে।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর নিরলস কর্মতৎপরতার মাধ্যমে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং করছে তা সকলের গোচরে আনতে এ প্রকাশনাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের এ প্রকাশনাটি কাস্টমস সংক্রান্ত সকলকে চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকির অপচেষ্টা প্রতিরোধের কৌশল জানানোর মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ ও এ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টিতে পর্যাপ্ত রসদ সরবরাহ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে, এ প্রকাশনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ কাস্টমস সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যক্রম আরও বেগবান হবে এবং রাজস্ব সুরক্ষায় প্রহরী হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

[আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি]

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রকাশনা 'গোয়েন্দার চোখ, ২০১৫' এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে দপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীর প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন রইল। অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে জানার জন্য গত বছরের মত এ বছরের সংকলনটিও আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল হবে বলে আমি আশা করি।

গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধের পাশাপাশি এ ধরনের মননশীল প্রকাশনা সত্যিই প্রশংসনীয়। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতার খণ্ডচিত্র এ প্রকাশনাটির মাধ্যমে চিত্রিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

চোরাচালান ও কাস্টমস সংক্রান্ত সকল প্রকার অপরাধ দমনে এ দপ্তরের সাহসী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। নানা ধরনের অপরাধ অর্থায়নের মূল মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত স্বর্ণচোরাচালান প্রতিরোধে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের তৎপরতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে, এ মননশীল উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

[এম. এ. মান্নান, এমপি]

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সাফল্যের ধারাবাহিকতায় 'গোয়েন্দার চোখ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। চিন্তন ও মননশীলতার অনবদ্য রূপায়ণের ভাষারূপ এ প্রকাশনাটি প্রথম সংখ্যার দ্বারা সকলকে যেভাবে মুগ্ধ করেছে, তেমনিভাবে এ সংখ্যার দ্বারাও আমাদের সকলকে ঋদ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সৃজনশীল যে কোনো উদ্যোগই নব অভিযাত্রায় প্রেরণা জোগায়। আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অনন্য নিদর্শন এ সংখ্যাটিও যেন জ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীলতার পথকে আরও সুগম করে, এটাই আমি প্রত্যাশা করি। গোয়েন্দা নজরদারির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থাকার পরও এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে এ জাতীয় প্রতিবেদনমূলক প্রকাশনায় অবদান রাখছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁদের এ মননশীল উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

একই সাথে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর যেভাবে পেশাদারিত্ব, ক্ষিপ্রতা ও চৌকস কার্যক্রমের মাধ্যমে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনে ভূমিকা রেখে নন্দিত হয়েছে তেমনিভাবে এ সমৃদ্ধ প্রকাশনাটিও সর্বমহলে প্রশংসিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই সাথে এই অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব সাফল্য সকলের নজরে আনতে এটি মুখপত্র হিসেবে কাজ করবে বলে আমি আশা করি।

পরিশেষে এ সংখ্যা প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

[মো. নজিবুর রহমান]

মহাপরিচালক
কাস্টমস গোয়েন্দা
ও
তদন্ত অধিদপ্তর

বাণী

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে প্রথম 'গোয়েন্দার চোখ' প্রকাশিত হয়েছিল, যা সর্বস্তরের সুধীমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এরই মাঝে সাফল্যের পথ ধরে কাস্টমস গোয়েন্দার অগ্রযাত্রা মুহূর্তকালের জন্যও থেমে থাকেনি। সার্বিক গোয়েন্দা কার্যক্রমের যুক্তিসংগত প্রতিফলনের ব্রত নিয়ে গত বছরে প্রকাশিত 'গোয়েন্দার চোখ'-এর বিপুল পাঠকসাফল্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আরও গঠনমূলক রূপরেখায় এর পরবর্তী প্রযোজনা সম্পন্ন করতে সকল স্তরের পাঠক ও সমালোচক, যাঁরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেছিলেন, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অধিদপ্তরের দ্বিতীয় প্রকাশনা উপলক্ষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কাস্টমস অধিক্ষেত্রের নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ না থেকে কাস্টমস আইনানুযায়ী রাষ্ট্রের পুরো সীমানাকে নিজের অধিক্ষেত্র বিবেচনায় কাস্টমস গোয়েন্দা বিচরণ করেছে। রাষ্ট্রের যেকোনো প্রান্তে, যেকোনো স্থানে, কাস্টমস-সংক্রান্ত সকল প্রকার অপরাধ দমনে ক্ষিপ্র ও চৌকস গোয়েন্দার দল দ্রুততার সাথে অভিযান চালিয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাস্টমস গোয়েন্দার যে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত ভূমিকা তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও সফলতার রূপরেখা উপস্থাপনের এ প্রয়াস আমাদের আত্মপ্রণোদনার জন্য যেমন জরুরি, তেমনি আত্মবিশ্লেষণের জন্যও কার্যকরী।

আরও ক্ষিপ্রতা ও গতিশীলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আগামীর পথে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

[ড. মইনুল খান]

সম্পাদকীয়

বর্ষ পরিক্রমায় আবারও ফিরে এসেছে ‘গোয়েন্দার চোখ’। বছরব্যাপী পরিচালিত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি বিগত বছরগুলোর অর্জনের সাথে তুলনামূলক আত্মবিশ্লেষণ আমাদের এই প্রতিবেদনধর্মী প্রকাশনার মূল লক্ষ্য। অব্যাহত অগ্রযাত্রার পথে খানিক থেমে, একটু পেছনে ফিরে কতটা পথ আমরা এগিয়েছি তা ঘুরে দেখার বিশ্লেষণাত্মক প্রয়াস হিসেবে এটিকে অভিহিত করা যায়। তবে, সৃষ্টিশীলতার নান্দনিকতা বা শৈল্পিক রসবোধহীন নিতান্তই দাপ্তরিক প্রযোজনরূপে এ প্রকাশনাকে ধরে নিয়ে কেবল বার্ষিক প্রতিবেদন হিসেবে আখ্যা দেয়াটা সমীচীন হবে না। কারণ, বইটির মলাটের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত; সাফল্য, ব্যর্থতা ও অর্জনের চুলচেরা হিসেব নিকেশের চক্রে সীমাবদ্ধ না থেকে, সযতনে বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক রূপটিকে এখানে আমরা এড়িয়ে গেছি। প্রাতিষ্ঠানিক পাঠকসীমার ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে, পাঠকবান্ধব সর্বজনীনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এর সাথে মেলানো হয়েছে সিম্বলিজম, এক্সপ্রেশনিজম ও ইম্প্রেশনিজমের মতো বহুমাত্রিক নান্দনিক উপাদান। এর ফলে কাস্টমস গোয়েন্দার সুবিশাল কর্মযজ্ঞের দ্বিমাত্রিক প্রযোজনার পরিবর্তে গোয়েন্দা কার্যক্রমের

থ্রিল, রোমাঞ্চ ও অ্যাডভেঞ্চারাস ইফেক্টের পরিপূর্ণ বহুমাত্রিকতাকে এ প্রকাশনার মূল উপজীব্য করে পাঠক অনুভূতিতে ভিন্নধর্মী এসথেটিক প্রভাব সৃষ্টির ব্যতিক্রম ও সচেতন প্রচেষ্টা ছিল আমাদের। কতটুকু সফল বা ব্যর্থ হয়েছি, তা জানতে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের কাম্য। যাঁদের কাস্টমস ও গোয়েন্দা-বিষয়ক লেখনী দ্বারা আমাদের এই সংকলন সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল হয়েছে তাঁদের প্রতি রইল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

কাস্টমস গোয়েন্দা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে আগামীর পথে। বছর ঘুরে তাই আবারও আসবে 'গোয়েন্দার চোখ'। আমাদের প্রত্যয় ও প্রত্যাশার প্রাত্যহিক গোয়েন্দা সমীকরণ আবারও খুঁজে নেবে সৃষ্টিধর্মী কোন রূপ। তবে ভালোলাগা, মন্দলাগার গঠনমূলক স্পষ্টীকরণ আগামীতে আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।

সবার জন্য রইল আন্তরিক অভিনন্দন।

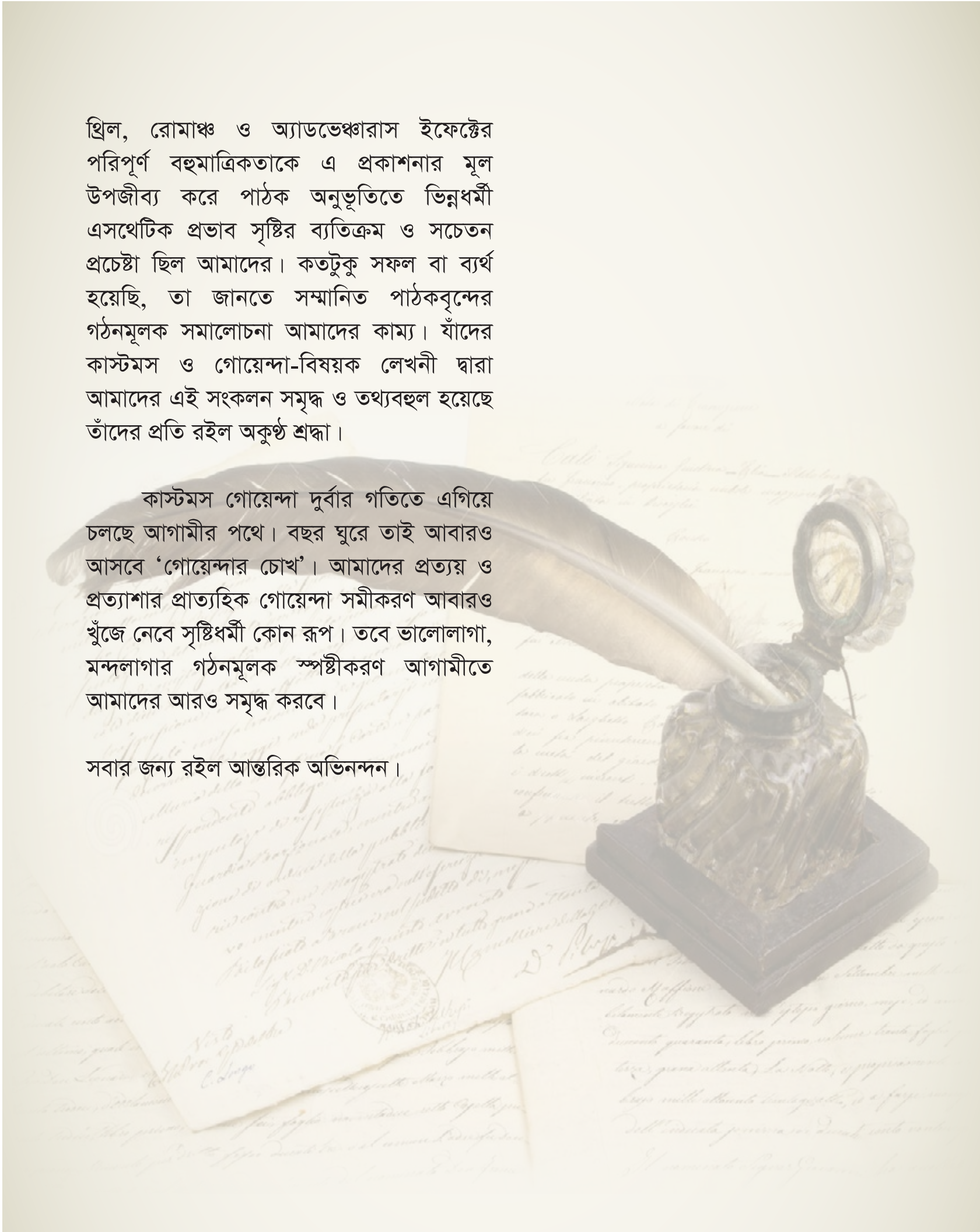

সূচি

গোয়েন্দা কার্যক্রম

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর: ভিশন ও মিশন ১৮-২১

নতুন ভূমিকায় কাস্টমস গোয়েন্দা- ড. মইনুল খান ২২-৩২

কাস্টমস গোয়েন্দার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম- শেওফতা মাহজাবীন ৩৩-৪০

Bangladesh Country Report to RILO AP, 2014- Dr. Moinul Khan ৪১-৫০

লেন্স অব মিডিয়া- উম্মে নাহিদা আক্তার ৫১-৬৪

বুলেটিন বোর্ড ৬৫-৮২

গোয়েন্দা কাহিনি ও প্রবন্ধ

আমি কাস্টমস সার্ভিস অফিসার ছিলাম- আবু হেনা ৮৩-৮৯

একাত্তরের মার্চে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস- আবদুল লতিফ সিকদার ৯৩-১০২

গোয়েন্দারা কেমন করে কাজ করে- আলী আহমদ ২০৩-১০৬

The Importance of Intelligence for Customs- Andrew Allan ১০৭-১১৩

ফলোআপ- শাহাবুদ্দীন নাগরী ১১৪-১২০

ইনফো-১১- মো. জামাল হোসেন ১২১-১২৮

Enforcement of TRIPS Agreement and the Role Customs Can Play in Detections and Seizures of Infringement- Dr. Md Khairuzzaman Mozumder ১২৯-১৩৭

সর্ববৃহৎ কোকেন চালান উদ্ধারের নেপথ্যে- ড. মইনুল খান ১৩৮-১৫১

এলেবেলে- আনোয়ার সেলিম ১৫২-১৫৮

সূচি

Advance Rulings as a Trade Facilitation Measure- Dr. Mohammad Abu Yusuf	১৫৯-১৬৮
বিমানবন্দরে কাস্টমস চেকিং: একজন যাত্রীর প্রস্তাব- মুহম্মদ জাকির হোসেন	১৬৯-১৭২
স্মাগলার মাইকেল চ্যাং- অরুণ কুমার বিশ্বাস	১৭৩-১৮৬
Cross-Border Trade and the Issues of Interconnectedness and Integration- Shakila Pervin	১৮৭-১৯১
(Un)customary Musings.....- Nusrat Jahan Shompa	১৯২-১৯৮
তৃতীয় নয়ন- মো: তারেক মাহমুদ	১৯৯-২০২
দ্য ওয়ান ম্যান আর্মি- উম্মে নাহিদা আক্তার	২০৩-২০৮
গোয়েন্দার চোখ ও একটি কালো পুঁটলি- রাহমান ওয়াহিদ	২০৯-২১৫
রাজস্ব আহরণে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির ভূমিকা- মো. হেলাল হাসান	২১৬-২২০

গোয়েন্দা কার্যক্রম

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

ভিশন ও মিশন

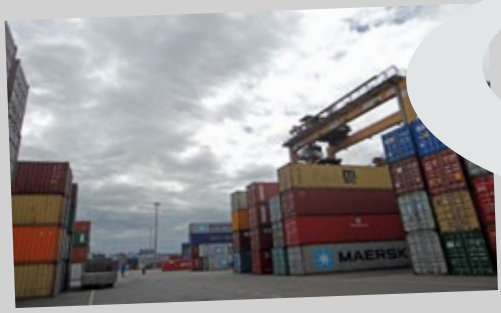

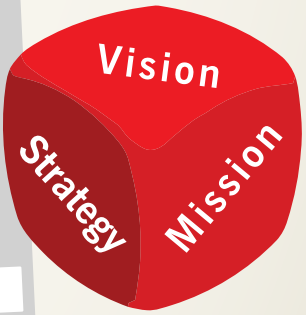

দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমরা সীমান্ত দ্বার উন্মুক্ত করি আবার অনঅভিপ্রেত পণ্য আমদানি-রপ্তানি রোধ করতে আমরা সীমান্ত পথ রুদ্ধ করি। পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটো কাজের মধ্যে বাস্তবসম্মত ভারসাম্য নিশ্চিত করা দেশের অর্থনীতির স্বার্থে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । অভ্যন্তরীণ স্বার্থে প্রণীত আইন ও বিধানাবলির সাথে আন্তর্জাতিক আইনের বিধানাবলির যৌক্তিক মেলবন্ধন ঘটিয়ে, দক্ষভাবে বিধানাবলি সমুন্নত রেখে, সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয় কাস্টমস প্রশাসনকে। বাংলাদেশ কাস্টমস প্রশাসনও বিশ্ব কাস্টমস অঙ্গনের গর্বিত অংশীদার হিসেবে বাণিজ্য উদারীকরণ এবং অপবাণিজ্যরোধে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনের মাধ্যমে বাণিজ্য উদারীকরণ এবং অপবাণিজ্য রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হিসেবে ইতোমধ্যেই সুনাম কুড়িয়েছে। দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষ দপ্তর হিসেবে কাস্টমস সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ এবং অপতৎপরতার মূলোৎপাটনে এ দপ্তর অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশিত এবং স্বতপ্রণোদিত গোয়েন্দা অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে এ দপ্তরের তৎপরতা লক্ষণীয়। তবে, সম্প্রতি এ দপ্তরের ভিশন, মিশন, স্ট্র্যাটেজি ও অ্যাকশন প্ল্যানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও সুসংহত, আধুনিক ও যুগোপযোগী হয়েছে।

সময়ের বিবর্তনে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে অপরাধ প্রবণতাও বেড়েছে। যোগ হয়েছে অপরাধের নতুন কৌশল, সৃষ্টি হয়েছে নিত্য নতুন জটিলতা। সরাসরি অর্থের সংশ্লেষ থাকায় কাস্টমসের অধিক্ষেত্রে অপরাধের প্রবণতায় ক্রমশ দেখা যাচ্ছে ব্যাপক বৈচিত্র ও অভিনবত্ব। তাই, কেবল শুল্ক ফাঁকির কৌশল সংক্রান্ত তথ্যের পেছনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় না করে কাস্টমস গোয়েন্দার মনোযোগ এবং দৃষ্টি এখন নতুন ডাইমেনশনের দিকে। এক্ষেত্রে ইনফরমেশনের উপর সরাসরি নির্ভর না করে, ইনফরমেশনের বস্তুনিষ্ঠ এ্যানালাইসিস, সিনথেসাইজ এবং ক্লাসিফিকেশন শেষে ইন্টেলিজেন্সে রূপান্তর করা হয়।

ব্যাপারটা অনেকটাই সুডোকুর ধাঁধা মেলানোর মতো। বাণিজ্য উদারীকরণের স্বার্থে এ ধাঁধা মেলানোর পরিশ্রমটুকু করা কাস্টমস গোয়েন্দার অন্যতম কাজ। কারণ, ইনফরমেশন যতক্ষণ ইন্টেলিজেন্সে রূপান্তরিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল ইনফরমেশনের উপর নির্ভর করে মাঠে নামলে একজন অপরাধীকে শনাক্ত করতে গিয়ে অসংখ্য নিরপরাধীকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এতে ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ বজায় রেখে স্বাভাবিক ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশ কাস্টমসের মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো। একই সাথে শুল্ক ফাঁকি ও চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও স্থানীয় বাজারের স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারীদের নিবৃত্ত করে প্রচলিত কাস্টমস আইনের আওতায় ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধ্য করাও কাস্টমস গোয়েন্দার অন্যতম দায়িত্ব। বাণিজ্য উদারীকরণকে যথাসম্ভব নিশ্চিত এবং স্থিতিশীল ব্যবসায় পরিবেশ বজায় রাখতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর অত্যন্ত সচেষ্ট। আর তা করতে, ইনফরমেশনকে ইন্টেলিজেন্সে রূপান্তরকরণ প্রথম শর্ত। এরপর ইন্টেলিজেন্সকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় পরবর্তী তদন্ত।

কেবল শুল্ক ফাঁকি প্রতিরোধই নয়, স্বর্ণ, মুদ্রা, মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যসহ যেকোন প্রকারের চোরাচালান প্রতিরোধে অব্যাহত গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। দেশের অভ্যন্তরীণ গণ্ডি পেরিয়ে এ তৎপরতা এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপৃত হয়েছে। ন্যাশনাল কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট হিসেবে গোপনীয় তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণে এ দপ্তর অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করে বাংলাদেশ কাস্টমসের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনের গুরুভার দক্ষতার সাথে বহন করে চলেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে কাস্টমস সংক্রান্ত অনিয়ম ও কাস্টমস আইন বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রতি সুতীক্ষ্ণ গোয়েন্দা দৃষ্টি রাখা এবং তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মূল ভিশন।

অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রমগুলো হলো

১। চোরাচালান এবং কাস্টমস সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধ ও জালিয়াতি প্রতিরোধ; কাস্টমস সংক্রান্ত আইন অমান্যের কারণে পণ্য আটক, বাণিজ্যিক জালিয়াতি, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অর্থপাচার এবং কাস্টমস আইনের অন্যান্য লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তদন্তকাজ পরিচালনা;

২। মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য, জালমুদ্রা, মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত পণ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ, জীববৈচিত্র সম্পন্ন বন্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি, মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর পণ্য, অস্ত্র, বিস্ফোরকদ্রব্য পাচার রোধ; এবং চোরাচালান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রোফাইলিং; তথ্য আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করা;

৩। বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ; অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সম্পর্কে বিভিন্ন সভা, কর্মশালা এবং সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা;

৪। সমন্বিত নীতিমালা প্রয়োগ ও যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য বিভিন্ন শুল্ক ভবন/শুল্ক স্টেশন বা কোন শুল্ক এলাকায় সংঘটিত অপরাধ ও বিচ্যুতি সংক্রান্ত গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

এই কার্যক্রমসমূহ নিম্নবর্ণিত আইনের আওতায় সম্পন্ন করা হয়

- ❑ দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯;
- ❑ অ্যালাইড অ্যাক্টস;
  - ❖ আর্মস অ্যাক্ট, ১৮৭৮;
  - ❖ এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স অ্যাক্ট, ১৯০৮;
  - ❖ আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) অ্যাক্ট, ১৯৫০;
  - ❖ ক্রিমিনাল আইন (সংশোধিত) ১৯৫৮;
  - ❖ Agricultural Produce Cess Act, 1940;
  - ❖ Foreign Exchange Regulation Act, 1947;
  - ❖ Wild Life Crime Prevention Act, 2012;
  - ❖ Prevention of Money Laundering Act, 2012;

এই দপ্তরের ভিশনকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে কাস্টমস সংক্রান্ত অনিয়ম ও কাস্টমস আইন বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রতি সুতীক্ষ্ণ গোয়েন্দা দৃষ্টি রাখা এবং তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মূল ভিশন।

আর এই ভিশনকে বাস্তবায়িত করার জন্য এ দপ্তরের মিশন নিম্নরূপ

- ❑ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায়ে অন্যান্য ফাংশনাল দপ্তরকে সহায়তা প্রদান করা;
- ❑ কাস্টমস অপরাধ ও অন্যান্য অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধ ও অপরাধীদের শনাক্ত এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা;
- ❑ চোরাচালানসহ জনস্বার্থ ও জননৈতিকতা বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ করা;
- ❑ জাতীয় নিরাপত্তা (বিধ্বংসী অস্ত্র, গোলাবারুদ, পারমাণবিক বর্জ্য ইত্যাদি আমদানি প্রতিরোধ) ও সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কোনো পণ্য আমদানি প্রতিরোধ নিশ্চিত করা।

নতুন ভূমিকায় কাস্টমস গোয়েন্দা

ড. মইনুল খান

কাস্টমস কি কেবল রাজস্ব আহরণ করে? রাজস্ব-নির্ভরতাই এর মূল কাজ? দেশের উন্নয়নে রাজস্ব প্রয়োজন। কিছুদিন আগেও কাস্টমস থেকে সবচেয়ে বড় অঙ্কের রাজস্ব আহরণ হতো। আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং বর্তমান বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে এই রাজস্ব নির্ভরতার গুরুত্ব কমে এসেছে। অতীতের সর্বোচ্চ উৎসের এ খাতটি রাজস্ব আহরণের ক্রমহ্রাসে প্রশ্ন উঠে এসেছে, এর গুরুত্ব কি কমে গেছে? পাশাপাশি এর অন্য ভূমিকার বিষয়টি কি গৌণই থেকে যাবে?

বিশ্বব্যাপি কাস্টমস এর রাজস্ব-নির্ভরতার ভূমিকা সীমিত হয়ে আসছে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশের কাস্টমস ডিউটি তত কম। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ডিউটি হার ৫%। বাংলাদেশে এর হার ২৫%। এর উপর আছে আবার অন্যান্য সংযুক্ত ট্যাক্স (যেমন আরডি)। রাজস্ব-নির্ভরতা কমে গেলেও কাস্টমস ওইসব দেশে শক্তিশালী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। দেশের সীমান্ত ফোর্স হিসেবে এবং নানা কাস্টমস অপরাধ নিবৃত্ত করতে এ সংস্থার কার্যক্রম জোরালোভাবে উচ্চারিত। যুক্তরাষ্ট্রে কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন ফোর্স হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অধীন একটি এলিট সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এদের দেশের অভ্যন্তরে নানা অপরাধ দমন ও প্রতিকারে রয়েছে জোরালো ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এদের অবদান উচ্চারিত। বাংলাদেশে কাস্টমস এর ভবিষ্যৎ কী? এর উত্তর খোঁজার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে এত দিন কাস্টমস-এর মূল ভূমিকা ছিল রাজস্ব আহরণ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৭২ সালে কাস্টমস-এর অবদান ছিল প্রায় ৮০%, ২০০০ সালে এটি কমে হয় ৪০%। বর্তমানে হয়েছে ২৫%। যদিও শতকরা হারে এটি কমেছে, কিন্তু শুল্কহার ব্যাপকভাবে হ্রাস সত্ত্বেও প্রকৃত কাস্টমস রাজস্ব আহরণ বেড়েছে।[১] আয়কর ও মূসক রাজস্বের পরিমাণ বেড়েছে আনুপাতিক হারে। এটি আর্থনীতিক গতি-প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। অর্থনীতিবিদদের মতে, কাস্টমস- এর উপর রাজস্ব-নির্ভরতা দেশের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা হ্রাস করে। অন্যদিকে, ধনী-গরিব সকলকে এই ট্যাক্সের বোঝা বইতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির সক্ষমতা নির্ধারণে এটি সুবিচার করতে পারে না। অস্ট্রেলিয়ার সেন্টার ফর কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ স্টাডিজের পরিচালক ডেভিড উইডোসনের মতে, কাস্টমস-এর সনাতনী ভূমিকা রাজস্বনির্ভর 'গেটকিপার'-এর ভূমিকা বর্তমান যুগে অচল। তাঁর মতে, বাণিজ্য সহায়ক ও তা বৃদ্ধিতে কাস্টমস-এর নতুন ভূমিকাকে সামনে নিয়ে এসেছে।[২]

[১]১৯৭২ সালে সর্বোচ্চ শুল্কহার ছিল ২০০%। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫%। ১৯৭২ সালে শুল্ক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি টাকা, ২০০০ সালে ৫০০০ কোটি টাকা, ২০১৩-২-১৪ সালে তা ২৪,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। সূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[২]ডেভিড উডোসন, ২০০৭, 'দি চেঞ্জিং রোল অব কাস্টমস: ইভোলুশ্যন অর রেভ্যুলিউশন, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস জার্নাল, ভলিয়ুম-১, নম্বর ১, পৃষ্ঠা: ৩১-৩৭.

এর মানে এই নয় যে, কাস্টমস কোনো রাজস্ব আহরণ করবে না। কাস্টমস নিজে রাজস্বনির্ভর না হয়ে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করে। আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলে দেশিয় করাদিও (আয়কর, মূসক) বেড়ে যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেসব শিল্পায়ন দেশের জন্য সহায়ক সেগুলোর কাঁচামাল ও মেশিনারিজ নিম্ন শুল্ক আরোপ করে উৎসাহিত করা এবং যেগুলো অনাহুত সেগুলোতে উচ্চ হারে শুল্ক বসিয়ে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশিয় স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা। ফলে সরাসরি রাজস্ব আহরণ না করলেও দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ করে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আবার একইভাবে, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য আমদানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে কাস্টমস। অন্যদিকে, দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ পণ্য যেমন অস্ত্র, ড্রাগস, স্বর্ণসহ অন্যান্য চোরাচালানকৃত পণ্য ঠেকাতে কার্যকর চোরাচালানবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ কাস্টমস। চোরাচালানকৃত পণ্য দেশের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিবেশের যেমন ক্ষতি করে, তেমনি নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদ, আন্তমহাদেশিয় অপরাধ ও চোরাচালানের যোগসূত্রের বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অন্যতম গবেষক শেলি লুইস (২০০৭) এগুলোর মধ্যে অতীতের তুলনায় অধিক হারে পারস্পরিক যোগসাজশ খুঁজে পেয়েছেন।[৩] এ বিষয়টি কাস্টমস-এর নতুন ভূমিকাকে জোরদার করবে। চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকির অর্থে সন্ত্রাস ও আন্তমহাদেশিয় অপরাধে অর্থ বিনিয়োগ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান, আটক ও তদন্ত করার জন্য সক্ষমতা সৃষ্টির গুরুত্ব উঠে এসেছে। বাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থ পাচার বর্তমান সময়ের আলোচিত বিষয়। এক্ষেত্রেও কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এগুলোর প্রয়োজনীয় তদন্ত এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে। মোদ্দাকথা, নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাস্টমস দেশের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'সুইচ-বাটন' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে। দেশের ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্পায়ন, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ দেশের সার্বিক নিরাপত্তার বিধান করবে নতুন ভূমিকায়।

এ প্রসঙ্গে বর্তমানে অপ্রচলিত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কাস্টমস-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় নিরাপত্তার ধারণায় গুণগত পরিবর্তন এসেছে। এক দেশ অন্য দেশ দখল করে নেবে এ ধারণা বর্তমানে অচল। কোনো দেশ অন্য দেশের ভূখণ্ড দীর্ঘমেয়াদে দখলে রাখতে পারে না। ১৯৭৯ সালে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তান দখল ও পরে প্রতিরোধের মুখে সেখান থেকে প্রত্যাহার এর বড় উদাহরণ। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় দেশের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা, অর্থনীতির ভিতকে সুরক্ষা দেয়া, প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যবসায়-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা, জানমালের ক্ষতি রোধ করা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করাসহ জনকল্যাণে রাষ্ট্র কর্তৃক গুরুত্বের বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচ্য। এসব অপ্রচলিত ধারণায় কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাস্টমস আইন ও এ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহযোগী আইন প্রয়োগ করে এই ভূমিকাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশে কাস্টমস গোয়েন্দা এই নতুন ভূমিকাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছে। অন্যান্য দেশের উদাহরণ, দেশের বাস্তবতা এবং প্রচলিত আইনকানুনের আলোকে একে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত দুই বছরে এই উদ্যোগের ফলাফলও দৃশ্যমান হয়েছে। যেসব উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান। 'নিড এনালাইসিস' করে দেখা গেছে কর্মরত কর্মকর্তাদের গোয়েন্দা বিষয়ে কোনো বাস্তব ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ নেই। কর্মরত কর্মকর্তারা কাস্টমস স্টেশনে বিল অব এন্ট্রির পেছনে ছুটছেন। ওজন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করছেন। ভ্যালু দেখছেন, খালাস দেখছেন। মাঝে মধ্যে ম্যানিফেস্ট ধরে কিছু রাজস্ব বাড়িয়েছেন। কাস্টমস স্টেশনে একজন কাস্টমস অফিসার যা করেন গোয়েন্দা কর্মকর্তার কাজ তার মধ্যে সীমিত থাকছে। অথচ ফাংশনাল কাস্টমস হাউস এই বিষয়ে যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ বিষয়ে তারাই যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তাদের এই নিত্যনৈমিত্তিক কাজে যুক্ত হয়ে বাড়তি ধাপ তৈরি করা গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মূল কাজের মধ্যে পড়ে কি না তা ভেবে দেখা হলো।

[৩]Shelley, L. 2005. 'The unholy trinity: transnational crime, terrorism, and corruption', the *Brown Journal of World Affairs,* vol. XI, Issue 2, Winter/Spring, p.104; Makarenko, T 2005. 'Terrorism and Transnational Organized Crime: Tracing the Crime-Terror Nexus in the Southeast Asia', in Smith P. J. (ed.) *Terrorism and violence in Southeast Asia: transnational challenges to states and regional stability,* New York: ME Sharpe.

একটা স্টেশনে একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা একটা চালান লক দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করার পর যে অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণের অঙ্ক দেখালেন তা নিতান্তই 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি' পর্যায়ের প্রতিভাত হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার ছিল। এর জন্য 'মাইন্ডসেট'-এ একটা বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। একটা বিশেষ গোয়েন্দা ট্রেনিং-এর আয়োজন করা হলো। আনা হলো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রশিক্ষকদের। আমন্ত্রণ করে আনা হলো বিশেষজ্ঞদের। একটানা প্রশিক্ষণের পর কাস্টমস গোয়েন্দার মূল দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হলো। আর এই দায়িত্ব কাস্টমস আইনেই রয়েছে। ভাগ করা হলো এর কাজ। তিনটি মূল ভাগে বিভক্ত করা হলো। **১.** ইন্টেলিজেন্স, **২.** এনফোর্সমেন্ট এবং **৩.** ইনভেস্টিগেশন। এর আবার প্রতিটি ভাগে আছে নানা বিভাজন। যেমন- ইন্টেলিজেন্স পরিবেশনরত খাবারের কেকের সদৃশ হিসেবে বিবেচিত। এটি যে কোনো সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য উত্তম মাধ্যম। কিন্তু কীভাবে এই কেক তৈরি হবে? এর জন্য প্রয়োজন দুধ, চিনি, ময়দা, তেল, মসলা ইত্যাদি। এরপর ওভেনে কুক করে তা সাজিয়ে পরিবেশন ও উপভোগ করা যায়। যে কেকটি যত উপাদানে সমৃদ্ধ সেটি তত সুস্বাদু। তেমনি ইনফরমেশন হচ্ছে ইন্টেলিজেন্সের নানা উপকরণ। যতো ইনফরমেশন পাওয়া যাবে এবং যতো মুন্সিয়ানায় এসব বিশ্লেষণ করা যাবে তত এটি গ্রহণযোগ্য হবে। সিদ্ধান্তটি ততো নিখুঁত হবে। কিন্তু এটি কী করে সম্ভব?

ভালো ইন্টেলিজেন্সের জন্য দরকার নেটওয়ার্ক। এটির জন্য প্রয়োজন শক্ত ভিত্তি। অতীতে থাকলেও তা আরও ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও কর্মচারী নেটওয়ার্কের অংশ। সেভাবেই তাদের সাজানো হলো। কেবল নিজস্ব সোর্স যথেষ্ট নয়। এককভাবে কোনো কাজ করা যায় না ও তা সম্ভবও নয়। রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ কাজ অনেক সহজ হয়। অন্যান্য সংস্থার আস্থা অর্জন ও তাদের সাথে নিয়ে কাজ করাটা একটা চ্যালেঞ্জ। কারণ, এই প্র্যাকটিস অপ্রতুল ও যৎসামান্য। অন্যান্য সংস্থার সাথে একযোগে কাজ করার অভিজ্ঞতার ঘাটতি লক্ষণীয়। এখান থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হলো। সবাই ইতিবাচকভাবে সাড়া দিল। কয়েকটি সংস্থার আস্থা এমন পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা সকল ধরনের সমর্থন দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। কাস্টমস গোয়েন্দার হাত এখন অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। কেবল দেশিয় সংস্থার ওপরই নির্ভর করেনি এই দপ্তর। দেশের বাইরের সংস্থার সাথেও একযোগে কাজ করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা। দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত ছিল আগে থেকেই। এগুলোকে কার্যকর অর্থে কাজে লাগানো হলো। এসব নেটওয়ার্ককে পাশে নিয়ে সমন্বয়ের কাজটি করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা। অনেক ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে এতে। ফলে একের পর এক সফল উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়ে আসছে।

সব গোয়েন্দা তথ্যই কী প্রয়োগ করতে হবে? এটি এই দপ্তরের জন্য বড় প্রশ্ন। কর্মকর্তাদের মাঝে কোনো তথ্য (ইন্টেলিজেন্স নয়) পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবণতা পরিহারের উদ্যোগ নেয়া হলো। বাছ-বিচারের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হলো। এর দ্বারা কী অর্জন হবে? সদুত্তর পাওয়ার চেষ্টা নিহিত এতে। ফলে দুটো ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। **১.** হয়রানির অভিযোগ হরহামেশাই উত্থাপিত হতো। কারণ তথ্যের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি ছিল না। যাচাই-বাছাই সীমিত ছিল। একটা কাস্টম হাউস একবার পরিসংখ্যান তৈরি করল। কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক প্রদত্ত চিঠির ৯০%-এ কোনো মিথ্যা ঘোষণার প্রমাণ মেলেনি। এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর তথ্য। ইন্টেলিজেন্সের 'ওভারসাইট' হতে পারে। কিন্তু এভাবে কাঁচা কাজ হবে সেটি যৌক্তিক মনে হবে না। মোটা দাগে এটি অগ্রহণযোগ্য। **২.** ব্যবসায়ীদের হয়রানির বিষয়টি প্রায় সামনে চলে আসে। এতে করে অন্ধকারে নেগোসিয়েশনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। হিসাবে মেলা না মেলার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তাই ঝাঁপিয়ে পড়ার সংস্কৃতি দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হলো।

কোন তথ্য আসলে প্রথমে দুভাবে দেখার নির্দেশনা দেয়া হলো। এটি কি নিরপেক্ষভাবে যাচাইকৃত? অন্য সূত্র কী বলছে? কতখানি নিখুঁত তথ্য? পরের বিষয়টি হচ্ছে, ইন্টেলিজেন্স অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করলে সার্বিক অর্থে কী অর্জন হবে? হয়তো ২০ টনের চালানে ২০০ কেজি অতিরিক্ত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতে নিবারকমূলক প্রভাব কী? প্রকৃত অর্থে, গোয়েন্দা তথ্য নির্ভরযোগ্য হলেও তাতে নিজেদের হস্তক্ষেপের দাবি রাখে না। এতে স্বাভাবিক বাণিজ্যের গতি শ্লথ হতে পারে। তবে যেখানে সংগঠিত অপরাধ (organized crime) হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তা দুর্বল ও ভেঙে দেয়ার স্বার্থে এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে। কাস্টমস আইনে এই হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের। মূল কথা হলো, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা থাকতে হবে এবং একই সাথে এর দ্বারা রাষ্ট্র কীভাবে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হতে পারে সেটি বিবেচনায় আনার উপর তাগিদ দেয়া হলো। সকল তথ্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সকল গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী ঝাঁপিয়ে পড়াটা যৌক্তিক নাও হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মিডিয়ার সাথে কাস্টমস গোয়েন্দার সাম্প্রতিক যোগাযোগের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। মিডিয়া এই দপ্তরের অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। বরং এই প্রতিষ্ঠানের সহায়ক। কর্মকর্তাদের মিডিয়া থেকে দূরে থাকার বিষয়টি সেকেলের। 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' প্রবর্তনের পর এখন তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

যতটুকু দেয়া যায় ততটুকু তথ্য দেয়ার ঘাটতির বিষয়টি চিহ্নিত করা হলো। নতুন করে এ বিষয়ে ভাবনা তৈরি হলো। অনেক অভিযানে মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করা হলো। প্রথমে অনেক সমালোচনা হলো। চোরাকারবারিদের সাথে বনিবনা না হওয়ায় এসব অভিযান চলছে। টিভি টকশোতে এ বিষয়ে বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। অনলাইন পত্রিকায় পাঠকের প্রতিক্রিয়া সুখকর ছিল না। কিন্তু অভিযানের বিষয়টি যখন অনবরত এবং অতি স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা হলো তখন এই প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হয়।। এখন প্রায়শ কাস্টমস গোয়েন্দার খবর ফলাও করে স্থান পায় মিডিয়াতে। অনেক প্রশ্ন মিডিয়ার। ধরা পড়া এসব সোনা যায় কোথায়? যা ধরা পড়ছে তা মোট চোরাচালানের কত অংশ? ধরা পড়া সোনা তছরুপ হয় কি না? এসব প্রশ্ন অনেক সময় বিব্রতকর। এগুলো সর্বতোভাবে সত্য নয়। কিন্তু জনমনে এটি বদ্ধমূল। বিব্রতকর প্রশ্নের মধ্যে একটা আছে, ধরা পড়া সোনার দু-এক পিস পকেটে ঢোকানো যায় কি না? অথবা ধৃত সোনা পরে তামা হয়ে যায় কি না? এসব প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর বারবার মিডিয়াতে আসায় এই দপ্তর সম্পর্কে জনমনে গেঁথে থাকা ধারণায় একটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। একধরনের আস্থা তৈরি হলো। বর্তমানে মিডিয়ার কভারেজ দেখলে তা স্পষ্ট। মিডিয়ার সাথে এই যে পার্টনারশিপ তাতে কাস্টমস, এনবিআর ও সার্বিক অর্থে সরকারের সুশাসনের পক্ষে গেছে। অনেক উপকারিতার মধ্যে রয়েছে- **প্রথমত,** গোয়েন্দাদের কাজে স্বচ্ছতার বিষয়টা সামনে এসেছে। এই দপ্তর এখন উন্মুক্ত। প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতা ও উত্তর আছে। স্বচ্ছতার একটা উদাহরণ দেয়া দরকার। গত ২৫/১২/২০১৪-এ পুরানা পল্টনের একটা বাড়িতে অভিযান পরিচালনাকালে চারটি টিভি ক্যামেরা সাথে পাঠানো হয়। ক্যামেরাম্যানদের অনুরোধ করা হয়, তারা যেন এক পলকের জন্য আটক স্বর্ণ ও টাকার বস্তার উপর হতে ফোকাস না সরান।

ওই ঘটনায় হাতে-নাতে মোহাম্মদ আলি নামের একজনকেসহ প্রায় দেড় মণ স্বর্ণ ও চার বস্তা দেশি ও বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। এটি সারা বাংলাদেশের মানুষ লাইভ দেখেছে। মিডিয়াগুলো কিছুক্ষণ পর পর এটি প্রচার করেছে। উদ্ধারকৃত মুদ্রাগুলোও সিসিটিভি ক্যামেরার সামনে গণনা করা হয়। সেটিও কভার করেছে মিডিয়া। আটক স্বর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়ার চিত্রও মিডিয়াতে এসেছে। এতে মিডিয়া ও জনমনে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** মিডিয়া কভারেজ কেবল কাস্টমস গোয়েন্দাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে তা নয়। কাস্টমস একটা কার্যকর আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মান বেড়েছে। অন্যদিকে, সরকারের সুশাসনের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া এটি সম্ভব নয় এটি স্পষ্ট হয়েছে। সরকারের ভাবমূর্তিও বেড়েছে সমানভাবে। **তৃতীয়ত,** 'সাপের লেজে পাড়া' দিলে তা বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই যে কাজটাতে বিপদের আশঙ্কা আছে তাতে সাবধান হতে হয় এবং অনেক কৌশলী হয়ে কাজটা সম্পন্ন করতে হয়। এসব কাজে মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করলে অশুভ শক্তি (সাপের মাথা) সাধারণভাবে সামনে আসে না। কারণ যে অপরাধে অভিযান পরিচালনা করা হয় তা সমাজে নিন্দিত। সুতরাং মিডিয়ার সুবাদে

সাপের কামড় থেকে আত্মরক্ষা করার সহজ কৌশল হলো এই পার্টনারশিপ। মোদ্দাকথা, মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কৌতূহল অনেকাংশে দূর হয়েছে। ভুল ধারণা থাকলে তা অনেকটা ভেঙে গেছে। ভালো কাজের প্রশংসা পাওয়া যায়, অন্যদিকে ভুলত্রুটি থাকলে তা শোধরানো যায়। একই সাথে, জনমনের ধারণা বিবেচনায় এনে কাজটা আরো সহজ করা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে, কতিপয় জনস্বার্থে কাস্টমস গোয়েন্দার অবদান স্বীকৃতি পেয়েছে। যেমন গত দুই বছরে প্রায় ২৭ মণ স্বর্ণ আটক হয়েছে এবং ১১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেক চাঞ্চল্যকর অভিযানও রয়েছে। যেমন- ২৬ এপ্রিল ২০১৪-তে ১০৫ কেজি স্বর্ণসহ 'অরুনার আলো' নামের একটা বিমান আটক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫-তে ৬২ কেজি স্বর্ণসহ 'রাঙ্গাপ্রভাত' নামের এয়ারক্রাফট আটক, ১৪ জানুয়ারি ২০১৫-তে ১৪ কেজি স্বর্ণসহ এস২এএইচকে নামীয় বিমান আটক, এবং সর্বশেষ ৩০ মে ২০১৫-তে ২৪ পিস স্বর্ণবারসহ এস২এডিএফ বিমান আটক উল্লেখযোগ্য। অতীতে ১০ বছরে গড়ে দুই কেজি স্বর্ণ আটক হয়েছে। সম্প্রতি যেসব চালান আটক হয়েছে এতে মনে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্ট ভরে যাচ্ছে এবং দেশ ধনী হচ্ছে। এটি একটি সহজ বক্তব্য। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সার্বিকভাবে কাস্টমস গোয়েন্দা কেবল স্বর্ণ আটকই করছে না। প্রকৃতঅর্থে, এর দ্বারা অনেক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অপরাধ হ্রাসের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। কোনো অপরাধ সংঘটিত হতে হলে অর্থের প্রয়োজন এবং তা সাধারণত অবৈধভাবে লেনদেন হয়ে থাকে। এসব অপরাধে অবৈধভাবে আনীত অর্থ অক্সিজেনের ভূমিকা পালন করে থাকে। ২৭ মণ স্বর্ণ আটক হয়েছে ঠিক, কিন্তু গোয়েন্দা তৎপরতায় এবং তাদের সদা সতর্কতায় আরও হয়তো ৫০০ মণ স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধ হয়েছে। এতে সার্বিক অর্থে দেশে মানিলন্ডারিং, মানবপাচার, ড্রাগস ও আর্মসসহ অন্যান্য আন্তমহাদেশিয় অপরাধের আর্থিক লেনদেনে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি হয়েছে মর্মে এ দপ্তরের ধারণা। অধিকন্তু, দেশের নানা ধরনের হত্যাসহ সামাজিক অপরাধও এর দ্বারা নিরুৎসাহিত হয়েছে এটি বলা যায়। কালো টাকার লেনদেন, হুন্ডি, আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে লেনদেনের উপরও যথেষ্ট চাপ বেড়েছে। কাস্টমস গোয়েন্দা স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখায় কাস্টমস-এর নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। দেশের নিরাপত্তায় সার্বিকভাবে অবদান রাখছে। বর্তমানে স্বর্ণ চোরাচালানের বড় বড় নেটওয়ার্ক হয় ভেঙে গেছে নয়তো দুর্বল হয়েছে। বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ধরা পড়ার পর এই খাতে পুঁজি ও লাভ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমন অনেক ক্যারিয়ার, সহায়তাকারী ও গডফাদার আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার আইনি নজরদারিতে আছে। ফলে বড় আকারে স্বর্ণ ধরা পড়ার হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সম্প্রতি মেধাস্বত্ব অধিকার (আইপিআর) ভঙ্গ-সংক্রান্তে কাস্টমস গোয়েন্দার এই নতুন ভূমিকাকে সামনে নিয়ে এসেছে। গত ৪ মার্চ ২০১৫ সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় শিমরাইলে একটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ খালি কন্টেইনার (কৌটা) উদ্ধার করা হয়। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের নামীদামি ব্র্যান্ডের নানা কসমেটিকস, পারফিউম ও স্প্রে। এসবের গায়ে লেখা রয়েছে মেড ইন ইংল্যান্ড, ইউএই, ফ্রান্সসহ আরও অনেক দেশের নাম। অথচ এসব খালি কন্টেইনার ওই কারখানায় রিফিল করে বোতলজাত করে দেশের বিপনিবিতানগুলোতে সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে। কাস্টমস আইনের সেকশন ১৫ ও ১৬ অনুযায়ী এবং ট্রেড মার্ক আইন অনুযায়ী এগুলো নিষিদ্ধ আইটেম। এ ধরনের লেখাযুক্ত খালি কন্টেইনার আমদানি করা যায় না। এর দ্বারা দু-ধরনের ক্ষতির সংযোগ রয়েছে। **১.** এর দ্বারা মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ অধিকার খর্ব হয়েছে। আইনের চোখে এটি দণ্ডনীয় অপরাধ, **২.** এসব পণ্য ব্যবহারের ফলে ক্রেতাসাধারণ প্রতারিত হচ্ছে। বাইরের মোড়ক দেখে ক্রেতা বিদেশি পণ্য হিসেবে কিনছেন ঠিক। কিন্তু ভেতরে স্থানীয় ও নকল দ্রব্যের মিশ্রণ। এসব মিশ্রণের পণ্য কতটা স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে তা একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে। স্কিনের সাথে মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। কিডনি থেকে শুরু করে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তদন্তে বের হলো, এসব চালানের বৈধ কাগজপত্রাদি নেই। এর মানে রাজস্ব ফাঁকির বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু এর চেয়ে বড় বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, এর দ্বারা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কাস্টমস গোয়েন্দা ভূমিকা রেখেছে। এসব চালান ছাড়াও, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে বড় বড় ওষুধের চালান আটক করতে পারদর্শিতা দেখিয়েছে এই দপ্তর। নকল ভায়াগ্রাসহ নানা প্রেসক্রাইবড ওষুধের (অনেকাংশে নকল) চালান আটক হচ্ছে। একটি তদন্তে ইনফিউশন নিডল সেটের শতাধিক

চালান অবৈধভাবে খালাসের ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে। এতে দেখা গেছে, নিম্নমানের নিডল এসেছে কোনো ধরনের স্থানীয় মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা ছাড়াই। এসব নিডলে নানা রোগজীবাণু থাকা অস্বাভাবিক নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসলে তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এটি কাস্টমস গোয়েন্দার নতুন ভূমিকাকে স্পষ্ট করেছে।

অনেক বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে বসবাস করছেন। এদের অনেকের যথাযথ ওয়ার্ক পারমিট নেই। এরা বিভিন্ন ব্যবসায়ের আড়ালে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। এজাতীয় অভিযানের উদাহরণ কাস্টমস গোয়েন্দার অনেক রয়েছে। গুলশানের একটি অভিজাত বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের গার্মেন্টস পণ্য উদ্ধার করা হয় পাকিস্তানি নাগরিক জনাব হালিম পুরির আস্তানা থেকে। কোনো সাইনবোর্ড ছাড়া এবং ভ্যাট ও ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত এসব অবৈধ ব্যবসার সাথে তিনি দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে অনুসন্ধানে জানা গেল, তিনি এই ব্যবসার আড়ালে ভিন্ন রকমের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডেও জড়িত। ওই ঘটনায় তৎকালীন পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার নিজে হাজির হয়ে কাস্টমস গোয়েন্দার টিমকে সরে যেতে অনুরোধ করেন। বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। এছাড়াও সম্প্রতি গুলশানের পিংক সিটির কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়ে কয়েকজন পাকিস্তানিসহ বিপুল পরিমাণ অবৈধ পণ্য আটক করা হয়। অন্যদিকে, বনানীতে 'পিয়ংইয়ং' রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে উত্তর কোরিয়ার নাগরিক গ্রেপ্তারসহ বিপুল পরিমাণ মদ, যৌন উত্তেজক ঔষধ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। এই রেস্টুরেন্টটি অবৈধভাবে পরিচালিত হয়ে আসছিল এবং নানা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসের কূটনীতিকগণও এই অভিযানে বাধা প্রদান করেন। বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসকে সতর্ক করা হয়। কাস্টমস গোয়েন্দার এসব অভিযানে এটি স্পষ্ট হয়েছে, বিদেশিরা এদেশে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে তাতে বাধ সাধবে কাস্টমস গোয়েন্দারা। এটি এই সংস্থার নতুন ভূমিকার জোরালো ইঙ্গিত।

এই দেশ যেন কোনো অপরাধী চক্রের ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার হতে না পারে সে ব্যাপারে কাস্টমস গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের অন্যতম উদ্বেগের বিষয় হলো পাকিস্তান হতে ভারতীয় জাল মুদ্রা পাচার। দ্বিপাক্ষিক কাস্টমস-সংক্রান্ত আলোচনাতেও এই বিষয়টি অন্যতম এজেন্ডা থাকে। এটি যে কেবল ভারতীয় উদ্বেগ তা নয়। বাংলাদেশ কাস্টমস আইনের সেকশন ১৫-এ যেকোনো জাল মুদ্রা আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য। গত দুবছরে বিভিন্ন ঘটনায় প্রায় ১৭ কোটি টাকার ভারতীয় জাল মুদ্রা আটক হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে অনেকে। এসব আটক মুদ্রার অরিজিন ছিল পাকিস্তান। খালি চোখে বোঝার উপায় নেই এগুলো জাল। মেশিনে এগুলো সঠিক বলে রিডিং আসে। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার স্থানীয় শাখাও বলতে পারছে না এগুলো জাল। কিন্তু কাস্টমস গোয়েন্দা প্রতিটি নোট ইনভেন্ট্রি করার সময় দেখতে পান, একই নম্বরে একাধিক বান্ডিল। প্রতিটি টাকার ইউনিক নম্বর থাকার কথা। যেহেতু একই নম্বরে একাধিক বান্ডিল তাই এগুলো জাল বলে জব্দ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। অন্যদিকে, এই দেশ কোনো অপরাধের অভয়ারণ্য নয় এটি প্রমাণ করেছে কাস্টমস গোয়েন্দার নতুন ভূমিকা।

অতি সম্প্রতি কাস্টমস গোয়েন্দার ভূমিকা সর্বমহলে নন্দিত হয়েছে মাদকবিরোধী অভিযানে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পোর্টে ও এয়ারপোর্টে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে মাদক চোরাচালানির ওপর। স্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য ও নিজস্ব সোর্স নিয়োগ করে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। একটি কন্টেইনারে বলিভিয়া হতে সানফ্লাওয়ার তেল নিয়ে আসা হয় চট্টগ্রাম পোর্টে। এটি উরুগুয়ে, সিঙ্গাপুর হয়ে চট্টগ্রামে আসে ১২ এপ্রিল ২০১৫। যার নামে এসেছে তিনি এর মালিকানা অস্বীকার করেছেন। এর কোনো এলসি ছিল না। দীর্ঘদিন পরও কেউ বিল অব এন্ট্রি দাখিল করেনি কাস্টমস-এর কাছে। অধিকন্তু, এটি অন্য একটি তৃতীয় দেশে পুনঃরপ্তানির ডকুমেন্টস কাস্টমস গোয়েন্দার হাতে পড়ে। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থাগুলোও ইঙ্গিত করছে এতে কোকেইন আছে। ঢাকা থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিমসহ গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত হলেন। তাৎক্ষণিকভাবে, ১০৭টি ড্রাম হতে নমুনা সংগ্রহ করা হলো। কিন্তু, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দল টেস্ট করে বলল, এতে কোনো কোকেইন নেই। কিন্তু কাস্টমস গোয়েন্দা নাছোড়বান্দা।

সম্প্রতি কানাডা কাস্টমস বলিভিয়া থেকে আগত এ ধরনের ভোজ্য তেলের ভেতর হতে ৩১০ কেজি কোকেইন উদ্ধার করে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও উন্নত ল্যাবে প্রেরণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পুলিশ প্রহরায় বিসিএসআইআর ও ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনস্ত বাংলাদেশ ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার জন্য। একজন কাস্টমস গোয়েন্দার উপপরিচালককেও নিয়োগ দেয়া হয় টেস্টের সময় সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকার জন্য। উভয় প্রতিষ্ঠান হতে রিপোর্টে একটি নির্দিষ্ট ড্রামের (যার নমুনা দুর্গন্ধযুক্ত ও ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি) মধ্যে কোকেইনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে কী পরিমাণে কোকেইন আছে তা তারা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেনি। এর জন্য ২৫-৫০ গ্রাম অ্যাকটিভ কোকেইন প্রয়োজন যা প্রয়োগ করে প্রকৃত কোকেইনের পরিমাণ বের করা সম্ভব। খোঁজ করে এই পরিমাণ পাওয়া গেল না। কাস্টমস গোয়েন্দা এ বিষয়ে বিদেশি কোনো সহায়তা পাওয়া যায় কি না তা খতিয়ে দেখছে। ওই ড্রামে তরল পদার্থ আছে ১৮৫ কেজি। গোয়েন্দা সূত্র ও ঘনত্ব অনুযায়ী এই ড্রামে হয়তো প্রায় ৬০ কেজি কোকেইন আছে মর্মে ধারণা করা হয়। মূল বিষয় হলো, এ জাতীয় ড্রাগ আটকের ঘটনা বাংলাদেশে এই প্রথম। তেলের ভেতর মিশ্রিত অবস্থায় এই অবস্থায় কোকেইন আসবে তা ধারণার বাইরে। এটি সন্দেহ করা এবং বিশেষ টেস্টের ব্যবস্থা করা এবং কোকেইনের অস্তিত্ব বের করা চারটেখানি কথা নয় তা সহজে বোঝা যায়। এখানে গোয়েন্দাদের বিশেষ পেশাদারিত্বের পরিচয় বহন করে। আর এ জাতীয় কাজেই গোয়েন্দাদের চোখ নিবদ্ধ থাকা দরকার। কোকেইন উদ্ধারের সার্বিক এ কাজটিতে নেতৃত্ব দিয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। এই ঘটনাটি এই অধিদপ্তরের একটি 'রোল মডেল' হতে পারে। এই দপ্তর কেবল রাজস্ব আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ ও সার্বিক অর্থে নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পদচারণা দৃশ্যমান করেছে। এর নতুন ভূমিকাকে অর্থবহ করেছে। *(এবিষয়ে পৃথক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয় অংশে।)*

রাজস্ব ফাঁকি রোধ ও চোরাচালান রোধে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিবারকমূলক কার্যক্রম বর্তমান কাস্টমস গোয়েন্দা অধিদপ্তরের মূলমন্ত্র। অধিক ঝুঁকি ও তা সামাল দেয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে যে কোন অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি পরিচালিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে, রাজস্ব-নির্ভরতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে অপ্রচলিত নিরাপত্তার ধারণাকে মাথায় রেখে কাস্টমস অপরাধ প্রতিরোধ এখন অগ্রাধিকার। তাই বর্তমানের অভিযানে আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য, দেশি ও বিদেশি নাগরিকদের থেকে অবৈধ পণ্য, মুদ্রা, কোকেইনসহ মাদকদ্রব্য ও স্বর্ণ পাচার রোধসহ জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং সার্বিক অর্থে দেশের ও জনস্বার্থে কাজ করার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বে অন্যান্য দেশেও কাস্টমস-এর এটি মুখ্য ভূমিকা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সমভাবে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং অপ্রচলিত নিরাপত্তার বিষয়কে সামনে রেখে ল'-এনফোর্সমেন্টই বর্তমান কাস্টমস গোয়েন্দার মূল দর্শন। বৈধ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অন্যতম সহায়ক শক্তি নতুন ভূমিকা। নিজে যেমন রাজস্ব আদায় করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ, কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের প্রসারে অবদান রাখতে ব্যবসা-বাণিজ্যের আগাছা দূর করতে কাস্টমস গোয়েন্দা অধিক আগ্রহী। এটি আরও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে হলে কাস্টমস গোয়েন্দা প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর সময় এসেছে। জনবল, লজিস্টিক্স, বাজেট বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি বর্তমানে সামনে চলে এসেছে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কোনো দেশের কাস্টমস দেশের জীবনীশক্তি সঞ্চার ও তা রক্ষা করে থাকে। এতে যে কোনো বিনিয়োগ তা আনুপাতিক রিটার্ন আনতে সক্ষম। তাই সময় এসেছে সক্ষমতার ওপর নজর দেয়া ও পাশাপাশি আলোকিত প্রশাসন গড়ার ওপর জোর দেয়ার।

- লেখক **ড. মইনুল খান**, মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

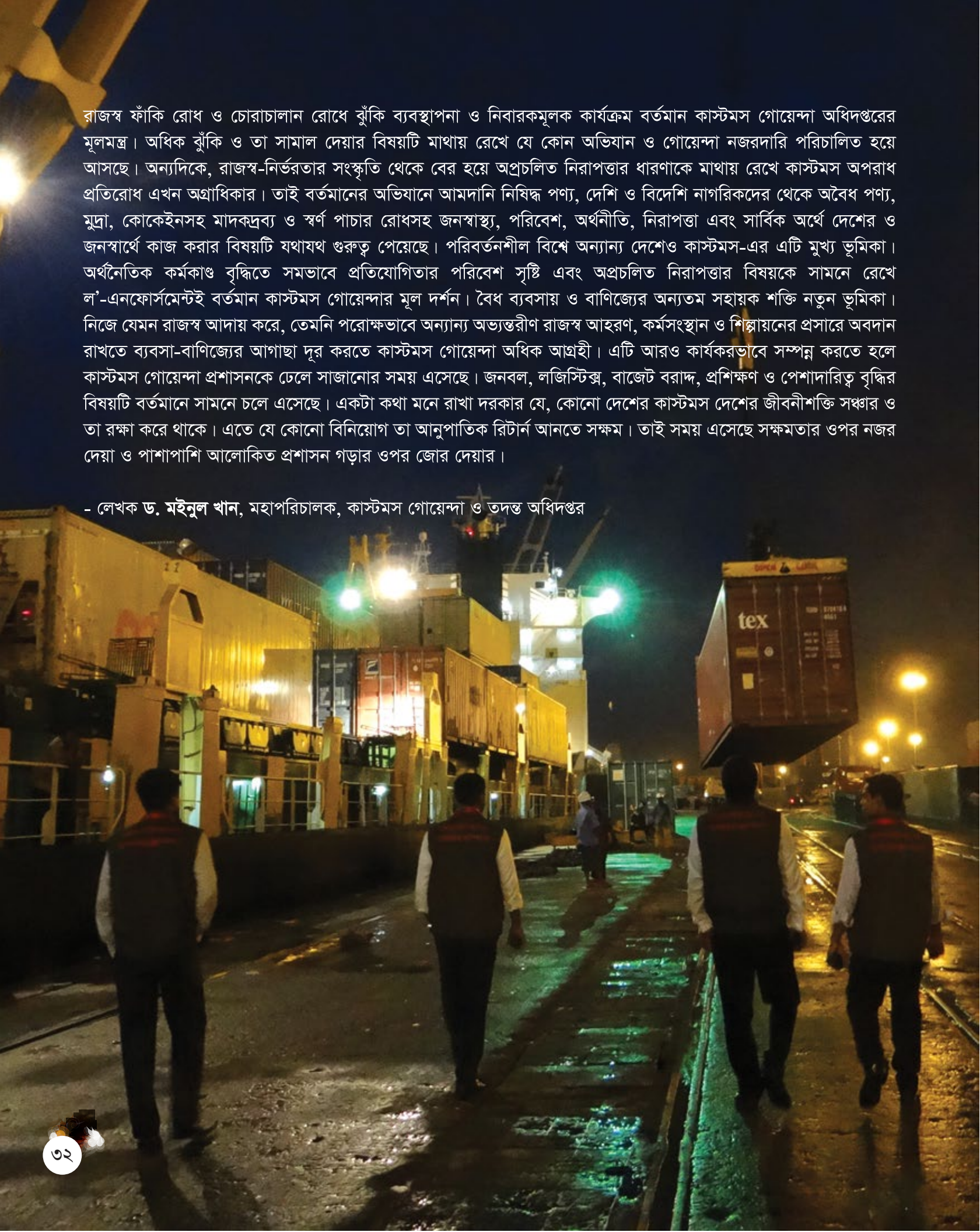

বাণিজ্য সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী

কাস্টমস গোয়েন্দা

কাস্টমস গোয়েন্দার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

শেওফতা মাহজাবীন

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সংঘবদ্ধ চোরাচালান ও কাস্টমস অপরাধ দমন ও প্রতিহতের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি বিশেষ সংস্থা। কাস্টমস গোয়েন্দার অন্যতম কাজ হলো নিরাপদ ব্যবসায়-বাণিজ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ চোরাচালান অপচেষ্টা প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের মূল্যবান রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ, বাণিজ্যিক আমদানিতে জালিয়াতি ও অসত্য ঘোষণা-সংক্রান্ত অনিয়ম উদঘাটন ও অন্যান্য কাস্টমস অপরাধের ক্ষেত্রে নিবারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং কাস্টমস-সংক্রান্ত গোয়েন্দা নজরদারি ও তদন্ত পরিচালনা। সম্প্রতি স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা, মাদক ও অবৈধ ওষুধ চোরাচালান প্রচেষ্টা নস্যাৎসহ চাঞ্চল্যকর কাস্টমস অপরাধ উদঘাটন এবং সেই সাথে এসব সংঘবদ্ধ অপরাধের সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে সোপর্দ করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা। কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক সম্প্রতি উদঘাটিত চাঞ্চল্যকর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক চোরাচালানবিরোধী বিভিন্ন অভিযানে ৩৬৩.৫৮ কেজি স্বর্ণ আটক করা হয়েছে যার মূল্য ১৮১.৩১ কোটি টাকা। গত ১০.১২.২০১৪ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এয়ারফ্রেইট কার্গো সেকশনে সিঙ্গাপুর হতে আগত SQ-446 ফ্লাইটের মাধ্যমে ইপিজেডভূক্ত ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ পণ্যের মিথ্যা ঘোষণায় আনীত ২১.৫০ কোটি টাকা মূল্যের ৪৩ কেজি স্বর্ণ আটক করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা।

BG-048 ফ্লাইটের টয়লেটের ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে ০২.০২.২০১৫ তারিখে ৩১.৩৯ কোটি টাকা মূল্যের ৬২ কেজি স্বর্ণ এবং ২৫.১২.২০১৪ তারিখে পল্টনের একটি বাসা হতে ডিবি পুলিশের সহায়তায় কাস্টমস গোয়েন্দা ৩০.৭৬ কোটি টাকা মূল্যের ৬১.৫৩ কেজি স্বর্ণ, ৩.২৬ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা এবং ৫.৫৯ কোটি টাকার বাংলাদেশি মুদ্রা আটক উল্লেখযোগ্য। এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও দেশি-বিদেশি মুদ্রা উক্ত ফ্ল্যাটের ওয়াল ক্যাবিনেট ও খাটের পাটাতনে লুকানো ছিল। এ ঘটনায় ফ্ল্যাটের মালিক স্বর্ণ চোরাচালান চক্রের অন্যতম হোতা এস. কে. মোহাম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করা হয় ও তার বিরুদ্ধে পল্টন থানায় ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনাটি ইতিমধ্যে 'পল্টন অভিযান' হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। এছাড়া কাস্টমস গোয়েন্দার অপর একটি অভিযানে ০৩.০৪.২০১৫ তারিখে হংকং হতে CX-049 ফ্লাইটের মাধ্যমে আনীত ১৪৪ কেজি ওজনের ইলেকট্রিক ফ্যানের চালান হতে ১২ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়।

সংঘবদ্ধ এ সকল স্বর্ণ চোরাচালান অপচেষ্টার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১০৬ জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে এবং অনেকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ সকল অভিযানে আটককৃত স্বর্ণ এবং দেশি-বিদেশি মুদ্রা নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমা প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাপাচার প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে কাস্টমস গোয়েন্দা। গত ২৫.০৮.২০১৪ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মালয়েশিয়াগামী একজন যাত্রীর দেহ ও ট্রলিব্যাগ তল্লাশি করে দেড় কোটি টাকা মূল্যমানের সৌদি রিয়াল এবং মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত উদ্ধার করে কাস্টমস গোয়েন্দা। ৩১.০৮.২০১৪ তারিখে দুবাই হতে আগত একজন যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকা মূল্যমানের ভারতীয় রুপি উদ্ধার করা হয়। ১০.১১.২০১৪ তারিখে দুবাইগামী এক যাত্রীর দেহ তল্লাশি করে আটত্রিশ লক্ষ তের হাজার টাকা মূল্যমানের আমিরাতের দিরহাম, কাতারের রিয়াল পাওয়া যায় এবং ০৫.০৮.২০১৫ তারিখে কুয়ালালামপুরগামী একজন যাত্রীর নিকট হতে সাঁইত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা মূল্যমানের সৌদি রিয়াল, কাতারি দিরহাম, ইউএই দিরহাম আটক করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সর্বমোট ১৭.৮৫ কোটি টাকা মূল্যমানের বিদেশি মুদ্রা আটকসহ এই অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় মামলা দায়ের করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ।

চোরাচালানের মাধ্যমে বিদেশি সিগারেট ব্যাপক হারে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় দেশিয় সিগারেট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো অসম প্রতিযোগিতার মাঝে পড়ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, সরকার হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকার মূল্যবান রাজস্ব। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ড যেমন- ইজ, ব্ল্যাক, পাইন, ডানহিল, বেনসন অ্যান্ড হেজেস ইত্যাদি ব্র্যান্ডের ১.৮ মিলিয়ন শলাকা আটক করা হয়। আটককৃত এসব সিগারেটের অধিকাংশই নকল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি হুমকির মধ্যে পড়েছে। অধিকন্তু, এসব সিগারেটের প্যাকেটে বাংলায় সতর্কীকরণ নির্দেশনাও নেই। চোরাচালানের মাধ্যমে বিদেশি সিগারেট দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় দেশিয় সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়েছে। সিগারেট চোরাচালান রোধে কাস্টমস গোয়েন্দার এই ভূমিকার জন্য স্থানীয় সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে।

সম্প্রতি কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কোকেন চোরাচালানের ঘটনা উদঘাটিত হয়। Thorstream নামের জাহাজের মাধ্যমে বলিভিয়া থেকে ৪০ফিট কন্টেইনারে আগত সূর্যমূখী তেলের একটি চালানে তেলের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় কোকেন আমদানি করা হয়। কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক বিসিএসআইআর এবং ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে সম্পন্ন রাসায়নিক পরীক্ষায় কোকেনের অস্তিত্ব প্রমানিত হয়েছে। এ বিষয়ে অধিকতর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (বিস্তারিত পড়ুন দ্বিতীয় অংশে)

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কাস্টমস গোয়েন্দা ওষুধ প্রশাসনের অনুমতিবিহীন ৬.৭৫ কোটি টাকার অবৈধ ওষুধ আটক করেছে। এসবের মধ্যে আছে হৃদরোগ, রক্তচাপ, চর্মরোগ, ক্যান্সার ও স্থূলতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হওয়া বিভিন্ন ওষুধ। এই ওষুধগুলোর অধিকাংশই নকল মর্মে প্রতীয়মান। ওষুধের প্রকৃত গুণাগুণ ও মানহীন এই সকল ওষুধ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। নিম্নমানের নকল ওষুধের এ সকল চালান আটকের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও স্থানীয় ওষুধশিল্পের বিকাশে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখছে কাস্টমস গোয়েন্দা।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কাস্টমস স্টেশনে নিরবচ্ছিন্নভাবে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার ফলে বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত চালানে প্রায় ৮০ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বেনাপোল কাস্টম হাউস দিয়ে ডিজেল চালিত থ্রি-হুইলার চালানে প্রায় ১০ কোটি টাকা, মংলা কাস্টম হাউস দিয়ে সম্পূরক শুল্ক পরিহার করে খালাসকৃত রিচার্জেবল ফ্যানের ২৫টি চালানে প্রায় ২ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি, একই কাস্টম হাউস দিয়ে খালাসকৃত আমদানি নিষিদ্ধ ১২টি গাড়ি ও ডিউটি পরিশোধ না করে জালিয়াতির মাধ্যমে খালাসকৃত গাড়িতে প্রায় ২ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটিত হয়। বেনাপোল কাস্টম হাউস হতে Bearing Housing ঘোষণায় Ball Bearing আমদানির মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব ফাঁকি হয়। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে Bearing Housing এবং Ball Bearing ঘোষণায় আমদানিকৃত ১৩টি চালান পরীক্ষা করে প্রায় ২৫০ মেট্রিক টন Ball Bearing ঘোষণার অতিরিক্ত পাওয়া যায় এক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে ১.৫২ কোটি টাকা।

কাস্টম হাউস আইসিডি কমলাপুর দিয়ে মিথ্যা ঘোষণায় এলাচের ২টি পৃথক চালানে ০.৭৫ কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি উদঘাটিত হয়। একই কাস্টম হাউস দিয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে আমদানিনিষিদ্ধ ৫৬টি ১৫০

সিসির উর্ধ্ব ক্ষমতাবিশিষ্ট ইঞ্জিনসম্পন্ন বিলাসবহুল মোটরসাইকেল আমদানি করা হয় যা এই দপ্তরের তদন্তে প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে আমদানিকারক মাননীয় হাইকোর্টে রিট দায়ের করলে দফায় দফায় শুনানির মাধ্যমে উক্ত অনিয়মের বিষয়টি এ দপ্তর হতে মাননীয় আদালতের নিকট তুলে ধরা হলে, মাননীয় আদালত অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে অনিয়ম উদঘাটন ও দায়-দায়িত্ব নিরূপণের লক্ষ্যে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেন । আইসিডি, কমলাপুর দিয়ে জালিয়াতি করে খালাসকৃত একটি কাপড়ের চালান ইসলামপুর থেকে মধ্যরাতে আটক করা হয়। এতে ৬৮ লাখ টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটিত হয়।

কাস্টমস গোয়েন্দার তদন্তে মেসার্স এগ্রিপুল লি. নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে আমদানিকৃত সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের চালান তদন্ত করে ০.৫৪ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির তথ্য উদঘাটিত হয়।

লৌহজাত ও ধাতব পণ্য (বিপি শিট/জিপি শিট) আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃতি ও ওজন বিষয়ে অসত্য ঘোষণায় আমদানিকৃত ২৭৭টি চালান হতে ৩৫.৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে মোট ১২,৫২৮ কোটি টাকার এ ধরনের পণ্যের আমদানির বিপরীতে ১,৭১৮ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়। আর এই দপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বর্তমান অর্থবছরের একই সময়ে আমদানিকৃত ১২,০৪৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যের বিপরীতে প্রায় ২,১৪৮ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। এই দপ্তর ও কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের যৌথ উদ্যোগের ফলে সার্বিকভাবে মিথ্যা ঘোষণা ও জালিয়াতি হ্রাস পাওয়ায় সরকারের প্রায় ৪৩২ কোটি টাকার রাজস্ব সুরক্ষা হয়েছে।

বন্ড সুবিধার মাধ্যমে শুল্ককরাদিমুক্তভাবে আনীত মালামাল খোলাবাজারে বিক্রির অভিযোগ তদন্ত ও এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের কাস্টমস গোয়েন্দার অন্যতম কাজ। বন্ডেড পণ্যের অবৈধভাবে খোলাবাজারে বিক্রিরোধে এ দপ্তর হতে রাত্রিকালীন টহল ডিউটি করা হয়। মেসার্স ফারদিন এক্সেসরিজ নামীয় একটি বন্ডেড প্রতিষ্ঠান তদন্তে প্রায় ১২ কোটি, মেসার্স দেশ সোয়েটার লি. নামীয় একটি বন্ডেড প্রতিষ্ঠান তদন্তে প্রায় ২.১০ কোটি, মেসার্স হ্যানজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লি. নামীয় একটি বন্ডেড প্রতিষ্ঠান তদন্তে প্রায় ২.৩৮ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির তথ্য উদঘাটন

করা হয়েছে। ২৩.০৪.২০১৫ তারিখে চট্টগ্রামস্থ বিমানবন্দরের দক্ষিণপাশে ব্রিজ এলাকা হতে বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত পিপি দানা খোলাবাজারে বিক্রয়ের সময় ২টি কাভার্ড ভ্যানসহ ১.৩৭ কোটি টাকা মূল্যের ৩২,৪৭৫ কেজি পিপি দানা আটক করা হয়েছে। মেসার্স কর্গশিট নামের একটি বন্ডেড প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করে প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার রাজস্ব ফাঁকির তথ্য উদঘাটন করা হয়েছে।

০৪.০৩.২০১৫ তারিখে মেসার্স মুনস্টার মার্কেটিং (প্রা.) লি.-এর কারখানা হতে ২০ কোটি টাকা মূল্যের নকল ও অবৈধ পণ্য আটক করা হয়। আটককৃত পণ্যের মাঝে আছে বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কসমেটিকস পণ্যের খালি কৌটা ও মোড়ক। দীর্ঘদিন ধরে উক্ত কারখানায় নকল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত প্রসাধনীসামগ্রী দিয়ে পাত্রগুলো রিফিল করে বাজারজাতকরণ করা হয়েছে। একই তারিখে মেসার্স এম. কে. ইলেকট্রনিক্স-এর কারখানা হতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ইলেকট্রনিক্স পণ্য আটক করা হয়েছে।

ভুয়া বিল অব এন্ট্রি দাখিলের মাধ্যমে মিথ্যা ঘোষণায় বিলাসবহুল গাড়ি আমদানির ঘটনা উদঘাটন করে কাস্টমস গোয়েন্দা সম্প্রতি নন্দিত হয়েছে। একজন অসাধু ব্যবসায়ী ২০০৯ সালে বিলাসবহুল এ মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িটি আমদানি করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি সরকারকে কোনো ট্যাক্স প্রদান করেননি। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের সহায়তায় উক্ত গাড়িটি আটক করে কাস্টমস গোয়েন্দা। বিষয়টি মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচার করা হয়।

গত কয়েক মাসে দেশের অভ্যন্তরে চোরাচালান ও সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে কাস্টমস গোয়েন্দার বিভিন্ন অভিযানে আটক হয়েছে কতিপয় বিদেশি নাগরিক। পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশের কিছু নাগরিক এদেশে এসে ব্যবসায়ের আড়ালে চোরাচালান, মাদক ব্যবসায় ও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছেন। ০১ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগত পাকিস্তানি একজন নাগরিক এবং তার কন্যার কাছ থেকে দুই কোটি ষোল লক্ষ টাকা মূল্যমানের ভারতীয় নকল রুপি উদ্ধার করে কাস্টমস গোয়েন্দা। একই বছরে ২৮ সেপ্টেম্বরে আবদুল হালিম পুরি নামের আরেকজন পাকিস্তানি নাগরিককে ৩.৫ কোটি টাকা মূল্যের পাকিস্তানি পণ্যসহ গুলশানের একটি অভিজাত বাড়ি হতে আটক করে কাস্টমস

গোয়েন্দা। এই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে গুলশানের ওই বাড়িতে অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে আসছিলেন। অনুরূপভাবে ১০ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে গুলশানের পিংক সিটির একটি দোকান হতে একজন পাকিস্তানি ও একজন ভারতীয় নাগরিককে বিপুল পরিমাণ পাকিস্তানি তৈরি পোশাকসহ গ্রেপ্তার করে কাস্টমস গোয়েন্দা। উক্ত বিদেশি নাগরিকদ্বয় এ সকল পণ্য আমদানির স্বপক্ষে কোনো দলিলপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। উল্লেখ্য যে, তারা অন্য কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধের সাথে জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য গুলশান থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। চোরাচালানের পাশাপাশি এ সকল বিদেশি নাগরিক অবৈধ মাদক ব্যবসায়ের সাথেও যুক্ত হয়ে পড়ছে। বনানীর পিয়ংইয়ং রেস্টুরেন্ট হতে Ms. Ryang Sun Hwa নামের একজন উত্তর কোরিয়ার নাগরিককে বিপুল পরিমাণ যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট ও অ্যালকোহলসহ আটক করে কাস্টমস গোয়েন্দা। সম্প্রতি বিদেশি কোনো কোনো নাগরিক যে বাংলাদেশে বৈধ ওয়ার্ক পারমিট ব্যতীত ব্যবসায়ের আড়ালে বিভিন্ন অপরাধমূলক পেশার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছেন, তা সর্বপ্রথম কাস্টমস গোয়েন্দার এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। এই ধরনের অভিযানের সফলতা কাস্টমস গোয়েন্দার কার্যক্রমে যুক্ত করেছে ভিন্নমাত্রা ও গুরুত্ব।

চোরাচালান এবং কাস্টমস-সংক্রান্ত জালিয়াতি ও অনিয়ম উদঘাটনের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্প ও পণ্যের বাজার সংরক্ষণে, ফাঁকিকৃত বিপুল অঙ্কের সরকারি রাজস্ব আদায়, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিহত করতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট রয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিজ্ঞ পথনির্দেশনায় এদপ্তর তার কর্মযজ্ঞে বৈচিত্র্য ও গতিশীলতা আনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরলস প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে। সীমিত জনবল ও প্রযুক্তি সত্ত্বেও কাস্টমস গোয়েন্দা তার কর্মক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত ও কার্যক্রমকে আরও বেগবান করছে। কাস্টমস অপরাধমুক্ত সুস্থ বাণিজ্যিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কাস্টমস গোয়েন্দা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্প্রতি ঘোষিত নতুন এনবিআর এবং সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই দপ্তর আরও সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবে।

- লেখক **শেশুফতা মাহজাবীন**, সহকারী পরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

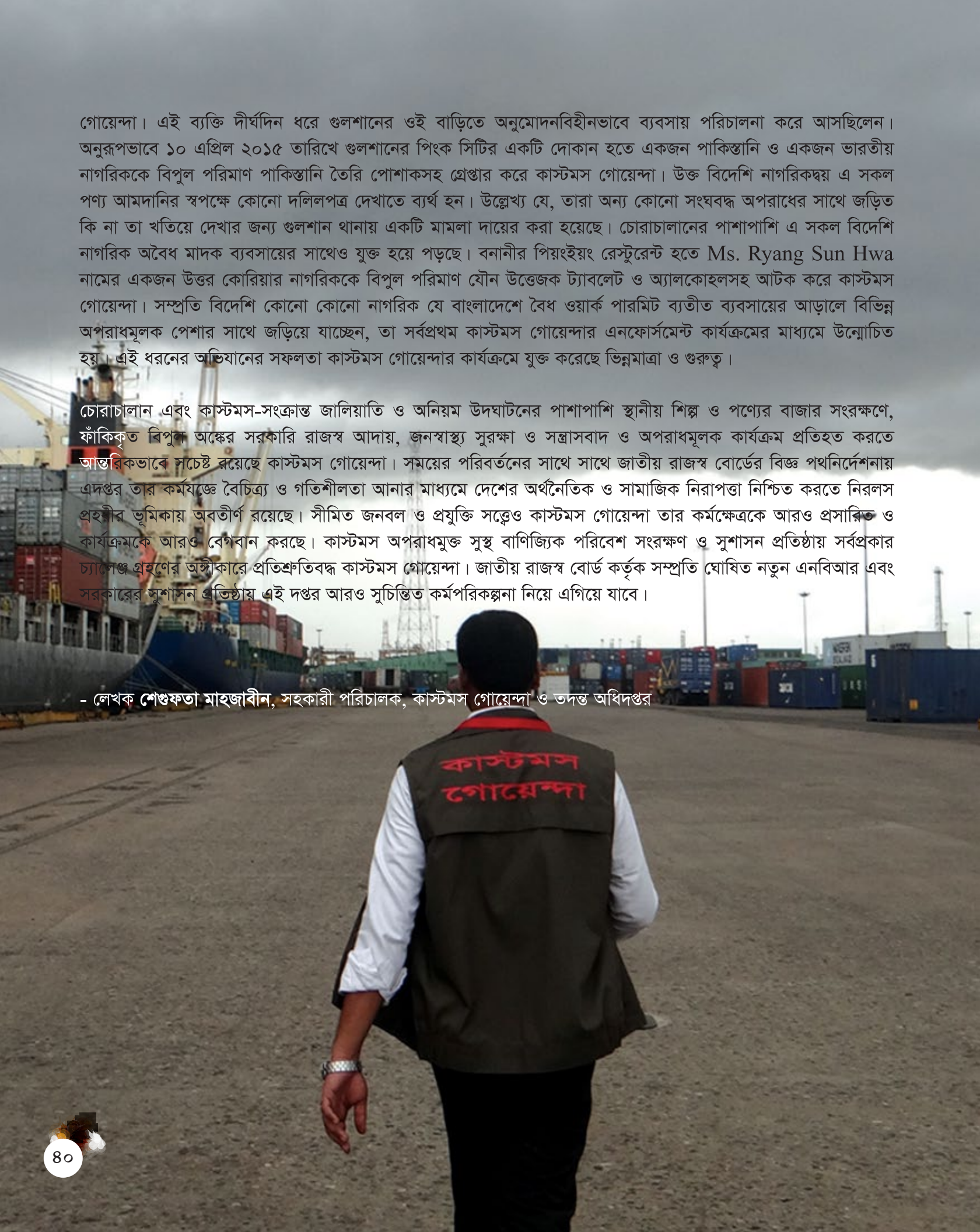

Bangladesh Country Report to RILO AP, 2014

Dr. Moinul Khan

Introduction

Bangladesh's close geographical proximity to South Asia and South-East Asian regions often draws attention due to its strategic location and at the same time vulnerability to smuggling and illegal trade. Throughout the past decades, Bangladesh embraced and made its smooth pathway to liberal economic policies with the priority given to greater trade facilitation to achieve a higher growth and faster socio-economic development. As a consequence of these policies, the country also witnessed a sharp rise in illegal and informal trade activities due to the demands of both domestic and neighbouring markets. Given the locational peculiarities, Bangladesh also tried to provide gridlock surveillance on the network of offenders and criminal attempts. As the first line of defense at the borders, Bangladesh Customs and Customs Intelligence have stood as prime pillars along with other law enforcing agencies of the country against such smuggling. In recent times, a more upward trend of detection, seizure and arrest shows the continuous efforts and the successes of this surveillance. This paper gives an indication of recent routes, trends, and patterns of the major smuggling activities of Bangladesh and provides an overview on the enforcement to stop such smuggling attempts.

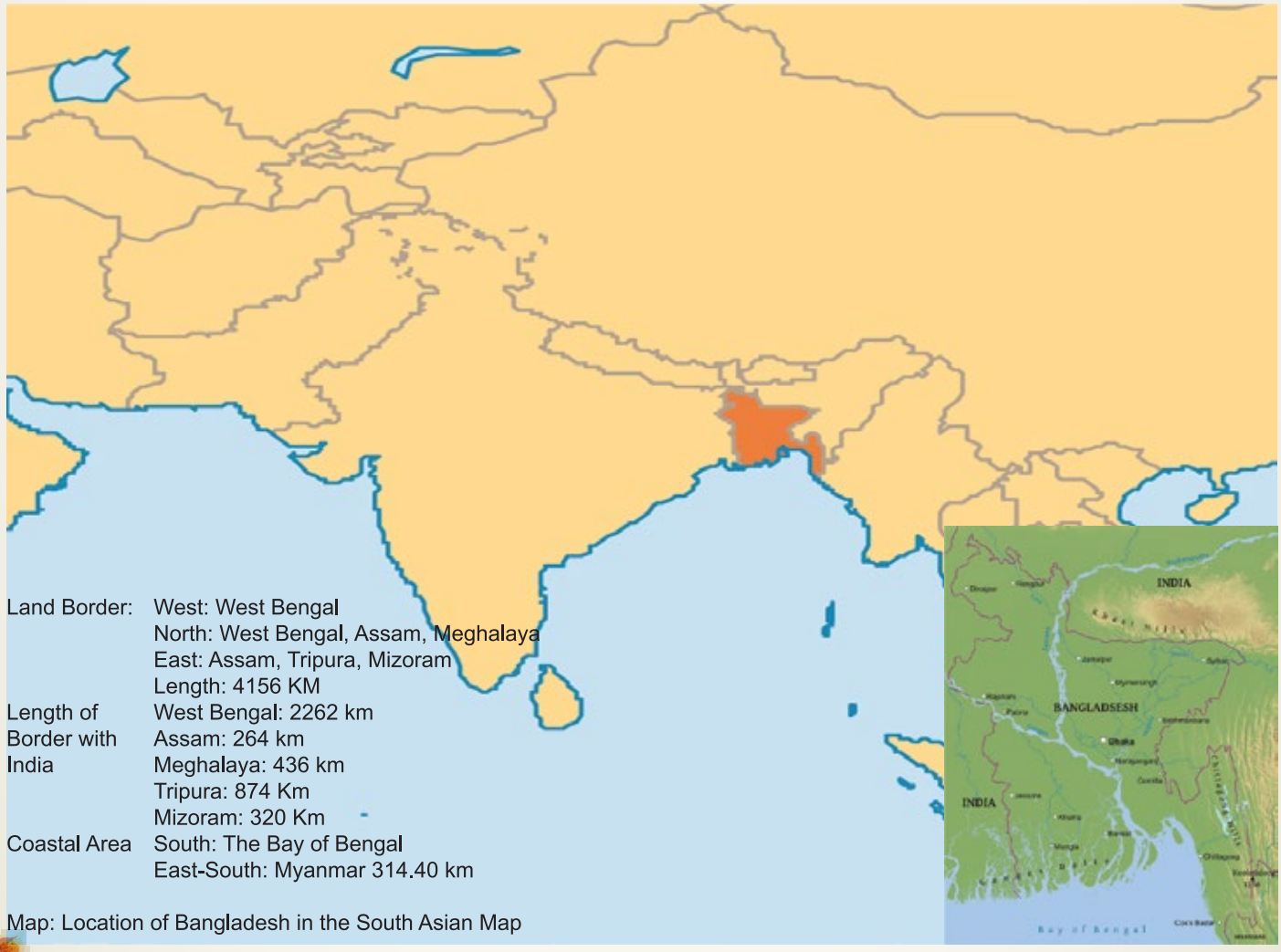

Land Border:	West: West Bengal
	North: West Bengal, Assam, Meghalaya
	East: Assam, Tripura, Mizoram
	Length: 4156 KM
Length of Border with India	West Bengal: 2262 km
	Assam: 264 km
	Meghalaya: 436 km
	Tripura: 874 Km
	Mizoram: 320 Km
Coastal Area	South: The Bay of Bengal
	East-South: Myanmar 314.40 km

Map: Location of Bangladesh in the South Asian Map

Drug Trafficking

Although Bangladesh is not basically a drug producing country, it has remained vulnerable to drug trafficking. It is mainly due to its geographical location as it stands in the cradle of the largest producers of heroin and hashish, the Golden Triangle and Golden Crescent. Apart from its proximity to that zone, Bangladesh is surrounded from three sides by India, which is considered as porous border. Such location has made itself exposed to trafficking of illegal goods including drugs. For example, phensedyl, one of most threatening drugs for Bangladesh, is produced in India for cough treatment. However, this syrup with abnormally high codeine is used as drug by many young people in Bangladesh and causing a major problem in the society. The other recent trend is the trafficking of yaba which mainly come from another neighbor Myanmar. A huge quantity of yaba has been seized while being smuggling into the country from the other side of the borders. While in most of the cases of yaba trafficking, the origin has been found Myanmar, in some cases the yaba tablets came through the Indian borders from Myanmar mainly to camouflage the routes. The Department of Narcotics Control Department is a leading agency for preventing such trafficking. This agency seized 14347 bottles of phensydyl in 2014 (till July) while 2,70,856 pieces of yaba tablets in the same period. Other agencies including Border Guard Bangladesh and Police also seized the smuggled drugs with approximately similar figures.

Bangladesh Customs has, of late, given emphasis to seizure and arrest with regard to illicit drug trafficking. On 9 March 2014, Customs officials recovered 8 kg of heroin from the foreign postal office of Sylhet. The parcel was sent from Pakistan using the postal service. The moistened surface of the packets grew suspicion to the customs officers who worked at the station. The consignment came into four master parcels which contained eight bags made of cloth. Within these bags there were 442 mini packets containing the heroin secured in the foam cover lining. The market value of the seized heroin was estimated at Tk. 80 million. It is one of the largest drug seizures of the current year (2014). On preliminary inquiry, it was found that the sender used fake identity of both the sender and the recipient. A detailed investigation has now been underway by the police.

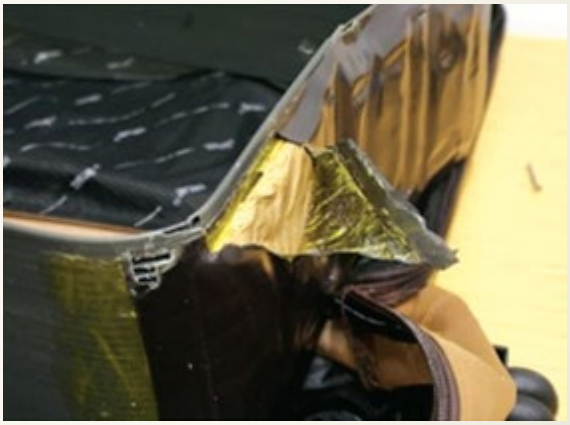

Heroin recovered from parcel by Bangladesh Customs on 9 March 2014

As the country is witnessing increased challenges of trafficking of drugs the Government of Bangladesh is trying to develop efficient strategies to protect the borders against the violations by the traffickers and the offenders. Efforts are underway to adopt a comprehensive approach to reduce the supply as well as the demand of the drugs by enacting laws, engaging more agencies and organizations and securing its borders and coasts by increasing surveillance, as well as seeking the active cooperation of its neighbors and the international community. An awareness programmes are also given due importance to check the internal demands for drugs.

Gold Smuggling in Bangladesh

In 2013-2014 Fiscal year, there was an unprecedented seizure of gold at different airports of the country. A total of 565.75 KG gold was alone seized by the officials of Customs Intelligence and Investigation Directorate whereas the amount was only 5.56 KG in the 2012-13 year. Other agencies of Customs also seized the smuggled gold in the same way. Bangladesh is witnessing a huge leap in gold smuggling which resulted mainly from the rise of import duty on gold in India from 3 to 10% in 2013. It is evident from the seizure records that almost each and every day gold haul has become quite common at the international airports of the country. More than 100 major cases of gold smuggling have been detected by Customs. Recovery of 105 kg of gold worth of TK. 450 million on 26 April 2014 was one of the largest in terms of both the quantity and value in the current year.

According to the intelligence reports, this illicit import of gold is mainly intended for the market of India using the porous borders. Bangladesh has been tried by the transnational groups as a transit point to smuggle such precious metal to the neighboring country. Different law enforcement agencies have often seized smuggled gold and detained many people while crossing the borders with gold. Indian agencies are also reported to have seized gold on their side while illegally trafficking from Bangladesh. Such seizure and arrest in the borders indicate that the main destination of such smuggled gold is Indian market.

Although there is no exact study of gold consumption in Bangladesh but the figure is estimated at 5 tons a year. However, there was no legal import during the last five years. It is believed a portion of the smuggled gold is being left behind in the domestic market to meet the internal demand. Local jewelers also rely on the gold brought by the expatriates who are allowed to bring 200 grams of gold bars on payment of taxes under baggage facility. However, before the tax was only Tk. 150 per 11.664 grams (whereas it is about Tk. 4000 in India) which helped to accumulate inside the country and then to smuggle out to the neighboring country. In the current fiscal year, the government has raised the tax from Tk. 150 to Tk 3000 for the same amount mainly to match for the Indian tax. This measure has largely put a check on the trend of smuggling of gold brought under baggage facility. However, the smuggling under concealment has still remained a major concern.

Pictures of gold bars seized by the officials of Customs Intelligence in various operations at the airports.

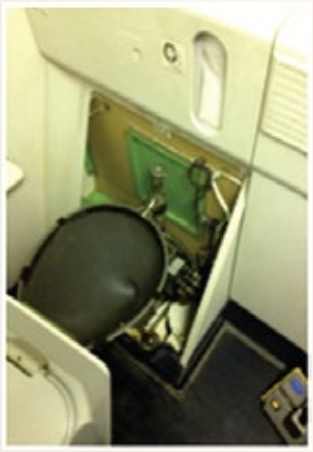

Case Study

On 26th April 2014, Officials of Customs Intelligence seized 105 KG gold from the toilet chambers of an aircraft. Acting on a specific intelligence input, a group of officials rummaged the aircraft which came from Dubai. Officers got the information that one aircraft mechanic assistant was involved in the smuggling bid. After identifying him, the officials took hold of his mobile phone and found some short messages which provided the direction of the hidden gold. After a relentless five-hour close inspection of the aircraft, officials were successful in seizing 904 pieces of gold bar hidden inside the chambers of seven separate toilets of the aircraft. It was the largest gold haul of the year 2014 valued at Tk. 450 million. The gold bars were stitched with clothes.

Most of the smuggled gold was seized in bricks, bars and biscuits format. Due to the increased surveillance by Customs, the offenders are trying develop new techniques to conceal the smuggling of this precious metal. Customs officials are also at par with them while detecting this smuggling. Some of the concealment methods include disguising the gold inside the

walls of machinery chambers, microwave oven, multimedia projectors, motor of exhaust fans, pens, wrist watches and pasting with scotch tape along the ankles and the waist. Further to this vein is that they have made every effort to conceal the metal to make sure that it is not visible in the customs scanning machines. In last couple of months, there were cases where gold was seized from small packets tightened with thick tape and coated with different chemicals and colours. This clearly indicates the camouflage which was applied to hide the gold.

The other issue is that the offenders have sometimes used aircraft body to conceal the gold. In that process, some of the employees working at the airports are susceptible to connivance to clear the smuggled gold out of the ports. In two major incidents on 24 July 2013 and 26 April 2014, the carrier aircraft was believed to have been used in such connivance. A police investigation has been going on to find out the culprits. Another issue relating to such smuggling is that in most of the cases it was found that the arrestees are not the actual owner. They are poor expatriates who bring smuggled gold into the country on payment of some money. In some cases, they carried the gold inside their baggage on good faith without knowing it. The offenders often use their simplicity in such smuggling and try to remain unseen.

Currency Smuggling

There is an upward trend of smuggling of currency notes as more consignments of currency are being seized by the officials of Bangladesh Customs. On 29 April 2014 the biggest ever haul of Indian currency with the face value of Rs. 65 million rupees were recovered from the Airfreight Unit of Hazrat Shahjalal International Airport. As many as fifteen major cases have been detected by the officials of Customs Intelligence this year and 60% of the seized currencies were Indian Rupees. In many of the cases, the carriers were also arrested. Different concealment methods were also used through baggage and parcels.

From the cases, it was found that the seized currencies were originated from Pakistan. Frequent seizure of Indian Rupees has intensified the suspicion that Bangladesh is often tried as a route to smuggle the counterfeit currency to India. According to the intelligence reports, most of this Indian Currency Note (FICN) is printed in sophisticated machines. The quality of the FICN is so high that it is often difficult to ascertain its genuineness with the naked eye. Officials of Bangladesh Customs only make an informed guess from the seized notes of the bundles with the same number on them. Bangladesh does not have any sophisticated device available to test and certify its genuineness. As a result, all the currencies, deemed fake, are being deposited with the central bank which finds it difficult to dispose them off. According to the provisions of the customs laws, the import of fake currency is illegal and subject to seizure. However, unless it is tested and certified, the Customs cannot consent to destroy them. Customs Intelligence is exploring to seek assistance in this regard.

Photos of seized FICN by the officials of Customs Intelligence

Tobacco and other smuggling

Bangladesh is one of the largest tobacco consuming countries of the world. Over 58% of men and 29% of women use some form of tobacco. Given the high levels of tobacco uses, Bangladesh faces an upward trend in tobacco smuggling of foreign branded cigarettes coming through land, sea and air ways. The availability of foreign made brands in local markets risked the domestic tobacco industries to an unparallel competition as most smuggled cigarettes are entering in the black market without paying taxes and avoid legal compliances. It is important to note that taxes on tobacco form one of the highest sources for domestic revenue. Considering this, Bangladesh Customs has also intensified its drive to check such smuggling. In the period from October 2013 to September 2014, Customs Intelligence seized 18043 cartons of foreign cigarettes worth of Tk. 30.06 million. From the seizures, it was found that most of these cigarettes come from UAE, Singapore, Thailand and Hong Kong. The brands include Essey, Dunhill, Black, and Benson & Hedges.

Photos showing seized smuggled cigarettes

Throughout the year of 2014, similar efforts have been taken up to stop other forms of illegal trafficking of contrabands and counterfeited items. Customs Intelligence seized several consignments including fake mobile sets, unauthorized medicines and alcohols. Most of them came from China, Singapore and Turkey. Recently, an import of huge quantity of low graded infusion sets was found in an investigation by the Customs Intelligence officials. The value of those infusion sets was estimated at about Tk. 200 million.

Photos Of Seized Smuggled Mobile Phone

Commercial Fraud

Besides the illicit trade, commercial fraud is another area of concern for Bangladesh Customs. It has usually taken place in many forms with the primary aim of evading payment of duties or avoiding regulatory provisions of the country. The scope of commercial fraud also includes gaining illegal commercial advantages and in some cases trade based money laundering. Many of the fraudulent cases are related to valuation, description, quality, quantity and classification. Customs officials have intensified enforcement in all the ports where large quantities of commercial goods are being imported on a regular basis. It has developed an internal risk assessment system and considers the problem of fraudulent practices as one of its priorities in its prevention functions. Customs Intelligence initiated about 770 such cases where about Tk. 471 million additional taxes were due.

Conclusion

Bangladesh Customs is playing a vital role in preventing outright smuggling and commercial fraudulent attempts. As most of the time, the country is being tried as a transit route to smuggle goods to its neighboring countries, it has tightened its vigilances and increased its checks in the major customs points. To reduce the risk of smuggling, Customs officials have taken holistic and multi-pronged approaches through capacity-building, intelligence-gathering and information-sharing among the local and international networks for a better coordination. To achieve the aim of better performance in anti smuggling activities Bangladesh Customs particularly Customs Intelligence are working closely in liaison with concerned agencies both within and the beyond the borders. Finally, Customs Intelligence believes a better coordination is a must for an effective surveillance and enforcement.

- Author **Dr. Moinul Khan,** Director General, Customs Intelligence and Investigation Directorate (*This report was prepared and read out at the 26th National Contact Point (NCP) Meeting of RILO AP held in Colombo, Sri Lanka, in 11-13 November 2014)*

MAERSK
MAERSK SEALAND
MAERSK

Paving Way to the Future...
Customs Intelligence

লেন্স অব মিডিয়া

উম্মে নাহিদা আক্তার

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মপন্থা বা ফিল্ড স্ট্র্যাটেজিতে বেশ বড় রকমের পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তনের মধ্যে মিডিয়ার সাথে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কটি কেমন হবে, কীভাবে হবে এবং কেন হবে এই সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনটিকে অন্যতম হিসেবে ধরে নেয়া যায়। বর্তমানে মিডিয়ার কল্যাণে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সাফল্যের বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও ইতিবাচক উপস্থাপন জনমনে স্বচ্ছতা ও জনগণের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছে। যদি তা না হত, তাহলে স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি কীভাবে নিশ্চিত হতো কিংবা কীভাবে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি

হতে পারত এসব আলোচনা না করলে এই মিডিয়া বনাম কাস্টমস গোয়েন্দা সম্পর্কের রসায়নের যথার্থতা উপলব্ধি করা হয়ত সম্ভবপর হবে না।

প্রথমে বলতে হবে এই অধিদপ্তরটি বাংলাদেশ কাস্টমসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা দপ্তর। কাস্টমস সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উপর সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রাখা এই অধিদপ্তরের মূল কাজ। এরই সূত্র ধরে কাস্টমস আইন ও দেশের প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ভঙ্গ করে, কাস্টমস সীমানা পেরিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তি হতে শুরু করে যে কোন জনস্বার্থ পরিপন্থী পণ্যের অনুপ্রবেশ বা চোরাচালান প্রতিহত করা আমাদের প্রতিদিনের কাজের অংশ। একইসাথে দেশের বাণিজ্য নীতি কীরূপ হবে এবং অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে দেশিয় বাণিজ্য কীভাবে উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হলে দেশিয় স্বার্থ সুরক্ষা হবে তা বিশ্লেষণ করে সীমান্ত দ্বার কতটুকু খোলা হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কী শর্তে খোলা রাখা হবে বা যেভাবে চলছে তা সার্বিকভাবে কতটা ফলপ্রসূ তা বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে যথাযথ ও সময়োপযোগী মতামত প্রদান করাও এই অধিদপ্তরের কাজ। সুতরাং এখানে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, দেশের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা হতে এই গোয়েন্দা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ভিন্নমাত্রার এবং ভিন্ন আঙ্গিকে সম্পন্ন করতে হয়।

অনেকেই মন্তব্য করে থাকেন, গোয়েন্দা কার্যক্রম গোপনভাবে সম্পাদিত হওয়াই শ্রেয়, তা নিয়ে মিডিয়া আলোড়নের খুব বেশি প্রয়োজন নেই। এই মতাদর্শ অবশ্যই অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার জন্য যতটা যুক্তিযুক্ত, আমাদের গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য ঠিক ততটা প্রযোজ্য নয়। কারণ:

প্রথমত, আমাদের মূল কাজ যেহেতু চোরাচালান প্রতিহতকরণ, সেহেতু এই চোরাচালান অভিযানের মিডিয়া প্রচারণায় জনমনে কেমন প্রভাব পড়ছে, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। খুব সাধারণভাবে বলা যায়, টিভির পর্দায় বা নিউজ পেপারের লিড নিউজ হিসেবে একটি রক্তাক্ত দেহের ছবি বা বীভৎস খুনের লোমহর্ষক কাহিনি পড়ে জনমনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যেমন স্নায়ুবিক চাপ সৃষ্টি করে; এর তুলনায় টেবিলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত সারিবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে রাখা ঝকঝকে গোল্ডের ছবি স্নায়বিক চাপটিকে কি শিথিল করেনা? বিশ্ব জুড়ে যখন আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় বইছে কী ধরনের নিউজ মিডিয়ায় বেশি বেশি আসা প্রয়োজন, "Good News"? or "Bad News" ? এক্ষেত্রে Bad news প্রচারণার ফলে সমষ্টিগতভাবে সামাজিক মনস্তত্ত্বে যে জাতিগত হতাশা বা গ্লানি সৃষ্টি হয় তার তুলনায় বেশি বেশি Good News ছাপানো ভালো নয় কি? এর ফলে সমষ্টিগতভাবে সামনের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে জাতি স্বপ্ন দেখতে পারে। সকল সামাজিক শঙ্কা ও হতাশা ছাপিয়ে জাতিগত প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটা অনেকটা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ পক্ষের সেনার মৃত্যুসংবাদ তার অন্যান্য যুদ্ধসঙ্গীদের মনোবল অটুট রাখার জন্যে প্রচার না করার মতো; আর সাফল্যের সংবাদে সৈন্যশিবিরে উৎসবমুখর পরিবেশে রাতে নৈশভোজ পালন করার মতো।

আমাদের গোয়েন্দা কার্যক্রমের ব্যাপারটি কিন্তু দ্বিতীয় প্রকৃতির। আমাদের সংবাদ, সাফল্যের সংবাদ; আমাদের সংবাদ, জাতিকে স্বস্তি অনুভব করানোর মতো সংবাদ; আমাদের সংবাদে জাতির মনস্তত্ত্বে প্রেরণা, আশা ও স্বপ্নের সঞ্চার হয়। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জাতি ভাবতে পারে, আমার দেশও এগিয়ে যাচ্ছে। সাবাশ বাংলাদেশ!

দ্বিতীয়ত, কাস্টমস গোয়েন্দার কাজে স্বচ্ছতা থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। ১০৫ কেজি গোল্ড বা ৮ কোটি টাকা উদ্ধারের পর যদি স্বচ্ছ মিডিয়া প্রচারণা একই সাথে না থাকে, তবে বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। জনমনে আমাদের কাজ ও ভূমিকা নিয়ে অশুভ শক্তি বিরূপ ধারণা সৃষ্টির পাশাপাশি বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটায়।

তৃতীয়ত, যারা এই ধরণের অন্যায় কাজের সাথে লিপ্ত থেকে রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও জনগণের ক্ষতি করছেন, তাদের ধারণা দেয়া যেন তারা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যান ও বিরত থাকেন। আমাদের এ বছরের ডেটা বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করলে চোরাচালান বিরোধী মিডিয়া তৎপরতার ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্টতই বোঝা সম্ভবপর হবে।

আর সর্বশেষ উদ্দেশ্য হল,তথ্যের সর্বোত্তম বিনিময়, প্রচারণা ও ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী কাস্টমস পরিমণ্ডলের অপরাধ ও অপতৎপরতা রুখতে একটি ট্রান্সন্যাশনাল নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা। যেখানে রাজনৈতিক সীমানা নির্বিশেষে অপরাধীরা সংঘবদ্ধভাবে সীমান্তে চোরাচালানসহ কাস্টমস সম্পর্কিত অপরাধে লিপ্ত রয়েছে; সেখানে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে ট্রান্সন্যাশনাল সম্মিলিত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে না তুললে এককভাবে কোন দেশের কাস্টমস প্রক্রিয়াকে অপরাধমুক্ত করা সম্ভবপর

নয়। এক্ষেত্রে, যেকোন আটক প্রক্রিয়ার আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে অনলাইন টিভি ও পত্রিকায় পৃথিবীব্যাপী প্রচারণার সঙ্গে সঙ্গে RILO তে এবং RILO-র মাধ্যমে WCO- তে প্রতিবেদন পাঠানো হয়। অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির এই সময়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্যের যথাযথ প্রচারণা সম্পন্ন করা আমাদের মূল লক্ষ্য। আর এরই প্রয়াসে ইতোমধ্যেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আটকসমূহ নিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিবেদন নিয়ে প্রযোজিত হয়েছে আমাদের 'লেন্স অব মিডিয়া' অংশটি।

- প্রতিবেদক **উম্মে নাহিদা আক্তার**, সহকারী পরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

সংবাদ

চুপকে চুপকে

বিশেষ প্রতিনিধি | আপডেট: ০২:৩১, ডিসেম্বর ০৩, ২০১৪ | প্রিন্ট সং

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে চুপকে চুপকে সিনেমার নাম বলেছেন দুবার। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কয়েকজনের সঙ্গে গভীর রাতে চুপকে চুপকে দেখা কেন? প্লাস্টের পোপন অভিসার বাদ দিন। যা করবেন দিনের আলোয় করুন।' বিমানবন্দরে সোনা ধরা পড়ার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ত্রাগে সোনা ধরা পড়ত না। এখন ধরা হচ্ছে বলেই তা জানা যাচ্ছে। নইলে চুপকে চুপকে হয়ে যেত।' উল্লেখ্য, চুপকে চুপকে নামে হিন্দি সিনেমা রয়েছে, যার বাংলা অর্থ চুপি চুপি

প্রথম আলো বুধবার, ৮ এপ্রিল ২০১৫

দেশ পরিচিতি

শুল্ক গোয়েন্দা ডিজি অস্ট্রেলিয়া সরকারের পুরস্কার পেলেন

যুগান্তর

NEWS

Costly car seized

Customs snatch it down 6 years into illegal import

প্রথম আলো রোববার, ১৪ জুলাই ২০১৫

আমদানিকারক আটক

ভিন্ন নামে আমদানি করা এক টন ঘনচিনি জব্দ

সমকাল বুধবার ২২ এপ্রিল ২০১৫ | ৯ বৈশাখ ১৪২২

কমলাপুর আইসিডিতে ৭শ' সিসির ৭০টি মোটরসাইকেল জব্দ

এক টন ঘনচিনি জব্দ

কমলাপুর আইসিডিতে

তেলের সঙ্গে কোকেন

চট্টগ্রাম বন্দরে জব্দ ১০৭ ড্রামের একটিতে কোকেন পাওয়া গেছে। অন্য ড্রামগুলো একে একে পরীক্ষা হচ্ছে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাকা | সোমবার | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ | ৪ ফাল্গুন ১৪২১

পিআইএর চোরাকারবারিদের কন নাম পুলিশের হাতে

সমকাল

স্বর্ণ চোরাচালান রোধে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ভয়ঙ্কর পাকিস্তানি নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশ ভারতে জাল মুদ্রার বিস্তার ॥ সোনা চোরাচালানে ॥ অর্থায়ন করা হয় জঙ্গিদের

সোনাসহ পিআইএ কর্মচারী ও যাত্রী আটক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

The Bangladesh Pridin

পাকিস্তানি নেটওয়ার্ক

জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ মঙ্গলবার

চট্টগ্রাম বন্দরে হাজার কেজি আমদানি নিষিদ্ধ ঘনচিনি জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১ হাজার কেজি আমদানি নিষিদ্ধ ঘনচিনি (সেডিয়াম সাইক্লোমেট) জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদফতর। রবিবার চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এসব জব্দ করা হয়। সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটায় রাজধানীর বাবুবাজার থেকে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ ওমর ফারুককে আটক করা হয়। রাজধানীর কাকরাইলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান শুল্ক গোয়েন্দা ও জরিপ অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি

(১২ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ মঙ্গলবার

৮ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বিমানবন্দরে সোনা চোরাচালান রোধে টাস্কফোর্স

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ বিমানবন্দরে স্বর্ণ চোরাচালান রোধে শুল্ক গোয়েন্দা, বিমান কর্তৃপক্ষ ও সরকারের অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় রাজস্ব বোর্ড (সেন্ট্রাল)। সোমবার এনবিআরের চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান সাংবাদিকদের এ কথা জানান। এর আগে এনবিআরের সম্মেলন কক্ষে বিমানের সমন্বয়ভুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইন মেইরিজের সঙ্গে কাস্টমস বৈঠক করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শুল্ক গোয়েন্দা অধিদফতরের মহাপরিচালক

(৪ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

বিমানবন্দরে সো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ড. মঈনুল খান ছাড়াও এন... উপস্থিত কর্মকর্তাগণ।

সূত্র জানায়, সৌজন্য ... উদ্দেশ্যে বিমানের নতুন ... এনবিআরে ডাকা হয়েছিল ... সেখানে সম্প্রতি ৬২ কে... শুটকের ঘটনায় ... সম্পৃক্ততার বিষয়েও জানতে ... হয়। স্বর্ণ চোরাচালান রোধে ... সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ... নতুন এমডি। এছাড়া ভবিষ্যতে ... ধরনের চোরাচালান রোধে ... শুল্ক ও বিমানের কর্মীরা ... একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজে... দেয় বিমান কর্তৃপক্ষ।

বৈঠক শেষে এনবিআর চে... সাংবাদিকদের বলেন, স্বর্ণ চোর... রোধে কঠোর অবস্থানে ... এনবিআর এক্ষেত্রে ... টলারেন্স নীতি অবলম্বন করা... এ ধরনের ঘটনা অর্থনীতিতে ... প্রভাব ফেলবে তাই বিমান ও... সংস্থার সমন্বয়ে চোরাচালান... যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের উদ্যো... হয়েছে।

নজিবুর রহমান বলেন... চোরাচালানিদের ... অনানুষ্ঠানিকভাবে যৌথ ... গঠনের কাজ চলছে। ... সঙ্গে আলাপ আলোচনা ... টাস্কফোর্সের একটা অনুষ্ঠা... দেয়া হবে। ভবিষ্যতে যে... প্রবণতার আইনবিরোধী কা... কোন সুযোগ না পায়।

এদিকে বিমানের নবনিযু... জাভেদ হোসেন বলেন, স্বর্ণ... চোরাচালানে রোধে সব... সহায়তা দেবে বিমান ক... জন্য তিনিও সার্বিক... সহযোগিতা চান।

চট্টগ্রাম বন্দরে হাজার

(১০-এর পৃষ্ঠার পর)

চালানটিতে সাইট্রিক এসিডের নামে ঘনচিনি আমদানি করা হয়েছে। পরে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনকৃত এজেন্ট বেলি এম... ট্রেডার্সের প্রতিনিধি সঙ্গে নিয়ে শুল্ক গোয়েন্দা এসবের নমুনা সংগ্রহ করে... চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের ল্যাবে পাঠানো হয়। সেখানকার টেস্ট রিপোর্টে প্রমাণ পাওয়ার পর এগুলোকে জব্দ করা হয়।

ড. মইনুল খান জানান, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং তাদের নিবন্ধনকৃত বাহকের বাবুবাজার শাখায় একটি এনটি খোলসে এই ঘনচিনি আমদানির জন্য। তবে ওই এলসিতে তার দেয়া ঠিকানা সঠিক ছিল না। শুল্ক গোয়েন্দার নির্দেশে বাবুবাজার শাখার ব্যবস্থাপনার কৌশলে ওই ঠিকানে তার অফিসে ডেকে আনেন এবং সেখান থেকেই আমরা তাকে গ্রেফতার করি।

তিনি জানান, পৃথিবীর অনেক দেশে ঘনচিনির আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ... এক আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়... ঘনচিনি ব্যবসায়ীরা, আইনজীবী... সাথেই মনোমেহের জন্য অতিরিক...

DHAKA SUNDAY FEBRUARY 22, 2015

NBR yet to realise green tax from polluting industries

আমাদেরসময়

৪০ পাকিস্তানির বাংলাদেশ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

সমকাল

বুধবার
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

শাহজালালে চোরাই স্বর্ণসহ গ্রেফতার ২

আমাদেরসময়

চোর অভিযানে শুল্ক গোয়েন্দা

বিমানবন্দরে সাড়ে ১৯ কেজি স্বর্ণসহ আটক ২

সমকাল

বুধবার
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

শাহজালালে চোরাই স্বর্ণ

যুগান্তর

শাহজালালে সোনা উদ্ধার 'রাঙ্গা প্রভাত' কর্মকর্তা কর্মচারীদের

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

গুলশানে ৫ কোটি টাকার শাড়ি-থ্রিপিস ও শাহজালা দুই কেজি সোনা উদ্ধার

প্রথম আলো

৭০ লাখ জাল রুপি

যুগান্তর

শাহজালালে ১৯ কেজি সোনাসহ গ্রেফতার ২

বাংলাদেশ প্রতিদিন
The Bangladesh Pratidin
ঢাকা । বৃহস্পতিবার । ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ । ২৩ মাঘ ১৪২১
DHAKA THURSDAY FEBRU
The Financial Express
Wednesday, February 4, 2015
Seized gold, currencies
BB, customs to check final disposal
সোনা চোরাচালান : ইমেজ সংকটে বিমান
The Daily Star
Man arrested with Indian
পাকিস্তানি আটক
প্রথম আলো
৭০ লাখ জাল রুপি
জনকণ্ঠ
বিমানের টয়লেট থেকে ৬১ কেজি সোনা উদ্ধার
শাহজালালে বিপুল

যুগান্তর

শাহজালালে ৭০ লাখ জাল রুপিসহ এক ব্যক্তি আটক

নিজস্ব রিপোর্ট

প্রতিদিন আমাদেরসময়

শাহজালালে ১০ কেজি স্বর্ণসহ আটক ৪

শাহজালালে ৭০ কোটি টাকার ৬১ কেজি

কালের কণ্ঠ

সমকাল | সোমবার

শাহজালালে ৮ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার, নারীসহ আটক ৪

শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা মোটরসাইকেলের সিসি পরীক্ষায় বাধা

নিজস্ব প্রতিবেদক

The Daily Star

DHAKA MONDAY APRIL 13, 2015

Five more held with smuggled gold at Shahjalal Airport

STAFF CORRESPONDENT

Customs officials detained five persons with gold bars and ornaments, weighing around 9.5kg, worth around Tk 4.25 crore, at Hazrat Shahjalal International Airport in the capital yesterday.

Acting on a tip off, Customs Intelligence officials detained Maim Uddin, his wife Abida Sultana, their five-year-old son Muzzakir Mohi, and their co-passenger in Biman Bangladesh Airlines flight, BG 087, which flew from Kuala Lumpur, Lucky Akter. They recovered 20 gold bars and some ornaments weighing 4.95kg from their bodies. Meanwhile, at-port, customs detained Poly Rani Das after recovering 4.5kg gold bars from her luggage at green channel.

কাল

৬ ফাল্গুন ১৪২১

শাহজালালে চোরাই স্বর্ণসহ গ্রেফতার ২

সমকাল প্রতিবেদক

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৃথক ঘটনায় সোমবার সন্ধ্যায় চোরাই স্বর্ণবার এবং মঙ্গলবার দুপুরে সিগারেট উদ্ধার করেছে র‍্যাব ও শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ। স্বর্ণ পাচার ঘটনার সঙ্গে জড়িত আবুল কালাম ও কবির হোসেন নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকার স্বর্ণবার উদ্ধার করে র‍্যাব। এদিকে মোহাম্মদ আলী নামে এক পাকিস্তানি নাগরিকের কাছ থেকে ২১৫ কার্টন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেট জব্দ করা হয়।

ডেমরায় ৪০ কোটি টাকা মূল্যের কসমেটিকস জব্দ

বিমান বন্দরে বিদেশি মুদ্রা ও স্বর্ণসহ আটক চার

জাপান থেকে ৮০০ সিমির

৪০ ট্রাক নকল বিদে কসমেটিকস

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ডেমরায় অভিযান চালিয়ে ৪০টি ট্রাকে ভর্তি প্রায় ৪০ কোটি টাকা মূল্যের নকল বিদেশি কসমেটিকস জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। র‍্যাব-১০ ও ভ্যাট কমিশনারেটের (পূর্ব) কর্মকর্তাদের সহায়তায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে নিশ্চিত করেছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক ড মইনুল খান। তিনি জানান, শুল্ক গোয়েন্দারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডেমরায় মুন স্টার লিমিটেড কারখানা অভিযান চালান। এ সময় ৪০টি ট্রাকে ভর্তি প্রায় ৪০ কোটি টাকা মূল্যের নকল বিদেশি কসমেটিকস জব্দ করা হয়।

এর মধ্যে কোতলজাত বিশ্বখ্যাত বডি স্প্রে পারফিউম ও জেল রয়েছে। স্থানীয় নিম্নমানের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে এ কসমেটিকস তৈরি করা হয়েছে; বাজারজাত করে ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতা করা হতো বলে তিনি জানান

সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে বিপুল পরিমাণ নিম্নমানের কসমেটিকস পণ্য জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীর সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার একটি কসমেটিকস কারখানার গুদাম থেকে বিপুল পরিমাণ নিম্নমানের কসমেটিকস ও মিঠা ব্যবহার সামগ্রী জব্দ করা হয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দার একটি বিশেষ টিম বুধবার রাত-এর সংযোগিতায় নামানি অভিযান চালিয়ে এ সব পণ্যের সন্ধান পায়। বিদেশি ব্রান্ড লিবিয়ের, মুনষ্টার, বারোটিং ও মুনষ্টার পণ্যাদির নকলে তৈরি প্রতিষ্ঠানের গুদামে মজুদ ছিল এ সব পণ্য।

শুল্ক গোয়েন্দা মহাপরিচালক ড মইনুল খান জনকণ্ঠকে জানান, এসব বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অনুমতি কথা। এজন্যের কোন বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। অভ্যন্ত নিম্নমান ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য কম মূল্যে কিনে এনে হয়। পরে এগুলোতে বিদেশী নামীদামী ব্রান্ডের প্যাকেট মোড়ক লাগিয়ে বাজারজাত করা হতো। এর কোনটিতেই বিএসটিআই-এর অনুমোদন নেই। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকা। কারখানার মালিক পলাতক।

শাহজালালে প্রথম উদ্ধার হওয়ার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১৪০ কেজি ভারতীয় গলুদ উদ্ধার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতর। ব্যাংকক থেকে আসা একটি ফ্লাইট থেকে বুধবার ভোরে এসব গলুদ উদ্ধার করা হয়।

যুগান্তর

রুট পালটে সো

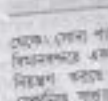

স্বর্ণরাজ্য চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর

স্মাগলার রিনারও কোটিপতি

যুগান্তর

চেরাগে ৪০ কোটি টাকার অবৈধ কসমেটিকস জব্দ কারখানা সিলগালা

ঘণ্টায় চলে তিন শ' মাইল হাইক্যাপাসিটি ৭০ মোটরসাইকেল জব্দ

DHAKA WEDNESDAY APRIL 22, 2015

Customs seizes 70 noncompliant motorbikes in capital

Staff Correspondent

Customs Intelligence and Investigation Department seized 70 illegal motorbikes worth Tk 1 crore from Kamalapur Inland Container Depot in Dhaka yesterday.

Customs officials said the engine capacities of the motorbikes are more than 800cc which is beyond the legal limit.

On March 16 last year, the customs authorities halted the unloading of a consignment of the motorbikes imported by Balden Enterprise of Far Seas Liners.

Following a High Court order on March 23 this year after a law battle, the customs authorities cancelled the motorbikes yesterday and made the seizure.

শাহজালালে ৭০ কোটি টাকার ৬১ কেজি সোনা উদ্ধার

কমলাপুরে ৮০০ সিসি মোটর সাইকেল জব্দ

৪০ ট্রাক নকল বিদেশি

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ২২ চৈত্র ১৪২১
৫ এপ্রিল ২০১৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

সিন্ধিরগঞ্জ থেকে বিপুল পরিমাণ নিম্নমানের কসমেটিকস পণ্য জব্দ

৭ কোটি টাকার মার্সেডিজ বেঞ্জ জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ধানমন্ডিতে সাত কোটি টাকা মূল্যের একটি গাড়ি জব্দ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সমকাল

শাহজালালে কোটি টাকার স্বর্ণবার জব্দ

সমকাল

আমাদের সময়

যুগান্তর

৭ কোটি টাকার মার্সেডিজ বেঞ্জ জব্দ

সেই মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িটি জব্দ

যুগান্তর

উ. কোরিয়ান কূটনীতিকের ব্যাগে ২৭ কেজি সোনা

চলছে ৬ বছর, দেখা মাত্রই স্যালুট অবশেষে ধরা

যুগান্তর

www.jugantor.com

সোমবার ২৮ এপ্রিল ২০১৪ ● ১৫ বৈশাখ ১৪২১

বিমানবন্দরে এবার ৬ কোটি ভারতীয় রুপি উদ্ধার

যুগান্তর রিপোর্ট

সোনা চোরাচালানের নিরাপদ বাহন এখন বিমান

প্রথম আলো

সোমবার, ২৮ এপ্রিল ২০১৪

বাংলাদেশ

সোমবার ২৮ এপ্রিল ২০১৪ ১৫ বৈশাখ ১৪২১

দৈনিক তেঁতুলিয়া

শাহজালালে ছয় কোটি জাল ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার

ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মূলত ভারতে পাচারের জন্য রুপিগুলো আনা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শাহজালালে জাল ও ওষুধের চালান আটক

আমাদের সময়

শাহজালালে ৬ কোটি জালরুপি উদ্ধার

The Daily Star
Rs 6cr fake Indian notes recovered
সমকাল
চোরাই স্বর্ণের ২৫৯ কেজি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে
সোনার শুল্ক ২২ গুণ বাড়ানোর প্রস্তাব
আমাদেরসময়
এবার বিমান আটক
দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ২২ বৈশাখ ১৪২১
৫ মে ২০১৪
শাহজালাল বিমানবন্দরে ছয় কেজি সোনাসহ একজন আটক
বিশেষ প্রতিনিধি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৬ কেজি সোনাসহ আব্দুর রাজ্জাক (৬০) নামক একজনকে আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। উদ্ধার হওয়া সোনার মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা।
শাহজালালে ফের ৬ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১
এবার রোগীকে নিয়ে সোনা

জনকণ্ঠ

দৈনিক ইত্তেফাক

The Daily Star | 5

DHAKA TUESDAY MAY 6, 2014

8kg of smuggled gold seized at Dhaka airport

STAFF CORRESPONDENT

The customs intelligence seized eight kilograms of smuggled gold from a passenger, who emptied a total of 72 bars into a bathroom sensing security men around at Hazrat Shahjalal International Airport in the capital last evening.

The detained man, Mesahar Hidden, 36, was coming back from Dubai by Emirates Airlines, and officials had information about the smuggling, said Shamsuddin Rahman, deputy director of the customs intelligence. The value of the gold was estimated at Tk 4.7 crore.

গ্রেফতার ১

শাহজালালের টয়লেট থেকে সাড়ে ৮ কেজি সোনার বার উদ্ধার

আমাদের সময়

শাহজালালে ৮ কেজি স্বর্ণবারসহ আটক ১

যুগান্তর

www.jugantor.com

১ কোটি ৯১ লাখ টাকার স্বর্ণের ৩ চালান আটক

শাহজালালে গ্রেফতার ৬

শাহজালালে ৭২টি বারসহ

শাহজালাল ও বেনাপোলে সাড়ে ১২ কেজি সোনা উদ্ধার

ঢাকার ইন্টারনেশনাল, বেনাপোল, মহদিপুর, সোনাহাট ও রাজশাহী পদ্মাবাদের পেট্রাপোল, কলকাতা, বসিরহাট, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার শঙ্কিপুরী থেকে পরাবর্তনী সিডিকেটী প্রতিনিধি সব চেকপোস্ট দেবার বিষ্টি পরার করায়

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তেও সোনার ছড়াছড়ি

দৈনিক ইত্তেফাক

তিন কোটি ১০ লাখ টাকার সোনা ও

ল 'হোতা'সহ গ্রেপ্তার ১০

জনকণ্ঠ

বস্তা বস্তা টাক

যুগান্তর

কালের কণ্ঠ

বিমানবন্দরের জন্য ২০১৪ ছিল 'গোল্ডেন ইয়ার'

মোহাম্মদ
৬ দিনের

গুলশানে ৫ কোটি টাকার শাড়ি-থ্রিপিস ও শাহজালালে দুই কেজি সোনা উদ্ধার

'চোরাকারবারি' এক পাকিস্তানিকে ছাড়ালেন ডেপুটি হাইকমিশনার

আমরা জনগণের পক্ষে

বাংলাদেশ প্রতি

কালের কণ্ঠ

যুগান্তর

শাহজালালে ২ কেজি স্বর্ণ গুলশানে ৫ কোটি টাকার কাপড় জব্দ

পল্টনে উদ্ধার বস্তায় ৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকা

বাংলাদেশ প্রতিদিন

The Bangladesh Pratidin

টাকা-রিয়াল গুনে ক্লান্ত কর্মীরা!

সকালের খবর

রাঙা প্রভাতের ভেতরে ৬১ কেজি সোনা

শাহজালালে আবারও বিশাল চালান
বিমানের টয়লেট থেকে ৬১ কেজি সোনা উদ্ধার

দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন আমাদের মূলমন্ত্র

কাস্টমস গোয়েন্দা

বুলেটিন বোর্ড

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অফিস পরিদর্শনকালে
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সিলেটের শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত “কমব্যাটিং কাউন্টারফেইটিং অ্যান্ড পাইরেসি” শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি।
মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী, এমপি;
মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি
এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

বক্তব্য রাখছেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মইনুল খান

কর্মশালায় ড. মইনুল খান মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক উপস্থাপিত নমুনা:
গত ২৮ জুলাই ২০১৫ তারিখে কাস্টম হাউজ আইসিডি কমলাপুরে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক দি কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর সেকশন ১৫ এবং ১৬ লঙ্ঘনের জন্য ট্রেডমার্ক ও ট্রেডবর্ণনাবিহীন হেয়ারজেল আটক (বামে)।
এই পণ্য L'ORÈAL (made in France) হিসেবে বাজারজাত করা হচ্ছে (ডানে)।

কর্মশালায় ড. মইনুল খান মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক উপস্থাপিত নমুনা: আমদানি নিষিদ্ধ ঘনচিনি। স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ ঘনচিনি মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ও কোমল পানীয় তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ পণ্য আমদানির দায়ে পণ্যসহ একজনকে আটক করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা

কর্মশালায় ড. মইনুল খান মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক উপস্থাপিত নমুনা: নারায়নগঞ্জের শিমরাইলে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত ৪০ ট্র্যাক বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রসাধনীর খালি কন্টেইনার

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৫ তে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অরগানাইজেশন প্রদত্ত সার্টিফিকেট অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন কাস্টমস গোয়েন্দার মহাপরিচালক ড. মইনুল খান

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৫ তে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অরগানাইজেশন প্রদত্ত সার্টিফিকেট অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন কাস্টমস গোয়েন্দার সহকারী পরিচালক মো. কামরুজ্জামান

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আটককৃত স্বর্ণ

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আটককৃত স্বর্ণ

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত দেশি-বিদেশি মুদ্রা

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত দেশি-বিদেশি মুদ্রা

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত আমদানি নিষিদ্ধ ঔষধ

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত বিদেশি সিগারেট

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত পণ্য

কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত পণ্য

চোরাচালান প্রতিরোধ ও রাজস্ব সুরক্ষায় কাস্টমস গোয়েন্দার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের কয়েকটি স্বীকৃতি

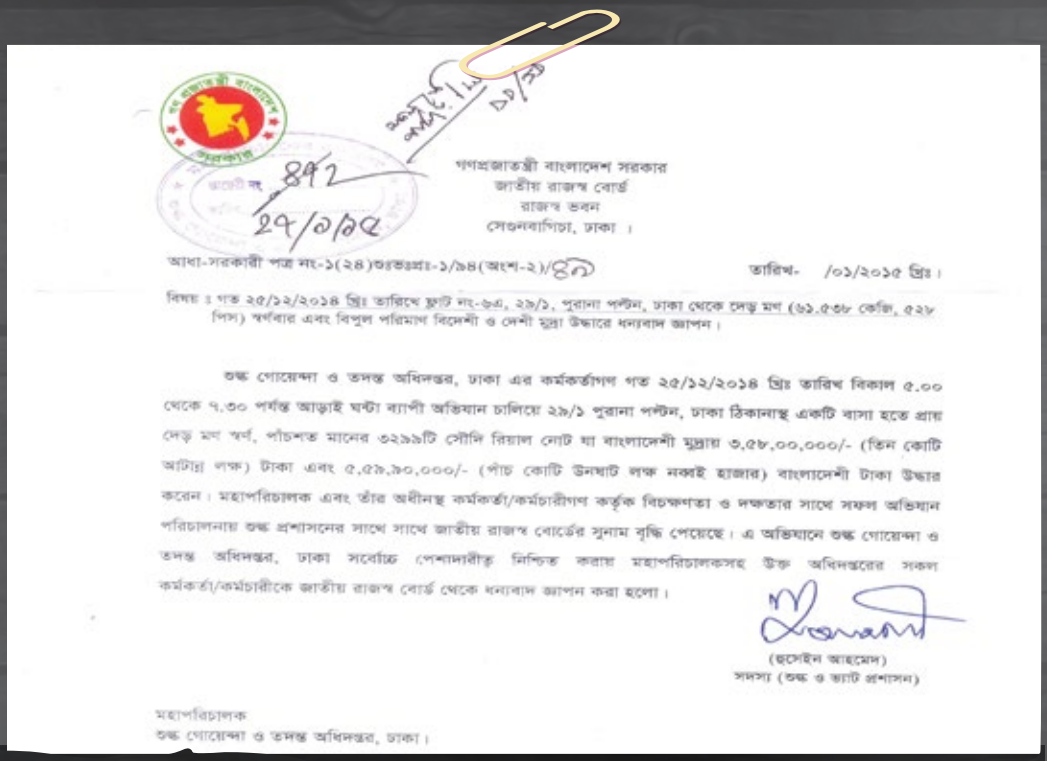

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।

আধা-সরকারী পত্র নং-১(২৪)শুল্কঃগোঃ-১/৯৪(অংশ-২)/৪৫৩ তারিখ- /০১/২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ গত ২৫/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ফ্ল্যাট নং-৬এ, ২৯/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে দেড় মণ (৬১.৫৩৮ কেজি, ৫২৮ পিস) স্বর্ণবার এবং বিপুল পরিমাণ বিদেশী ও দেশী মুদ্রা উদ্ধারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর কর্মকর্তাগণ গত ২৫/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৫.০০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত আড়াই ঘন্টা ব্যাপী অভিযান চালিয়ে ২৯/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ঠিকানাস্থ একটি বাসা হতে প্রায় দেড় মণ স্বর্ণ, পাঁচশত মানের ৩২৯৯টি সৌদি রিয়াল নোট যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩,৫৮,০০,০০০/- (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ) টাকা এবং ৫,৫৯,৯০,০০০/- (পাঁচ কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার) বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার করেন। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে সফল অভিযান পরিচালনায় শুল্ক প্রশাসনের সাথে সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অভিযানে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা সর্বোচ্চ পেশাদারীত্ব নিশ্চিত করায় মহাপরিচালকসহ উক্ত অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

(হুসেইন আহমেদ)
সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন)

মহাপরিচালক
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

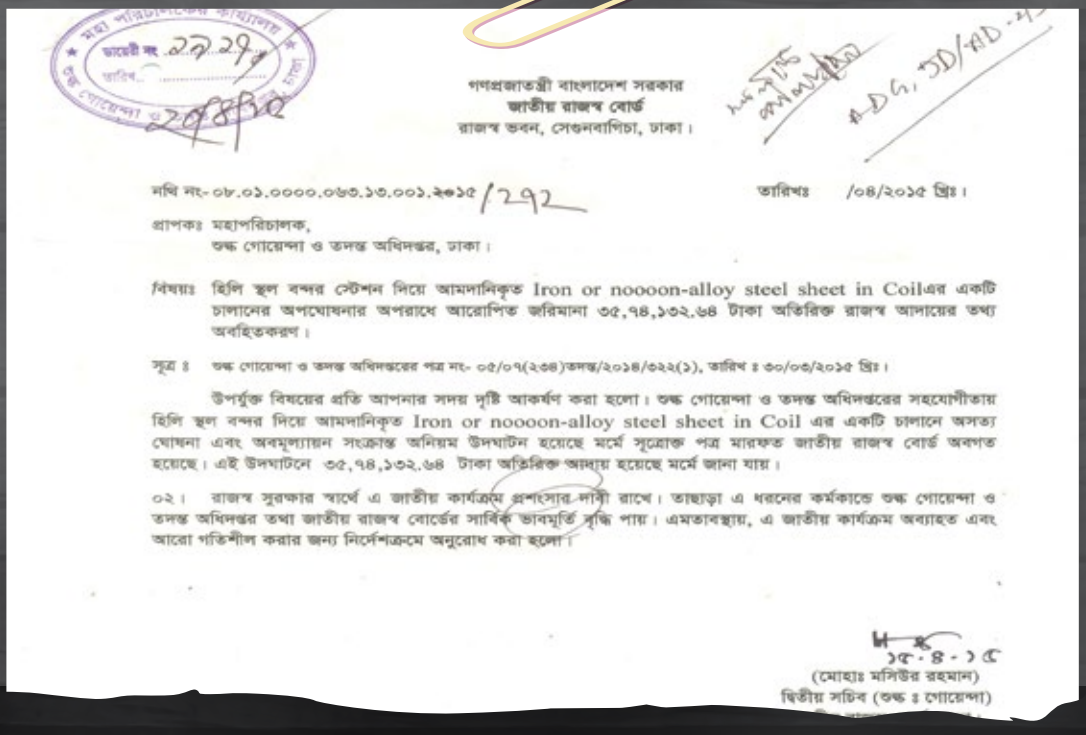

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৩.১৩.০০১.২৩১৫/২৭২ তারিখঃ /০৪/২০১৫ খ্রিঃ।

প্রাপকঃ মহাপরিচালক,
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিষয়ঃ হিলি স্থল বন্দর স্টেশন দিয়ে আমদানিকৃত Iron or noooon-alloy steel sheet in Coilএর একটি চালানের অপঘোষনার অপরাধে আরোপিত জরিমানা ৩৫,৭৪,১৩২.৬৪ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের তথ্য অবহিতকরণ।

সূত্র ঃ শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের পত্র নং- ০৫/০৭(২৩৪)তদন্ত/২০১৪/৩২২(১), তারিখ ঃ ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সহযোগীতায় হিলি স্থল বন্দর দিয়ে আমদানিকৃত Iron or noooon-alloy steel sheet in Coil এর একটি চালানে অসত্য ঘোষনা এবং অবমূল্যায়ন সংক্রান্ত অনিয়ম উদঘাটন হয়েছে মর্মে সূত্রোক্ত পত্র মারফত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবগত হয়েছে। এই উদঘাটনে ৩৫,৭৪,১৩২.৬৪ টাকা অতিরিক্ত আদায় হয়েছে মর্মে জানা যায়।

০২। রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে এ জাতীয় কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে। তাছাড়া এ ধরনের কর্মকান্ডে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায়, এ জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত এবং আরো গতিশীল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৫.৪.১৫
(মোহাঃ মসিউর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক ঃ গোয়েন্দা)

চোরাচালান প্রতিরোধ ও রাজস্ব সুরক্ষায় কাস্টমস গোয়েন্দার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের কয়েকটি স্বীকৃতি

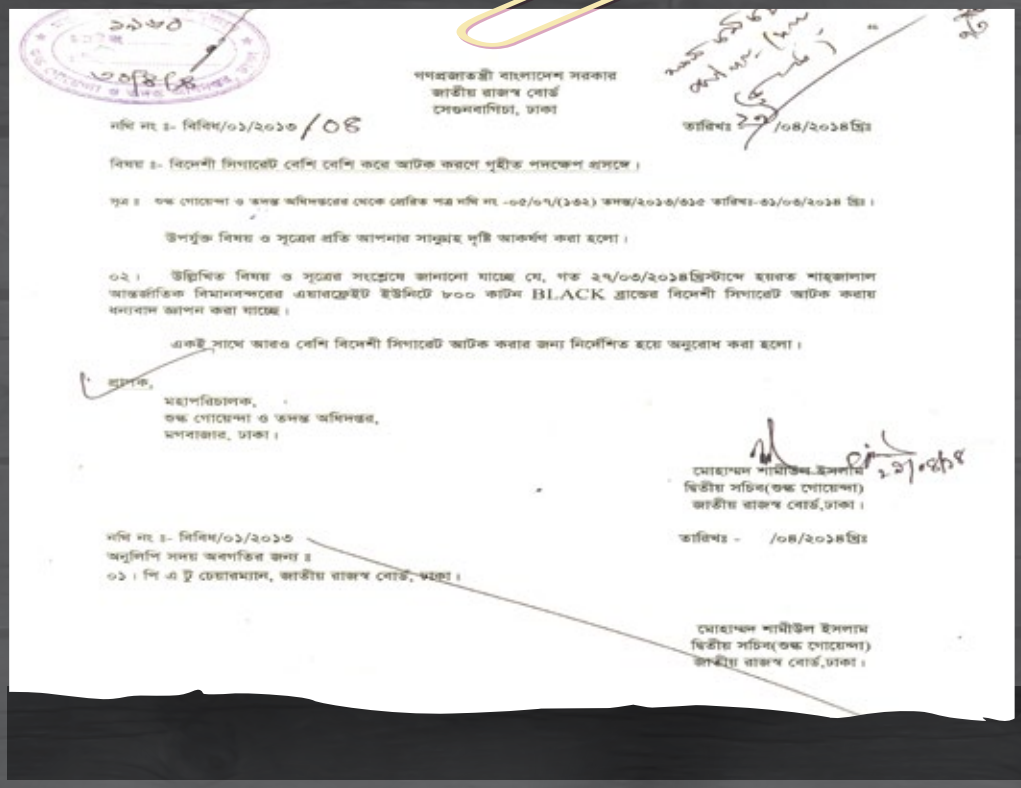

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

নথি নং ঃ- বিবিধ/০১/২০১৩/০৫ তারিখঃ /০৪/২০১৪খ্রিঃ

বিষয় ঃ- বিদেশী সিগারেট বেশি বেশি করে আটক করণে গৃহীত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের থেকে প্রেরিত পত্র নথি নং -০৫/০৭/(১৩২) তদন্ত/২০১৩/৩১৫ তারিখঃ-৩১/০৩/২০১৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। উল্লিখিত বিষয় ও সূত্রের সংশ্রেষে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৭/০৩/২০১৪খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এ্যারাবফ্লেইট ইউনিটে ৮০০ কার্টন BLACK ব্রান্ডের বিদেশী সিগারেট আটক করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

একই সাথে আরও বেশি বিদেশী সিগারেট আটক করার জন্য নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হলো।

প্রাপক,
মহাপরিচালক,
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর,
মগবাজার, ঢাকা।

মোহাম্মদ শামীউল ইসলাম
দ্বিতীয় সচিব(শুল্ক গোয়েন্দা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,ঢাকা।

নথি নং ঃ- বিবিধ/০১/২০১৩
অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ
০১। পি এ টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

তারিখঃ - /০৪/২০১৪খ্রিঃ

মোহাম্মদ শামীউল ইসলাম
দ্বিতীয় সচিব(শুল্ক গোয়েন্দা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,ঢাকা।

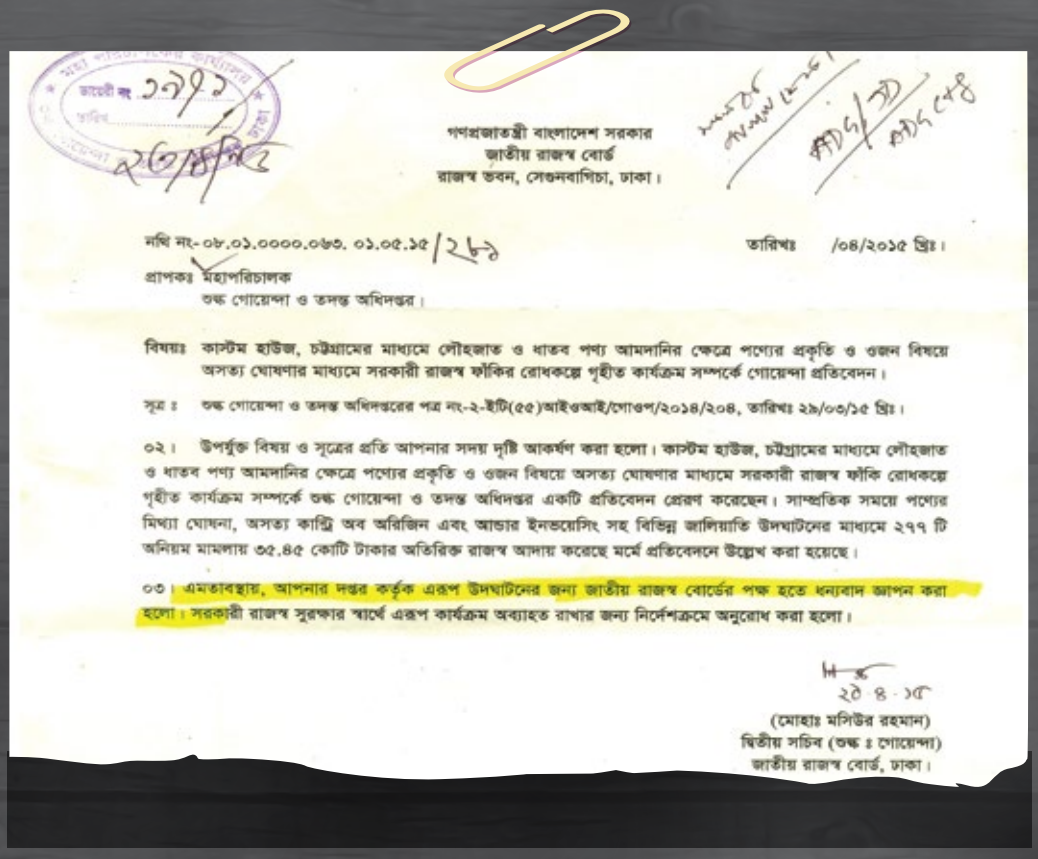

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬৩. ০১.০৫.১৫/২৮১ তারিখঃ /০৪/২০১৫ খ্রিঃ।

প্রাপকঃ মহাপরিচালক
শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

বিষয়ঃ কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রামের মাধ্যমে লৌহজাত ও ধাতব পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃতি ও ওজন বিষয়ে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব ফাঁকির রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে গোয়েন্দা প্রতিবেদন।

সূত্র ঃ শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের পত্র নং:-২-ইটি(৫৫)আইওআই/গোওপ/২০১৪/২০৪, তারিখঃ ২৯/০৩/১৫ খ্রিঃ।

০২। উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রামের মাধ্যমে লৌহজাত ও ধাতব পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃতি ও ওজন বিষয়ে অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে পণ্যের মিথ্যা ঘোষনা, অসত্য কান্ট্রি অব অরিজিন এবং আন্ডার ইনভয়েসিং সহ বিভিন্ন জালিয়াতি উদঘাটনের মাধ্যমে ২৭৭ টি অনিয়ম মামলায় ৩৫.৪৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করেছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

০৩। এমতাবস্থায়, আপনার দপ্তর কর্তৃক এরূপ উদঘাটনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। সরকারী রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে এরূপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৯.৪.১৫

(মোহাঃ মসিউর রহমান)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক ঃ গোয়েন্দা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

চোরাচালান প্রতিরোধ ও রাজস্ব সুরক্ষায় কাস্টমস গোয়েন্দার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের কয়েকটি স্বীকৃতি

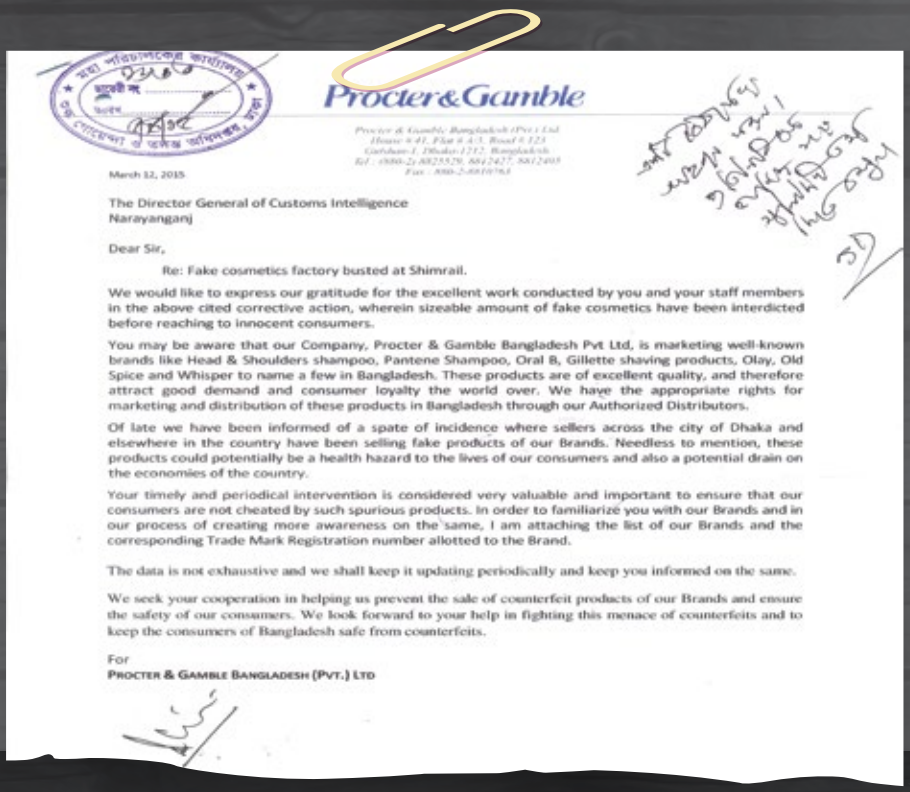

Procter&Gamble

Procter & Gamble Bangladesh (Pvt.) Ltd.
House # 41, Plot # A/3, Road # 125
Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel : +880-2) 8825570, 8812427, 8812405
Fax : 880-2-8810763

March 12, 2015

The Director General of Customs Intelligence
Narayanganj

Dear Sir,

Re: Fake cosmetics factory busted at Shimrail.

We would like to express our gratitude for the excellent work conducted by you and your staff members in the above cited corrective action, wherein sizeable amount of fake cosmetics have been interdicted before reaching to innocent consumers.

You may be aware that our Company, Procter & Gamble Bangladesh Pvt Ltd, is marketing well-known brands like Head & Shoulders shampoo, Pantene Shampoo, Oral B, Gillette shaving products, Olay, Old Spice and Whisper to name a few in Bangladesh. These products are of excellent quality, and therefore attract good demand and consumer loyalty the world over. We have the appropriate rights for marketing and distribution of these products in Bangladesh through our Authorized Distributors.

Of late we have been informed of a spate of incidence where sellers across the city of Dhaka and elsewhere in the country have been selling fake products of our Brands. Needless to mention, these products could potentially be a health hazard to the lives of our consumers and also a potential drain on the economies of the country.

Your timely and periodical intervention is considered very valuable and important to ensure that our consumers are not cheated by such spurious products. In order to familiarize you with our Brands and in our process of creating more awareness on the same, I am attaching the list of our Brands and the corresponding Trade Mark Registration number allotted to the Brand.

The data is not exhaustive and we shall keep it updating periodically and keep you informed on the same.

We seek your cooperation in helping us prevent the sale of counterfeit products of our Brands and ensure the safety of our consumers. We look forward to your help in fighting this menace of counterfeits and to keep the consumers of Bangladesh safe from counterfeits.

For
PROCTER & GAMBLE BANGLADESH (PVT.) LTD

BRITISH AMERICAN TOBACCO
BANGLADESH

February 18, 2015

Mr. Moinul Khan
Director General
Customs Intelligence & Investigation Directorate
National Board of Revenue
Gulpheshan Plaza, 4th Floor
Dhaka

Letter of appreciation for action against smuggle cigarettes

Dear Sir,

British American Tobacco Bangladesh (BATB) would like to show our sincere appreciation for prompt intervention against smuggled cigarettes. Your timely initiatives has been indispensable as currently we are experiencing massive influx of smuggle cigarette in the market. We also came to know that you have already **confiscated 5 million sticks (25,000 cartons) of smuggled cigarette in last six months** from Dhaka, Chittagong and Sylhet airport.

BATB not only is the single largest tax payer in the private sector of Bangladesh but also the only public listed tobacco company of the country. The company has rich heritage of 104 years of operation in Bangladesh. Government of Bangladesh holds around 16% and private investors' holds around 12% share of the company. BATB's world class practices have been acknowledged at both national and international level for corporate social responsibility, environment friendly initiatives and corporate governance. BATB takes pride in partnering with the government in generating much needed revenue for the country. We have contributed over **BDT 30,000 crore** to the national exchequer in the last 5 years. This fiscal year alone we estimate to contribute over **BDT 10,000 crore**, which is **over 65% of the total revenue contribution from the cigarette industry**.

Market trend shows signs of activities of organized cartel behind the continuous growth of smuggle cigarette and they have set up a structured distribution network like any normal business. The entry points of these cigarettes are primarily through airports and seaports. In 2014 estimated **200 million sticks of smuggled cigarettes have been sold in Bangladesh**, which results into more than **BDT 150 crore revenue loss** considering supplementary duty and VAT. However, had the same of cigarette been imported legally then government would have **earned estimated BDT 500 crore as import duty**.

We would like to extend our knowledge in your drive against smuggling cigarette and also spread full support to your department for continuing ongoing drive.

Yours faithfully,

Shahed Zubair
Head of Corporate and Regulatory Affairs

National Board of Revenue.

MAERSK
MAERSK
MAERSK
SEALAND
MAERSK
MAERSK

দলগত প্রচেষ্টা আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি

ক্রিস্টমাস গোয়েন্দা

আমি কাস্টমস সার্ভিস অফিসার ছিলাম

আবু হেনা

১৯৫২ সালের মতো ১৯৬২ ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল। জাস্টিস হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট কেবল প্রকাশিত হয়েছে। এতে যেসব প্রস্তাব করা হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না তাদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত, তাছাড়া আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে প্রায় অগ্রাহ্য করা হয়। একই সময়ে তখনকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা, যিনি ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ১৯৪৬-এ যিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও পাকিস্তানি সামরিক জান্তা গ্রেপ্তার করে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল। তাই পরীক্ষা দেয়া আর হলো না। মধুর ক্যান্টিনের সামনে আমতলা থেকে মিছিল বের হয়ে সারা ঢাকা প্রদক্ষিণ করল। শেষে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জওয়ানরা গোলাগুলি করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করল। আমি গ্রেপ্তার এড়িয়ে হল ছেড়ে সেগুনবাগিচায় একটি ঘরে থাকতাম। রাতে সেখান থেকে আমাকে তুলে নিয়ে প্রথমে রমনা থানা, পরে আদালত এবং সবশেষে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করা হয়। অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতার- আমরা পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ফাঁসি দেয়া হবে আমাদেরকে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, এদের হাত থেকে আর মুক্তি নেই। কিন্তু গণ-আন্দোলন তীব্রতর হলো, আমরা মুক্তি পেলাম। পরের বছর এমএ পরীক্ষা দিলাম। এর দশ দিন পর প্রায় একই প্রস্তুতি নিয়ে তখনকার পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষাটিও সমাপ্ত করলাম। এমএ পরীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম হলাম আর সিএসএস পরীক্ষাতেও প্রথমের দিকেই স্থান ছিল। তারপর ধানমন্ডি ৭নং রোডে মৌখিক পরীক্ষায় দেখলাম পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা আমাকে অত সহজে ছাড় দিতে রাজি নয়। অনেক প্রশ্ন, কেন সামরিক শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম। সবশেষে বলল যেহেতু সিএসপি অফিসারদেরকে রাজনীতির অঙ্গনে দায়িত্ব পালন করতে হয় সেই কারণে ওটা বাদ দিয়ে আমাকে 'অপশন' জানাতে হবে। আমি ওখানে বসেই কাস্টমস সার্ভিসের জন্য অপশন দিয়েছিলাম। পরে দেখলাম আমাকে ওই সার্ভিসটিই দেয়া হয়েছে। এর পরেও পুলিশ ভেরিফিকেশনের অনেক বাধাবিঘ্নতা অতিক্রম করে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর, ৩১-এ লাহোর ফাইনান্স সার্ভিস একাডেমিতে যোগদান করি। তখন এই সার্ভিসটির নাম ছিল 'পাকিস্তান কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ সার্ভিস' সংক্ষেপে পিসিএন্ডইএস। এই সার্ভিসকে ব্রিটিশ শাসনামলে 'ইম্পেরিয়াল কাস্টম সার্ভিস' বলা হতো, সে সময় সহকারী কালেক্টরদের নিয়োগ সরাসরি লন্ডন থেকেই দেয়া হতো। লাহোরে এক বছর বুককিপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আরও এক বছর করাচি কাস্টমস হাউসে প্রবেশনার সহকারী কালেক্টর হিসেবে এক বছর কাজ করি। তখন আমি সমগ্র পাকিস্তানের সব সমুদ্র ও বিমানবন্দর, স্থল কাস্টমস স্টেশন পরিদর্শন করি, সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়াও পর্যবেক্ষণ করি। পরে ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে সহকারী কালেক্টর, ম্যানিফেস্ট ক্লিয়ারেন্স ডিপার্টমেন্ট এবং রিফান্ড-এর দায়িত্ব নিই। এ দায়িত্ব পালনকালে 'টাইটান' নামে একটি আমেরিকান জাহাজ ৪৪,০০০ টন খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চট্টগ্রাম বহির্নোঙরে নোঙর করে। এই জাহাজ থেকে ১৮০০০ টন ফুডগ্রেন 'শটল্যান্ডে' হয়।

এই জাহাজের শিপিং এজেন্ট ছিল একটি ব্রিটিশ কোম্পানি ম্যাকেনন অ্যান্ড ম্যাকেন্সি। কারণ দর্শাও নোটিশের জবাবে তারা বলল, ১৮০০০ টন ফুডগ্রেন তারা করাচিতে নামিয়েছে। কিন্তু এ জবাব গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ এই পণ্যের পোর্টমার্ক ছিল চট্টগ্রাম বন্দর, তাছাড়া এই মার্কিন সাহায্য ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য। এভাবেই পাকিস্তানিরা আমাদের সম্পদ হাতিয়ে নিত, কেড়ে নিত আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। আমার বয়স তখন মাত্র ২৫ বছর, ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের ঘোর তখনও কাটেনি। তাই শিপিং এজেন্টের ওপর জরিমানা করলাম ৯,৬৫,০০০.০০ টাকা। তখন পর্যন্ত কাস্টমস হাউসের কালেক্টরও এত পরিমাণ জরিমানা করেননি। সে সময় পাঞ্জাবি কালেক্টর মকবুল এলাহি অবশ্য আমাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন এবং আপিল নামঞ্জুর করেছিলেন। চেম্বারে ডেকে কফি খাইয়ে বলেছিলেন, 'তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছ।' এর পর এসি এপ্রেইজমেন্ট-এর দায়িত্ব পেলাম। তখন একটি ভোজ্য তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান একটি (Insecticide) এনেছিল, এটি বাদাম তেলের সাথে কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে দিলেই তাতে সরিষার তেলের ঝাঁঝ আর রং দুটোই এসে যেত। আমি তখন আইটিসি (ইমপোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল) কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। সদস্য ছিল একজন আমদানি-রপ্তানি সহকারী কন্ট্রোলার। এই কমিটি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এই কনসাইনমেন্টটি বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং ধ্বংস করতে হবে। এর বিচার কালেক্টরের বিচার ক্ষমতার মধ্যে ছিল। তিনি আমাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আমি পাকিস্তানিদের শত্রুতার শিকার হয়েছিলাম। এই চালানটি দেশে প্রবেশ করলে আর্সেনিক দ্বারা প্রস্তুত এই বিষ এদেশের অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হতো নিঃসন্দেহে।

১৯৭৬ সালে আমি খুলনা কাস্টমস হাউস এবং খুলনা বিভাগ কাস্টমস ও এক্সাইজ কালেক্টরেটের 'ডেপুটি কালেক্টর' (বর্তমানে যুগ্ম/অতিরিক্ত কমিশনার)-এর দায়িত্বে ছিলাম। সে সময় লি ওয়াহ্ (Le Whoa) নামে একটি জাহাজ মংলা সমুদ্রবন্দর হয়ে খুলনা জেটিতে নোঙর করে। জাহাজটির গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল। আমি মেনিফেস্ট চেক করলাম। দেখলাম জাহাজের সবটাই রিটেনশন কার্গো। অর্থাৎ খুলনায় খালাস করার জন্য কোনো চালান এ জাহাজে নেই। একটি রিটেনশন ম্যানিফেস্ট দেয়া হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে জাহাজের সব পণ্যই রেঙ্গুন বন্দরে খালাস করার জন্য আনা হয়েছে। প্রথমেই প্রশ্ন জাগল এই জাহাজে বাংলাদেশের জন্য কোনো পণ্য না থাকলে এটি মংলা হয়ে খুলনা জেটি পর্যন্ত কেন এসেছিল? দুই, আসার পথে রেঙ্গুনে এই জাহাজ নোঙর করেছিল। তাহলে সেখানে এই মালামাল খালাস করেননি কেন? জাহাজের 'লগবুক' থেকে পরিষ্কার যে সমুদ্রপথে বেশ কয়েকবার এই জাহাজটি নোঙর করেছে এবং ঝড়ঝঞ্ঝার নামে জাহাজের কিছু মালামাল পানিতে নিক্ষেপ করেছে। আমি প্রায় ৩০ জন প্রিভেন্টিভ অফিসার, একজন পরিদর্শক এবং সহকারী কালেক্টর শোয়েব আহমেদকে নিয়ে একটি 'রামেজ টিম' সহ রাত একটার দিকে জাহাজে উঠে প্রথমেই 'ক্রু' লিস্ট চেক করলাম। দেখলাম, ত্যান খ্যাং হক নামে একজন সিঙ্গাপুরীর (এই জাহাজের অন্যতম মালিক) নাম এই লিস্টে নেই। অর্থাৎ তিনি একজন লুক্কায়িত ক্রু (Stow away Crew)। প্রথমেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করলাম। তারপর দেখলাম সারা জাহাজে শুধু মদ আর সিগারেট, সর্বত্র ক্যাপ্টেন, ক্রু সবার ঘরে, টয়লেট, কিচেন সবখানে। অথচ মালামাল শুধু 'হ্যাচে' থাকার কথা।

এর বাইরে রাখা সম্পূর্ণ বেআইনি, কাস্টমস আইনে 'রিটেনশন কার্গো' আটক করার নিয়ম নেই। কিন্তু আনুষঙ্গিক সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এই জাহাজের বিপক্ষে চলে গেল। সব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম। জাহাজ আটক করলাম সব মালামালসহ ক্যাপ্টেন, চিফ অফিসার, সব ক্রু সদস্যকে গ্রেপ্তার করে থানায় ওসির হাতে রাতেই তুলে দিলাম। তখন দেশে সামরিক আইন চলছে। বন্দর এলাকার সামরিক আইন প্রশাসককে বিষয়টি জানালাম। সকালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এম হোসেনকে জানাতেই তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তোমার এই সিজার এবং গ্রেপ্তারের খেসারত দেশকে দিতে হবে। সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে। জাহাজের শিপিং এজেন্ট নাজিউর রহমান (পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের মন্ত্রী) হাইকোর্টে কুয়াসমেন্ট-এ গেলেন। সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ফকির শাহাবুদ্দিনসহ আরও চারজন জাদরেল ব্যারিস্টার ওদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করল, আমরা হেরে গেলাম। মামলা খারিজ হলে ফকির শাহাবুদ্দিন সাহেব তার সহকর্মীদের নিয়ে খুলনায় আমার অফিসে এসে বললেন, এবার জাহাজ এবং ক্রুদের ছেড়ে দিন, নাহলে আপনার চাকরির ক্ষতি হতে পারে। বললাম, 'স্যার, আপনি অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে, বোর্ড বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে এবং আপিল করার বিষয়ে মতামত চাইবে। আইন মন্ত্রণালয় মত দিলে আপিল হবে।' পরে আপিল হয়েছিল। বিচারে আমরা জয়ী হয়েছিলাম। আমি এবং সহকারী কালেক্টরেট শোয়েব আহমেদ সরকারের প্রশংসাপত্র পেয়েছিলাম। আমি দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে ১৪ বছর পূর্তিতেই কালেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়ে কাস্টমস গোয়েন্দা ও অনুসন্ধান অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে ১১ জানুয়ারি ১৯৭৯-তে যোগদান করি। এই সংস্থাটি তখন সচল ছিল না। যে গোয়েন্দা চার্টার অনুযায়ী এই সংস্থাকে সার্চ, সিজার, অ্যারেস্টের সব ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তা পাকিস্তান আমল থেকেই দেয়া হয়েছিল। যারা আমার সাথে অতিরিক্ত পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন তারা হলেন: আবদুল লতিফ সিকদার, সাইফুল ইসলাম খান এবং সাইফুল ইসলাম চৌধুরী–এরা সবাই পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য হয়েছিলেন। প্রথম বারের মতো আমি এই সংস্থাটিকে সচল করে তুলি। ১৮ জন তদন্ত কর্মকর্তাকে আমি নিজ হাতে নিয়োগ দিয়ে প্রশিক্ষিত করি। তাদেরকে সারা দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সক্রিয় করে তুলি। পুরোনো বিমানবন্দরে এয়ারফ্রেইট ইউনিটে ৬০টি সন্দেহভাজন চালান আটক করি। সে সময়কার অর্থ প্রতিমন্ত্রী আমাকে তাঁর বাসভবনে ডেকে বলেছিলেন, 'আপনি বিমানবন্দরটির নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে ছেড়ে দিন', উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'কাস্টমস আইন আপনাকে সে ক্ষমতা দেয় নাই।' তিনি আমার প্রতি কঠোর হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তখন একজন রাজনৈতিক নেতার মাধ্যমে এ বিষয়টি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নজরে এনেছিলাম, তিনি সাথে সাথেই প্রতিমন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

কাস্টমস-এর গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে আমার সবচাইতে বড় পরীক্ষা ছিল এরশাদ শাসনামলে ১৯৮৩ সালের মে মাসে। আমি তখন কাস্টমস গোয়েন্দা প্রধান।

সকাল সাড়ে আটটায় (সম্ভবত ২৪ মে) নিউ বেইলি রোডে আমার বাসভবন সংলগ্ন অফিসে টেলিফোন বেজে উঠল। অপর প্রান্তে সিনিয়র গোয়েন্দা ও তদন্ত কর্মকর্তা ইদ্রিস বললেন, 'স্যার এয়ারফ্রেইটে ডিজিডিপির নামে একটি 'কনসাইনমেন্ট' এসেছে। গোপন তথ্যমতে এতে কোনো ডিফেন্স ম্যাটেরিয়াল নেই, আছে দামি ঘড়ি। কেউ সুযোগ নিয়ে চোরাচালান করছে। বলল, এতে দেশের বা আর্মির, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন কোনো নিষিদ্ধ পণ্যও থাকতে পারে। বলল, এয়ারপোর্ট কাস্টমস মাল ছেড়ে দিয়েছে এবং মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রাকও এসে গেছে।' আমি বললাম, 'কী দরকার আর্মির বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তো এয়ারপোর্টে আছে।' টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। তখন দেশে সামরিক আইন চলছে। এয়ারপোর্ট জুড়ে আর্মি পারসোনেল অস্ত্র হাতে মোতায়েন রয়েছে।

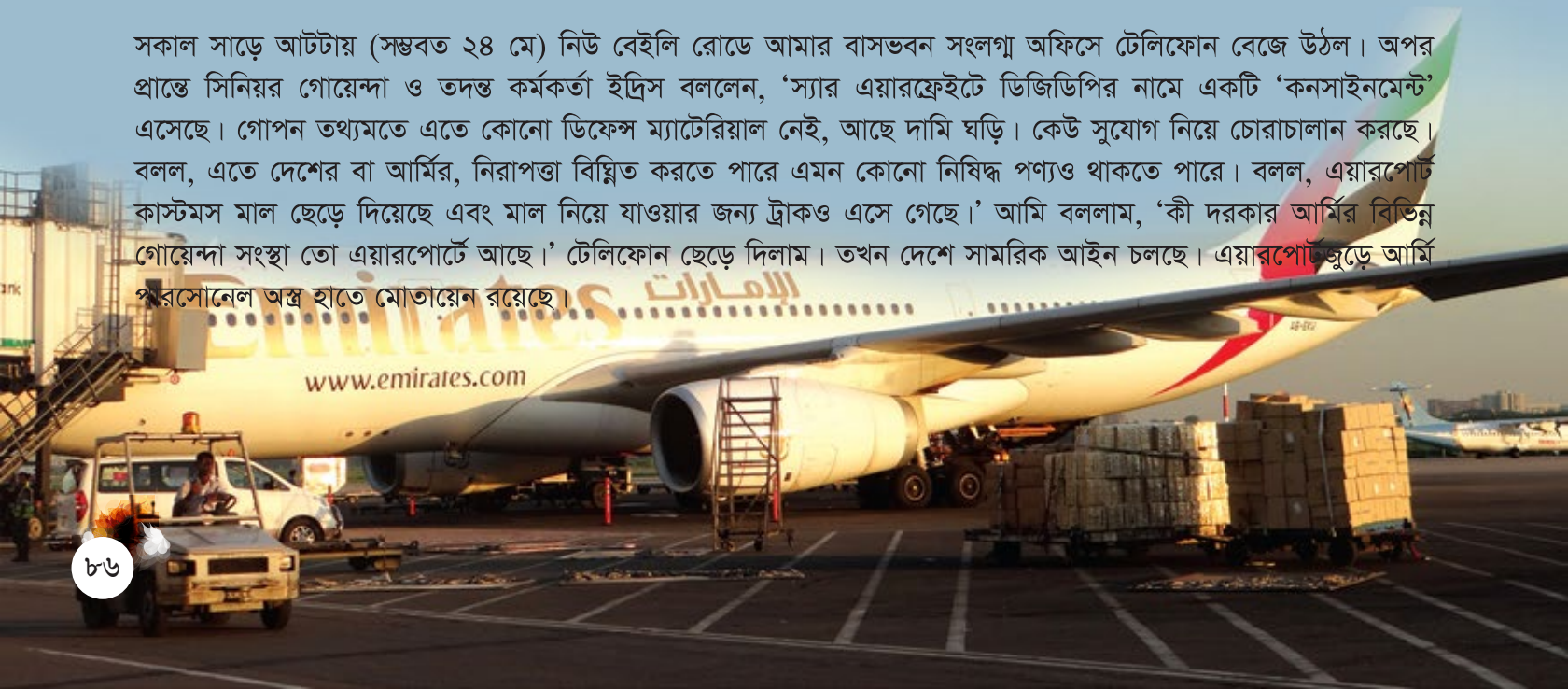

অন্ধকারে, এত বড় ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ফোন এল 'স্যার গোপন তথ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, একদম সময় নেই।' এই অফিসারটির পেশাদারিত্ব পরীক্ষিত ছিল, তাই ওর ওপরে বিশ্বাস রেখেই বললাম, 'এয়ারফ্রেইট কাস্টমস-এর সহকারী কালেক্টরকে আমার নামে চিঠি দাও। বলে দাও আমার নির্দেশে এই চালান আটক করা হলো।' এরপর এয়ারপোর্ট কাস্টমস, কাস্টমস গোয়েন্দা, মার্শাল 'ল' প্রশাসকের প্রতিনিধি এবং ডাইরেক্টর জেনারেল ডিফেন্স পারচেজ-এর প্রতিনিধির সামনে খোলা জায়গায় প্যাকেটগুলি খুলে পরীক্ষা করা হবে। এরপর প্যাকেটগুলি একে একে খুলে পরীক্ষা করা হলো, সব প্যাকেটেই ঘড়ি পাওয়া গেল। যে কাস্টমস অফিসার দুজন মালগুলি ছাড় দিয়েছিল, তাদেরকে একজন ডিএফআই কর্মকর্তা উঠিয়ে নিয়ে যান এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে সময় একজন কাস্টমস কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছিল। সে সময় সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স নামে একটি সংস্থা ছিল। এর প্রধান ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী। এতে দেশের সব কটি গোয়েন্দা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিবিআই প্রধান আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এরপর আমাকে বদলি করে ঢাকার কালেক্টর অব কাস্টমস হিসেবে পদায়ন করা হয়। এই কালেক্টরেটে ছিল বিশাল ঢাকা এবং রাজশাহী বিভাগের সব কাস্টমস এবং এক্সাইজ ইউনিট-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন ঢাকা এয়ারপোর্ট কাস্টমসও এর অধীনে ছিল। তখন মার্শাল 'ল' চলছে। নিউমার্কেটসহ বিভিন্ন মার্কেটে তখন কাস্টমস রেইড চলত, চোরাচালানি মাল আটক করার জন্য। তখন ঢাকার বিভাগীয় মার্শাল 'ল' প্রশাসক ছিলেন মেজর জেনারেল ওয়াহিদ। তিনি একদিন ফোন করে আমাকে বলেন, আবু হেনা, আপনার দুর্নাম হয়ে যাচ্ছে। আপনি শুধু গরিবদের মার্কেটে তল্লাশি চালাচ্ছেন। কিন্তু গুলশান মার্কেটে যাচ্ছেন না। আমি পরদিন সহকারী কালেক্টর মসরুর আহমেদের নেতৃত্বে পুলিশ প্রহরায় একটি স্কোয়াড গুলশান মার্কেটে পাঠালাম। ঘণ্টাখানেক পরে আমার হেড কোয়ার্টার সহকারী কালেক্টর জাহানারা সিদ্দিকী অনেকটা হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বলল, 'স্যার মসরুর খুব বিপদে পড়েছে। দোকানদাররা লাঠিসোঁটা নিয়ে আমাদের টিম-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' আমি মসরুরের শ্বশুর অতিরিক্ত আইজি রকীব খন্দকারকে ফোনে জানালাম। তিনি বললেন, 'প্রয়োজনীয় ফোর্স পাঠানো হয়েছে।' এরপর পুরো মার্কেটে আমি তালাবদ্ধ করে দিয়েছিলাম। প্রায় ৭ দিন পর গুলশান মার্কেটের মালিক সমিতির নেতারা আমার সাথে দেখা করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তল্লাশিতে রাজি হন। আমি তাদের লিখিত অঙ্গীকার নিয়ে মার্কেট খুলে দিয়েছিলাম।

ঢাকার কালেক্টর অব কাস্টমস হিসেবে আমি আরও একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। লে. জে. এইচ এম এরশাদ যখন সি.এম.এল.এ অর্থাৎ প্রধান সামরিক শাসক তখন তার নামে শৌখিন আসবাবপত্রের একটি চালান এসেছিল। আমার অধীনস্ত কর্মকর্তারা আদেশের জন্য ফাইলটি আমার কাছে প্রেরণ করলে আমি তার কাছ থেকে শুল্ক আদায় করে চালানটি ছাড় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। এর কারণ ছিল তিনি তখনও দেশের রাষ্ট্রপতি হননি এবং একমাত্র রাষ্ট্রপতি ছাড়া আর কেউ শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করেন না। সামরিক শাসক কাস্টমস আইনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেননি। কাস্টমস-এর নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে এখানেই আমার কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। এরপর প্রধান সামরিক প্রশাসকের নির্বাচনের মাধ্যমেই আমি ব্রাসেলস-এ

অবস্থিত কাস্টমস কো-অপারেশন কাউন্সিলে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের দূতাবাসে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হই। এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আমি সমাধা করেছিলাম, তা ছিল বিশ্ববাণিজ্য ও কাস্টমস প্রশাসনে বিস্ময় সৃষ্টিকারী এইচ এস কোড তৈরিতে অংশগ্রহণ। সারা বিশ্বের কাস্টমস 'এক্সপার্টস' এবং জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞগণ কাস্টমস কাউন্সিলের কাস্টমস ট্যারিফ নোমেনক্লেচার এবং জাতিসংঘের 'কমোডিটি কোড'-এর সমন্বয় ঘটিয়ে এই এইচ এস কোড তৈরি করে সারা বিশ্ব বাণিজ্য এবং কাস্টমস প্রশাসনকে সহজীকরণ করেছে। এর বাহন হচ্ছে কম্পিউটার যার মাধ্যমে কাস্টমস বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাংকের কার্যক্রম সমন্বিত করে ত্বরিত গতিতে পণ্য খালাস করতে পারে। সেই সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে সব আমদানি-রপ্তানির স্ট্যাটিসটিকসও এই কম্পিউটার-এর মাধ্যমে হয়ে যায়, যার ফলে বিশ্ববাণিজ্যে সব নেগোসিয়েশন সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে হওয়া সম্ভবপর।

আমি ব্রাসেলস্-এ বসে ১৫ জন কাস্টমস অফিসারকে এইচ এস কোডে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম এবং কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করার সুপারিশ করেছিলাম। যা আজ অবধি সঠিকভাবে হয়নি। এই এইচ এস কোডের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক জাতীয় হেডিং সংযোজিত করে ব্রাসেলস্স্থ বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ রচিত ও প্রণীত হয়েছে। এ-সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকাটি তদানিন্তন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের মুখবন্ধসহ মুদ্রিত হয়েছিল। এতে প্রতি বছর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক বাজেটে পাসকৃত পরিবর্তিত শুল্কহার সংযোজিত হয়। এছাড়া এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, ব্রাসেলস্স্থ সংস্থার অনুমোদন ছাড়া আন্তর্জাতিক আইনসিদ্ধ নয়। এইচ এস কোডের ব্যাখ্যার জন্য প্রতি চ্যাপ্টারের পৃথক পৃথক (Explanatory notes আছে, আছে Alphababetical Index) এবং (Rulings) যা বিশ্বের সব দেশের জন্য অনুসরণীয়। ব্রাসেলস্-এ কর্তব্যরত অবস্থায় আমার সভাপতিত্বে (Customs Convention of Temporary Importation) এবং (Convention on Customs Implementation of Intellectual Property Law) রচিত হয়েছে। ১৯৮৮ সালে ভিয়েনায় জাতিসংঘ দপ্তরে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং পাচার রোধে একটি আন্তর্জাতিক আইন মাসব্যাপী একটি অরাষ্ট্রীয় কনফারেন্স-এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল। এতে অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীসহ বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এতে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলাম। এই আইনের শাস্তিবিষয়ক চ্যাপ্টারটি আমারই সভাপতিত্বে রচিত হয়। ১৯৮৯ সালে আন্তর্জাতিক কাস্টমস সম্মেলনটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার দু'শ বছর পূর্তিতে এই সম্মেলনের সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইউএস কাস্টমস সার্ভিসকে (Protectors of Independence) সম্মানে ভূষিত করে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর ব্রাসেলস-এ দায়িত্ব পালনের পর আমি ১৯৮৯ সালে দেশে ফিরে কাস্টমস রিফরমস কমিশনের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলাম এবং একটি রিপোর্ট তৈরি করে তখনকার রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু এরপর কী হয়েছে আমি জানি না। কারণ ১৯৯১ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর অতিরিক্ত সচিব হিসেবে আমি বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের প্রেষণে মহাপরিচালক হয়ে যাই। এরপর ১৯৯৪ সালে আমি ৫ বছর চাকরি বাকি থাকতেই অবসরে চলে যাই। তারপর রাজনীতি। ১৯৯৬ সালে আমি সপ্তম সংসদে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই। পরবর্তীতে ২০০১ সালেও একই আসন থেকে আবার অষ্টম সংসদে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতো সব দেশেই কাস্টমস স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংরক্ষক। বাংলাদেশের সমুদ্র ও স্থল সীমানা কাস্টমস আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। সেই কারণে শুধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর এবং কাস্টমস স্টেশন ছাড়া অন্য কোনো পথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি এবং যাত্রী আসা-যাওয়া নিষিদ্ধ। যাত্রীদেরকেও কাস্টমস ফরমালিটিজ করেই যাতায়াত করতে হবে, অবৈধ পথে পণ্যসহ চোরাচালান করলে বিজিবি কাস্টমস আইনেই মালামাল জব্দ করে এবং কাস্টমস গোডাউনে জমা দেয়। পরে কাস্টমস আইনে এর বিচার হয়। আগামীতে কাস্টমস, ভ্যাট এবং আয়কর বিভাগকে আরও প্রশিক্ষিত করে সংগঠিত করতে হবে। তাহলেই এ দেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

- লেখক **আবু হেনা**, সাবেক কাস্টমস গোয়েন্দা প্রধান; কালেক্টর কাস্টমস, ঢাকা; ব্রাসেলস্-এর বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার স্থায়ী প্রতিনিধি; অবসরপ্রাপ্ত সদস্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; ডিজি বিএমডিসি এবং সাবেক সংসদ সদস্য

একাত্তরের মার্চে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস

আবদুল লতিফ খিকদার

পূর্বকথা

মার্চ মাস এলেই একাত্তরের অগ্নিঝরা উত্তাল সময়ের কথা মনে পড়ে যায়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে যখন পাকিস্তানের বিদ্যমান রাষ্ট্রধারণা প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রধারণার বীজ বপন করা হয়, ঠিক সে সময় আমি পাকিস্তান কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ সার্ভিসের ক্যাডারভুক্ত সদস্য হিসেবে লাহোরে ফাইনান্স সার্ভিসেস একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত। পাকিস্তানের রাজনৈতিক রাজধানীখ্যাত লাহোরে ১০ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা দাবির বোমাটি ফাটালেন, তখন থেকেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হতে শুরু করলাম। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটা লায়াবিলিটি হিসেবে গণ্য করে ৬ দফা দাবি শুধু প্রত্যাখ্যানই করল না, অস্ত্রের ভাষায় এর জবাব দেয়ার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করল। বুঝলাম এদের সাথে দীর্ঘদিন একত্রে থাকা যাবে না।

লাহোরে এক বছর একাডেমিক প্রশিক্ষণের পর করাচিতে আরেকটি বছর বিভাগীয় প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচি সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড ল্যান্ড কাস্টমস কালেক্টরেটে প্রথম পোস্টিং পেয়ে সাথে সাথেই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। পারিবারিক সমস্যার কারণ দেখিয়ে সে সময়ে আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের যে কোনো স্থানে বদলির অনুরোধ জানিয়ে ইসলামাবাদে অবস্থিত সেন্ট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউ বরাবর একটি আবেদনপত্র কালেক্টরের সুপারিশসহ পেশ করে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে এক মাসের ছুটিতে বাড়িতে চলে এলাম। ছুটি শেষ হওয়ার দুই দিন আগে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে আমার বদলির বার্তাসংবলিত একটি টেলিগ্রাম পেলাম। করাচি ফিরে এলাম শুধু দায়িত্বভার অর্পণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য। ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে সহকারী কালেক্টর পদে যোগদান করে ১৯৭২ সালের জুন মাস পর্যন্ত সেখানে কর্মরত থাকি।

এ সময়টায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় রচিত হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন বাস্তব অবয়বে রূপলাভ করার প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সুযোগ হওয়ায় এ সময়কে আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলে গণ্য করি। একই সাথে এটা একটা দুঃসময়ও ছিল। ইংরেজ কথাসাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্সের ভাষায় বলতে পারি "It was the best of times, it was the worst of times." "best of times"-এই অর্থে যে বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন পৃথিবীর বুকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রত্যক্ষ করার আনন্দ, আর "worst of times" এই অর্থে যে লাখো শহীদের রক্তস্রোত এবং অগণিত মানুষের অশ্রুধারার বিনিময়ে এ অর্জন। একদিকে একটি নিজস্ব স্বদেশ ভূমির অভ্যুদয় হতে দেখার আনন্দ উত্তেজনা, অন্যদিকে পদে পদে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকার দুঃসহ যন্ত্রণা।

১৯৬৮ সালে জুন মাসে শুরু হওয়া আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে সংগঠিত ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় আমি তিন মাসের Army Attachment Training সম্পন্ন করার জন্য জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত কুমিল্লার 6th Bengal Regiment এর সাথে সংযুক্ত হয়ে শীতকালীন মহড়া উপলক্ষে কুমিল্লা-ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকার তিতাস পাড়ে, চান্দুরা এবং কসবা এলাকায় অবস্থান করছি। সে সময় রেজিমেন্টে বাঙালি অফিসারদের মধ্যে টু আইসি (2nd in Command) মেজর ফিরোজ সালাউদ্দিন, কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন আজিজ, ক্যাপ্টেন এনাম ও ক্যাপ্টেন হাফিজসহ অন্যদের মধ্যে দেশে বিরাজমান রাজনীতির ব্যাপারে সচেতনতা লক্ষ করেছি। এদের সবাই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

একাত্তরের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে আমরা যেসব সংকটের সম্মুখীন হয়েছি, তার মধ্যে যেসব ঘটনার সাথে আমার সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল এখানে শুধু তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

'এমভি সোয়াত' জাহাজে যুদ্ধাস্ত্র আমদানি

পাকিস্তানি পতাকাবাহী জাহাজ 'এমভি সোয়াত' করাচি বন্দর থেকে ৫ হাজার ৬০০ টন পণ্য বহন করে মার্চের প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউ মুরিং এলাকার ১৭ নম্বর জেটিতে নোঙর করে। উপকূলীয় পণ্য ও জাহাজ সম্পর্কিত কাস্টমস অ্যাক্টের ষোড়শ অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী জাহাজের এজেন্ট ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক দাখিলকৃত ম্যানিফেস্ট থেকে দেখা যায় যে, এম্বারকেশন হেডকোয়ার্টার্স চট্টগ্রাম-এর নামে মিলিটারি সরঞ্জাম ঘোষণায় পণ্য আমদানি করা হয়েছে। আমদানি শাখার দায়িত্বে থাকার কারণে এ মেনিফেস্টে পণ্যের অস্পষ্ট ঘোষণা ও মূল্য তথ্য না থাকায় এটি গ্রহণ করা হবে কি না–সেই সিদ্ধান্তের জন্য নথিটি আমার কাছে পেশ করা হলে মূল্যসহ পণ্যের বিশদ বিবরণ-সংবলিত একটি সাপ্লিমেন্টারি ম্যানিফেস্ট দাখিল করতে নির্দেশ প্রদান করি। এতে নেভির দায়িত্বে থাকা এম্বারকেশন হেডকোয়ার্টার্স (Embarcation Headquarters) নারাজ হয় বলে জানতে পারি এবং তাদের নির্দেশে এজেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ম্যানিফেস্ট দাখিলের ব্যাপারে কোনো কার্যক্রম গ্রহণে বিরত থাকে। মিলিটারি যুদ্ধাস্ত্র খালাসের সময় জাহাজে প্রিভেন্টিভ সুপারভিশন প্রয়োজন না হলেও এরূপ সুপারভিশন ছাড়া জাহাজে রপ্তানি পণ্য বোঝাই করা যায় না । তবে এজেন্টের অসহযোগিতার কারণে এই জাহাজে কোনো প্রিভেন্টিভ অফিসার পোস্টিং করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। ওদিকে মিলিটারির জন্য যুদ্ধাস্ত্র আমদানি করা হয়েছে জানতে পেরে ডক শ্রমিকরা জাহাজ থেকে পণ্য খালাসে শুধু অস্বীকৃতি জানিয়েই থেমে থাকেনি, তারা এ পণ্য খালাসে বাধা দেয়। এভাবে সপ্তাহ সময় অচলাবস্থার মধ্যে পণ্য খালাস বন্ধ থাকে। সে সময়ে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ষোলশহরের খাদ্য গুদাম এলাকায় ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একদল বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের একটি অংশ অবস্থান করছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে বদলিকৃত এই রেজিমেন্টের একাংশ ইতোমধ্যে হজযাত্রীবাহী 'এমভি সফিনায়ে আরব' জাহাজযোগে করাচি চলে গেছে এবং এখানে অবস্থানরত বাকি অংশটি হজযাত্রী নিয়ে এই জাহাজটি চট্টগ্রাম আসার অপেক্ষায় রয়েছে। পাকিস্তানি মিলিটারি কর্তৃপক্ষ এই বাঙালি সৈনিকদের 'এমভি সোয়াত' জাহাজের যুদ্ধাস্ত্র খালাসের কাজে নিয়োজিত করল। জাহাজ থেকে পণ্য খালাসে অনভ্যস্থ এই সৈনিকদের অনেক দিন লেগে গেল।

শুল্ককর আদায়ের নতুন ব্যবস্থা

৮ মার্চ সকালে রেডিওযোগে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনলাম এবং কাস্টম হাউসে গিয়ে খবরের কাগজে এ ভাষণের বিশদ বিবরণ পড়ে নিলাম। সকাল থেকেই আমদানিকারক ও তাদের এজেন্টরা শুল্ককর পরিশোধ না করে পণ্য খালাস দেয়ার দাবি শুরু করলেন। এ দাবির সমর্থনে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এ

ভাষণের শেষদিকে নির্দেশমূলক অংশে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো, কেউ দেবে না।' এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কালেক্টর সাহেব সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে এক বৈঠকে বসলেন। বৈঠকে অনেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো এ দাবি মেনে নিয়ে শুল্ককর আদায়ের পরিবর্তে শুধু দাবিনামা জারিপূর্বক মুচলেকার ভিত্তিতে পণ্য খালাস দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কেউ কেউ এ দাবি ও নির্দেশ অমান্য করে শুল্ককর আগের মতো আদায়ের পক্ষে অটল থাকতে বললেন। আমি দু'পক্ষের মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললাম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যখন দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তখন এই নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করলেও খাজনা ট্যাক্স বলতে কোনোক্রমেই আমদানি শুল্ক ও বিক্রয়কর বোঝানো হয়নি, জমির খাজনা ও স্থানীয় কর বোঝানো হয়েছে। কাজেই আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ককর আদায় করা আমাদের আইনগত দায়িত্ব।

তবে এ রাজস্ব কীভাবে আদায় ও জমা করা হবে সে ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ দুইজন এমএলএ অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ সদস্যের মাধ্যমে আমি নীতিনির্ধারকদের মতামত জানতে পারব বলে বৈঠকে জানালাম। এদের মধ্যে একজন আমার ছাত্র ভোলার তোফায়েল আহমেদ, যিনি ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক এবং অন্যজন স্কুল সহপাঠী ও বন্ধু বরগুনার আসমত আলি সিকদার। এই বাস্তবসম্মত প্রস্তাব সমর্থিত হলে আমি বিকেলের মধ্যেই আসমত আলির সাথে যোগাযোগ করে কাস্টম হাউসে বিদ্যমান সংকটময় অচলাবস্থা অনতিবিলম্বে নিরসনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হলাম।

তোফায়েল আহমেদকে পাওয়া গেল না। যাই হোক, আসমতের পরামর্শ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়কারী জনাব এম আর সিদ্দিকীর সাথে দেখা করে বিষয়টি তার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কিংবা তাজউদ্দীন আহমদের সাথে আলোচনা করে অনুমোদন করে নেয়াই সঠিক হবে। কারণ, এসব বিষয়ে তিনিই ১০টি নির্দেশনা ইতিমধ্যে জারি করেছেন, যার প্রথমটিই হচ্ছে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ

রাখার নির্দেশ। এই পরামর্শ মোতাবেক কালেক্টর সাহেব ডেপুটি কালেক্টর কাইউস সাহেব এবং আমাকে জনাব এম আর সিদ্দিকী সাহেবের সাথে আলোচনা করার দায়িত্ব দিলেন। ৯ মার্চ সকালেই আমরা এম আর সিদ্দিকীর বাটালি হিলসের বাসায় হাজির হয়ে দেখলাম সেখানে অনেক দর্শনার্থী জরুরি নির্দেশের জন্য উপস্থিত। এমনকি আর্মি ও নেভির দুইজন কর্মকর্তা এসেছেন তাদের খাদ্যবাহী ট্রাক চলাচলের ক্ষেত্রে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আমাদের ডাক পড়ল। আমাদের বক্তব্য শুনে তিনি বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সাথে সাথেই জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সাথে টেলিফোনে কথা বললেন। তিনি আমদানি শুল্ককর বিষয়ে আমাদের অভিমত অনুমোদন করে বললেন, আদায়কৃত শুল্ককর পাকিস্তানে প্রেরণ করা যাবে না। তাহলে এই রাজস্বের ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বললেন। সিদ্দিকী সাহেব পরদিন অর্থাৎ ১০ তারিখ এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ দেখা করতে বললেন। কাস্টম হাউসে আবার বৈঠক বসল। আদায়কৃত রাজস্ব ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর কাস্টম হাউসে অবস্থিত ট্রেজারি শাখায় জমা না হলে এ অর্থ কোথায় রাখা যায় তার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না। এমন পরিস্থিতিতে আমি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। আমি জানতাম যে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক এবং ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন নামক দুটি বাঙালি মালিকানাধীন ব্যাংক রয়েছে, যাদের হেড অফিস ঢাকায় অবস্থিত। কালেক্টর সাহেবের নামে (ব্যক্তিগত নামে নয়, পদের নামে) এই দুটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন করা হলে এই অ্যাকাউন্টের যে কোনো একটিতে এই আদায়কৃত শুল্ককর জমা করা হলে পণ্য খালাসের আদেশ দেয়া যাবে। ১০ মার্চ জনাব এম আর সিদ্দিকী সাহেবের সাথে দেখা করে এই প্রস্তাব পেশ করা হলে তিনি আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন। প্রস্তাবটির সাথে তিনি একমত হলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের অনুমোদন আদায় করে আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বললেন। আমরা কিছু একটা লিখিত আকারে চাইলে তিনি জানালেন যে, তাজউদ্দীন সাহেব দু-এক দিনের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে নির্দেশের সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ গণবিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করবেন বলে আমাদের নিশ্চয়তা দিলেন। ১১ মার্চ থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে এই নতুন পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় ও জমাদান শুরু হয়ে গেল। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু যে ৩৫টি নির্দেশ জারি করে বাংলাদেশের প্রশাসনভার গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ৫ নং নিম্নরূপ নির্দেশটি ইতিমধ্যে কাস্টম হাউসে গৃহীত পদক্ষেপকে অনুমোদন করে:

'আমদানিকৃত সকল মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এ কাজ সমাধানের জন্য ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবে কাস্টমস কালেক্টরগণ তদানুযায়ী অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় হবে তা কোনোমতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।'

অনুরূপভাবে সেন্ট্রাল এক্সাইজ, বিক্রয়কর ও আয়কর-সংক্রান্ত বিষয় ৩১নং নির্দেশে উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ কর, যেমন আবগারি শুল্ক, বিক্রয়কর, এখন থেকে কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক অথবা ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনে 'বিশেষ অ্যাকাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সব আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা মানতে হবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রত্যক্ষ কর, যেমন- আয়কর আদায় পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ৩১নং নির্দেশে আরও বলা হয় কোনো খাজনা কর ভূমি রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, লবণ কর ও তামাক কর আদায় করা যাবে না এবং তাঁতিরা আবগারি শুল্ক প্রদান ব্যতিরেকেই সুতা কিনবেন। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারের প্রমোদ করসহ অন্যান্য কর আদায় করে বাংলাদেশ সরকারের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। চট্টগ্রামে দুটি সেন্ট্রাল এক্সাইজ কালেক্টরেট এসব নির্দেশ অনুসারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কি না জানতে পারিনি। তবে মনে হয় করেনি। কারণ, তাদের কোনো অফিসারকে মার্চ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে নিগৃহীত হতে হয়নি যেমনটি আমাকে হতে হয়েছিল।

২৩ মার্চ কাস্টম হাউসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস হিসেবে সরকারি ছুটির দিন। দিবসটি 'বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে পালন করার ঘোষণা করা হলে বাংলাদেশের সর্বত্র বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজের পতাকা উত্তোলিত হলো। একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া দেশের কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়ল না। সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে কাস্টম হাউসে ডিউটিরত ডিউটি অফিসার ডি. কে. বড়ুয়া আমাকে ফোন করে জানালো যে, একদল ছাত্র-শ্রমিক মিছিল করে এসে কাস্টম হাউসের ছাদে ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে বাংলাদেশের পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করতে চায়। কালেক্টর সাহেব কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে তাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছেন। আমি বললাম, বাধা দিয়ে লাভ নেই। সারা দেশে দিবসটি যেহেতু 'বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে তখন তারা বাংলাদেশের পতাকা তুলতে চাইলে তুলতে দাও। এরপর চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে বাংলাদেশের পতাকাই উড়েছে। বাংলাদেশের সব বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় সেদিন 'বাংলাদেশ' শিরোনামে এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হলো। বাসায় 'The Pakistan Observer' পত্রিকাটি রাখতাম। সেখানে বাংলায় লিখিত ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। ক্রোড়পত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত একটি অমর বাণী লিপিবদ্ধ ছিল।

২৪ তারিখে যথারীতি কাস্টম হাউসে এসে বাংলাদেশের পতাকা দেখে মনে হলো পাকিস্তানের এই অঞ্চল বাংলাদেশ ভূখণ্ড নামে সম্পূর্ণ অবয়বে অভ্যুদয়ের উদয় দিগন্তের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। কাস্টম হাউসে আদায়কৃত রাজস্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না হয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ৩৫টি নির্দেশ অনুসারে সমগ্র দেশের প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে, অথচ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ১৬ মার্চ থেকে ঢাকায় অবস্থান করছেন বাংলাদেশের একজন অতিথি হিসেবে। দেশের সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। প্রশ্ন হলো– এই পতাকার গুরুভার শেষ পর্যন্ত আমরা বহন করতে পারব তো? মনে মনে প্রার্থনা করলাম, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।'

বিকেলের দিকে খবর পেলাম, সোয়াত জাহাজ থেকে মিলিটারি পণ্য খালাস শেষ হয়েছে এবং জাহাজের এজেন্ট পোর্ট ক্লিয়ারেন্স গ্রহণ করে ২৫ মার্চ থেকে জাহাজে রপ্তানি পণ্য বোঝাই শুরু করতে চাচ্ছে। আমরা কোনো প্রিভেন্টিভ অফিসার পোস্টিং দেয়া থেকে বিরত থাকলাম। এজেন্ট তার নিজের দায়িত্বে পণ্য বোঝাই করতে পারে। তবে সেটা করলে কাস্টমস আইনে রপ্তানি সম্পর্কিত বিধান লঙ্ঘন হয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হবে।

২৪ মার্চের হত্যাকাণ্ড

২৪ মার্চ বিকেলে জরুরি প্রয়োজনে শহরের দিকে যেতে হলো। সন্ধ্যার আগে বাসায় ফেরার পথে আগ্রাবাদ সিজিও বিল্ডিংস-এর সামনের রাস্তায় দেয়া ব্যারিকেডে গাড়ি আটকে গেল। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার কাজে ব্যস্ত। জানতে পারলাম সোয়াত জাহাজের যুদ্ধাস্ত্র বহন করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক বিশাল ট্রাকবহর নিউ মুরিং থেকে শহরের দিকে রওনা হয়ে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্ট বিল্ডিং-এর কাছে পৌঁছার পর ব্যারিকেডের সামনে আটকা পড়েছে। বন্দর থানা থেকে আগ্রাবাদ পর্যন্ত পুরো পথই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে । বুঝলাম তিন নম্বর জেটি গেটের সামনে দক্ষিণ দিকটায় পোর্ট কলোনিতে আমাদের বাসায় এ রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। ড্রাইভারকে আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকার পাশের রাস্তা দিয়ে ফকিরহাট হয়ে তিন নম্বর জেটি গেটের সামনে যেতে বললাম। গাড়ি থেকে নেমে সেখান থেকে ব্যারিকেডের মধ্য দিয়ে রাস্তা পার হয়ে হেঁটে যখন বাসায় পৌঁছি তখন মাগরিবের আজান শুরু হয়েছে এবং সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেছে ব্যারিকেডের সামনে জমায়েত নিরস্ত্র শ্রমিক জনতার ওপর রাইফেল ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। মিলিটারি ট্রেইনিং-এর সময় এসব গুলির শব্দের সাথে আমি পরিচিত হয়েছি। বুঝতে বাকি রইল না যে চট্টগ্রামে এক নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গেছে। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। সে রাতে আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি। পরদিন ২৫ মার্চ সকালে খবর নিয়ে জানতে পারলাম, তখনো অনেক লাশ রাস্তায় পড়ে আছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের সকল দৈনিকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর ব্যানার হেডলাইনসে প্রকাশিত হলো। খবরের কাগজের রিপোর্টে ২৪ জনের মৃত্যুর খবর ছাপা হলেও আসলে সেদিন শতাধিক মানুষ হতাহত হয়েছে বলে আমরা জানতে পারি। কয়েক দিন আগে এমএসআই চৌধুরী সাহেব আমার পাশের বাসায় প্রতিবেশী হয়েছেন। আমরা দুজন তিন নম্বর জেটি গেট দিয়ে প্রবেশ করে বন্দরের ভেতর দিয়ে হেঁটে চার নম্বর গেট দিয়ে বের হয়ে কাস্টম হাউসে গিয়ে দেখি সবাই এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছে। অস্ত্রবাহী ট্রাকের বিশাল কনভয়টি তখনো কাস্টম হাউস থেকে বন্দর থানা এবং এম্বারকেশন হেড কোয়ার্টার্স মাঝখানের রাস্তা পর্যন্ত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে এবং ভারী অস্ত্র সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যরা সতর্ক পাহারায় টহলরত। অফিসে উপস্থিতির সংখ্যা নগণ্য।

কোনো আমদানিকারক, রপ্তানিকারক কিংবা তাদের এজেন্ট উপস্থিত হয়নি। আমাদেরও কাজে কোনো মুড নেই। কাজেই দুপুরের আগেই একই পথে হেঁটে নিরাপদে বাসায় পৌঁছালাম। সমস্ত পোর্ট এলাকায় নীরব নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে দেখলাম। সকালেও রাস্তায় অনেক লাশ পড়েছিল। যারা দেখেছে তারা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। সমস্ত শহরে বিদ্যমান এমন থমথমে পরিস্থিতিতে কোনো বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা তার পাকিস্তানি কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশে রাস্তার ব্যারিকেড পরিষ্কার করে বাঙালি নিধনের উদ্দেশ্য নিয়ে আসা মারণাস্ত্রবাহী সামরিক কনভয় ক্যান্টনমেন্টে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য ২৫ মার্চের ভয়াবহ রাতে নিশ্চিন্ত চিত্তে পোর্ট এলাকায় রওনা হয়ে আসতে পারে সেটা ভাবতেও কষ্ট লাগে। সে রাতে সে সময়ে ৮ম বেঙ্গলে কর্মরত ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান (১৯৬৯ সালে 6th Bengal-এ তিনি কর্মরত থাকার সময়ে আমার সাথে পরিচয় হয়) এ কাজ থেকে তাকে বিরত না করলে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা অধ্যায় অন্যভাবে রচিত হতো।

প্রতিরোধ যুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা

২৫ মার্চ রাত ১০টার পর শহরের দিকে থেকে থেকে গোলাগুলির শব্দ পেলাম। পরে জেনেছি যে হালিশহরের EPR Sector Headquarters-এর সৈনিকরা ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে রেলওয়ে হিলসে অবস্থান নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এই বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ২০ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈনিকরা ৩ এপ্রিলের আগে বের হয়ে আসতে পারেনি। এই বেলুচ রেজিমেন্ট ২৫ মার্চের রাতের অন্ধকারে East Bengal Regimental Centre (EBRC)-এ প্রশিক্ষণে যোগ দেয়া ঘুমন্ত বাঙালি সৈনিক ও তাদের প্রশিক্ষক অফিসারদের অধিকাংশকে হত্যা করে। সামান্য যে কয়জন পালিয়ে এসেছিলেন তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

রাতেই কয়েকটি টেলিফোন পেলাম ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর থেকে। সবগুলো ফোনে একই খবর পেলাম যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ২৬ মার্চ সকালের দিকে আগ্রাবাদ কলোনির এম এ হালিম নামে একজন প্রিভেন্টিভ অফিসার এসে জানালেন যে আগ্রাবাদের রেডিও অফিস থেকে একটি বহনযোগ্য ব্রডকাস্টিং ট্রান্সমিটার সরিয়ে কালুরঘাট ট্রান্সমিশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করার জন্য। রেডিও স্টেশনের ইঞ্জিনিয়ার ও কলাকুশলীদের সে সহায়তা করতে যাচ্ছে। আমাকে বিষয়টি শুধু অবগত করা সে তার কর্তব্য মনে করে আমার কাছে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা-সংক্রান্ত বার্তা সংবলিত একটি সাইক্লো স্টাইল করা কাগজ সে আমাকে দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছে। স্বাধীনতার এই বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি গোপন স্বাধীন বাংলা রেডিও স্টেশন চালু করার কাজে সে চলে গেল। আমি তার শুভ কামনা করলাম।

২৬ মার্চ থেকে আমরা তিন নম্বর জেটি গেইটের বাসায় আটকা পড়ে গেলাম। ২৮ তারিখ কাস্টম হাউসের ছাদ থেকে শহরের দিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। পরে জানতে পেলাম যে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস পাকিস্তানের কমান্ডো বাহিনী দখল করে নিয়েছে। সেখানে বসবাসরত সবাইকে বের করে দেয়া হয়েছে। কালেক্টর সাহেবসহ তিনতলার বাসায় বসবাসকারী ডেপুটি কালেক্টর ও সহকারী কালেক্টর নিকটস্থ পোর্ট রেস্ট হাউসে আশ্রয় নিয়েছেন। এরপর থেকে আমরা কাস্টম হাউসের ছাদের ওপরে অবস্থান নেয়া পাকিস্তানি কমান্ডো বাহিনী ও কর্ণফুলী নদীতে অবস্থানরত নৌবাহিনীর গানবোট এবং রেলওয়ে হিলস ও কোর্ট হিলের ওপরে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ ইপিআর বাহিনীর মধ্যে এপ্রিলের দুই তারিখ পর্যন্ত আটকা পড়ে গেলাম। গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এপ্রিলের তিন তারিখ ইপিআর বাহিনী পশ্চাদপসরণ করলে পাকিস্তানি সৈন্যরা বিনা বাধায় এতদিন ধরে মুক্ত থাকা চট্টগ্রাম শহরে ঢুকে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণে লিপ্ত হয়।

পরের কথা

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে কাস্টম হাউসে গিয়ে দেখতে পেলাম এক বিধ্বস্ত অবস্থায় আমাদের প্রিয় কাস্টম হাউস দাঁড়িয়ে আছে। সব অফিস রুমের তালা ভেঙে সবকিছু তছনছ করা হয়েছে মনে হলো। কাস্টম হাউসের ওপর দিয়ে গত বছরের ১২ নভেম্বরের বিধ্বংসী সাইক্লোনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি গতিবেগের ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে! এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য থাকায় এবং ব্যবসায়ী বা তাদের এজেন্টদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কাস্টম হাউসের সব কার্যক্রম পুরো এপ্রিল মাস প্রায় অচল হয়ে থাকল। এদিকে, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে কয়েক হাজার হজযাত্রী নিয়ে 'সফিনা-ই-আরব' জাহাজটি ১নং জেটিতে নোঙর করে। কিন্তু হজযাত্রীদের ব্যাগেজ পরীক্ষার জন্য কোনো প্রিভেন্টিভ অফিসার পাওয়া গেল না। ব্যাগেজ পরীক্ষা ছাড়াই তাদের ব্যাগেজ শেড ত্যাগ করার অনুমতি দিতে হলো। কিন্তু জানতে পারলাম হাজিরা বাড়ি যাওয়ার জন্য কোনো যানবাহন না পেয়ে ব্যাগেজ শেডে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানেই অনাহার-অর্ধাহারে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে বরিশাল হয়ে নারায়ণগঞ্জগামী জাহাজের পঁচিশে মার্চের পর ২৯ এপ্রিল শুরু হওয়া প্রথম ট্রিপেই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বরিশাল গেলাম। তাদের বাড়িতে রেখে ঢাকা হয়ে বিপদ সংকুল পথে পাকিস্তানি বাহিনীর নানা প্রতিকূলতা পার হয়ে মে মাসের শেষ সপ্তাহে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে কাজে যোগদান করে দেখতে পেলাম যে, আমরা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকের পর্যায়ে নেমে গেছি। অবাঙালি তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাই শুধু নয়, এমনকি চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সমীহ করে চলতে হয়েছে।।

জুন মাসে আমাকে নেভাল বেইসে সাব-জোনাল মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিসে তলব করা হলো। কমোডর সিদ্দিকীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি স্ক্রিনিং কমিটির সামনে যথাসময়ে হাজির হয়ে জানতে পারলাম যে, আমার বিরুদ্ধে দুটি গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। এর প্রথমটি হলো শেখ মুজিবের নির্দেশ পালন করে শুল্ককর বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব পাকিস্তান সরকারের কোষাগারে জমা না করার ক্ষেত্রে আমি নেতৃত্ব দিয়েছি। আর দ্বিতীয়টি হলো কাস্টম হাউসের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে শেখ মুজিবের নির্দেশিত পতাকা আমার অনুমতি নিয়ে উত্তোলন করা হয়েছে। দুটি অভিযোগই রাষ্ট্রদোহিতার পর্যায়ে পড়ে। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমার কোনো বক্তব্য আছে কি না–তা জানার জন্যই আমাকে তলব করা হয়েছে। কেন জানি না কোন শক্তিবলে আমি ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে শান্তভাবে বললাম, যে কাস্টম হাউসে আমার অবস্থান তৃতীয় স্থানে। আমার ওপরে কালেক্টর সাহেব কাস্টম হাউসের এক নম্বর দায়িত্বপ্রাপ্ত হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট এবং দ্বিতীয় অবস্থান ডেপুটি কালেক্টরের । মার্চ মাসে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা তাদের সিদ্ধান্তেই হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের কোনো জবাবদিহিতা আছে কি না সেটা আমি জানি না। কমোডর সিদ্দিকী একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। অবসর গ্রহণের পর তিনি শিপিং এজেন্ট হ্যাগি অ্যান্ড কোম্পানিতে (Hegge & Co.) জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে আমার কাছ থেকে অনেক ব্যাপারে সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তবু তাকে কঠোর বলে মনে হলো। তিনি জানালেন যে কালেক্টর ও ডেপুটি

কালেক্টর দুজনকে এর আগেও ডাকা হয়েছিল। তারা জানিয়েছেন, শুল্ককর সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ার সিদ্ধান্ত আমার প্রস্তাব অনুসারেই নেয়া হয়েছে। আর পতাকা উত্তোলনের বিষয়টি কাস্টম হাউস প্রশাসনের দায়িত্বে থাকার জন্য আমার ওপরেই বর্তায়। বুঝতে পারলাম যখন কালেক্টর সাহেব ও ডেপুটি কালেক্টর সাহেব দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন তখন আমাকে দায়িত্ব নিয়ে জবাব দিতেই হবে। যেই উত্তরই দেই না কেন তাতে এই কমিটি সন্তুষ্ট হবে না। কাজেই, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। ভাগ্য অনুকূল হলে এবং কমোডর সিদ্দিকী সহানুভূতিশীল হলে হয়তো মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে চাকরিচ্যুতির দণ্ড পেতেই হবে। সে সময়ে আমি যে কোনো দণ্ডের জন্য প্রস্তুতি নিয়েই বললাম যে, আমরা সরকারি রাজস্ব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সিডিউলড ব্যাংকেই এ রাজস্ব জমা রাখার ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কেননা ৮ মার্চ থেকে আমদানিকারক ও তাদের এজেন্টদের দাবি ছিল– যে কোনো শুল্ককর পরিশোধ ব্যতিরেকেই পণ্য খালাস দিতে হবে। আমরা তাদের অনেক প্রচেষ্টার পর বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, শুল্ককর সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতি দেয়া না হলে তা আইনগতভাবে তাদের পরিশোধ করতেই হবে। নতুবা পণ্য খালাস দেয়া যাবে না। তবে তারা ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানে রাজস্বের অর্থ জমা দিতে রাজি না হলে তখন একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে যে কোনো সিডিউলড ব্যাংকে এ অর্থ জমা করলেই সাময়িক শুল্কায়ন পদ্ধতিতে পণ্য খালাস দেয়া যাবে। এরপর তারা ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক এবং ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন নামক দুটি ব্যাংকে শুল্কায়িত রাজস্ব জমা দিয়ে পণ্য খালাস নিতে শুরু করে। কাস্টম হাউসে ১১ মার্চ থেকে এই পদ্ধতিতে পণ্য খালাস দেয়া হয়েছে। আর আওয়ামী লীগের এ- সংক্রান্ত নির্দেশ ১৫ মার্চ আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি। কাজেই চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে গৃহীত ব্যবস্থা আওয়ামী লীগের নির্দেশ পালন করে গ্রহণ করা হয়নি। নিজস্ব উদ্যোগ ও উদ্ভাবনে গৃহীত এই ব্যবস্থায় সরকারি রাজস্ব সংরক্ষিত হয়েছে বলেই ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ ইতিমধ্যেই সরকারি খাতে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে জমা হয়ে গেছে। সে সময়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা না করা হলে সরকারের রাজস্ব স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতো।

দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে বললাম যে, ২৩ মার্চ ছিল সরকারি ছুটির দিন। সেদিন আমি অফিসে যাইনি। পরদিন অফিসে গিয়ে জেনেছি যে, ২৩ মার্চ একটি জঙ্গি মিছিল এসে এই পতাকা উত্তোলন করে গেছে। ছুটির দিন জনশূন্য অফিসে অতি সহজেই কাজটি করে গেছে। এজন্য কাস্টম হাউসের কাউকে দায়ী করা যায় না। বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য করতে আমাকে অনেক সত্য গোপন করতে হয়েছে। কমিটির কাছে এ বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সে সময়ে সেটা অনুমান করাও কষ্টকর ছিল। আমি সেখান থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারব কি না সেটাও অনিশ্চিত ছিল। বক্তব্য শেষে আমাকে পাশের বসার কক্ষে অপেক্ষা করতে বলা হলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পালা শেষ হলে বিকেলবেলা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলা হলো প্রয়োজনে আবার ডাকা হবে। তবে এ ব্যাপারে আমাকে আর নেভাল বেইসে যেতে হয়নি কিংবা কোনো শাস্তিও ঘোষণা করা হয়নি। জুন ও জুলাই মাস একটা অজানা আশঙ্কার মধ্যে অপেক্ষমাণ থেকে আগস্ট মাসের দশ তারিখ থেকে আবার এক মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করলাম এবং ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেলে ঢাকা হয়ে বরিশাল চলে গেলাম। সেপ্টেম্বর মাসে ফিরে এসে দেখলাম যে মুক্তিযোদ্ধারা বন্দরে নোঙর করা দুটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছেন। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। তখন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত কাস্টম হাউসে অধিকাংশ সময় জুড়ে অলস সময় পার করেছি। ডিসেম্বরের ৩ তারিখ সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে ৪ তারিখ সকাল থেকে বন্দরের অয়েল টার্মিনাল এলাকা জ্বলতে দেখেছি। যুদ্ধের অগ্রগতি এবং শেষ পরিণতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয় তখন প্রাধান্য পায়নি। চৌদ্দ তারিখের দিকে বিজয় যখন অত্যাসন্ন, তখন পাকিস্তানের সাহায্যে ধেয়ে আসা সপ্তম নৌবহরের নৌসেনারা যাতে নদীপথে তীরে আসতে না পারে সেজন্য কর্ণফুলী চ্যানেলের প্রবেশপথে মিত্রবাহিনী বোমা বর্ষণ করে কয়েকটি জলযান ডুবিয়ে দেয়। চট্টগ্রাম বন্দর কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের নৌবাহিনীর সহায়তায় বন্দরে ডুবে যাওয়া জাহাজ ও অন্যান্য নৌযান অপসারণ করা হলে ধীরে ধীরে বন্দর সচল হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসে।

- লেখক **আবদুল লতিফ সিকদার,** অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

Anywhere .... Everywhere...
Customs Intelligence

গোয়েন্দারা কেমন করে কাজ করে

আলী আহমদ

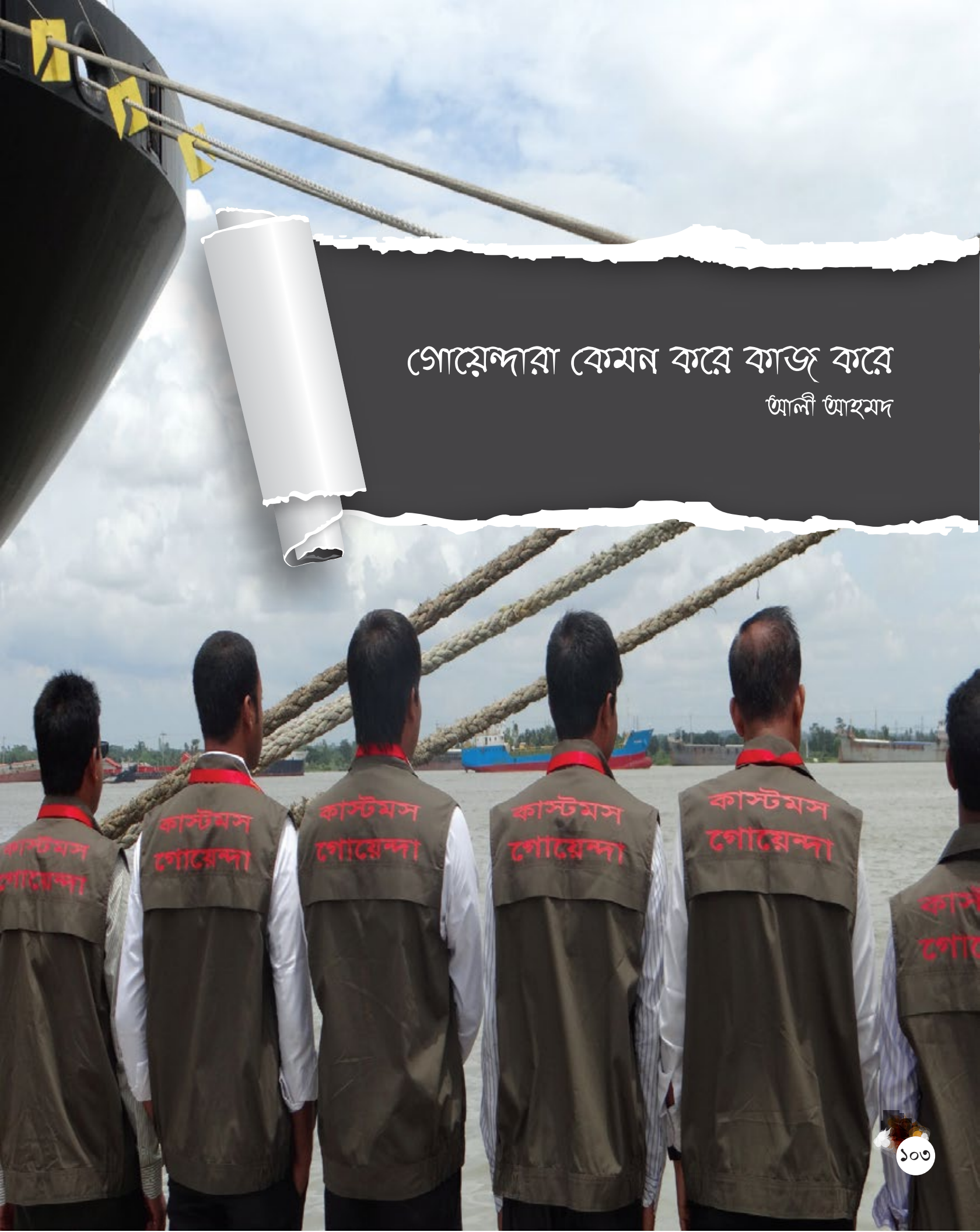

তারিখটা ঠিক মনে নেই। তবে সেটি যে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল তা সুস্পষ্ট মনে আছে। অফিসে যাবার কোনো তাড়া ছিল না। বিছানা ছেড়েছিলাম তাই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ একটু দেরিতে। আর বিছানা ছেড়েই পড়ি-কি-মরি বেগে যথারীতি গোসলখানার দিকে না-ছুটে খানিকটা হেলেদুলেই যেন শোয়ার ঘর ছেড়ে খাবার ঘরে আমার নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসি। সামান্য হাত বাড়িয়ে খবরে কাগজ দুটো কাছে এনে চোখ বুলাতে শুরু করি। ছুটির দিনে এটিই হচ্ছ আমার অনিয়মের নিয়ম। ইংরেজি কাগজটির দ্বিতীয় পাতার একেবারে ওপরের দিকে দুতিন কলামব্যাপী নাম-করা দামি একটা গাড়ির ছবি; নিচে এটি শুল্ক গোয়েন্দাদের আটক-করা বলে লেখা। আমার চোখকান অধিকতর সচেতন হয়ে উঠল; একটু যেন নড়েচড়ে বসে প্রায় এক নিঃশ্বাসে নাতিদীর্ঘ সংবাদ-নিবন্ধটি পড়ে ফেললাম। যা জানলাম তা তেমন নতুন কিছু নয়। ঐ গাড়িটির নাম-দামসহ প্রায় সবকিছুই মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে, আরোপনীয় শুল্ক-করের চেয়ে অনেক কম রাজস্ব পরিশোধ করে খালাস এনে মিথ্যা নাম, ইঞ্জিন ও শ্যাসি নম্বরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধন করিয়ে নিয়ে উঠতি ধনী ব্যবসায়ী মালিকটি দিব্যি চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই সুখে বাধ সাধলো এসে একদল উটকো গোয়েন্দা। বলা নেই কওয়া নেই এতো সুন্দর দামি একটা গাড়ি হঠাৎই তারা ধরে জব্দ করে নিয়ে এল!

এমনই মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে; আবার কখনো কখনো কিছুই হয় না। মানে তেমন কিছু একটা ধরা হয় না। কিন্তু মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এমন দামি গাড়ি, এক পণ্যের পরিবর্তে অন্য আরেক জিনিস, ঘোষণার চেয়ে বেশি পণ্য, কোনো রকমের শুল্ক-কর পরিশোধ না-করেই পণ্য খালাস, কিংবা সঠিক মূল্যের চেয়ে কম মূল্য দেখিয়ে শুল্ক ফাঁকি ইত্যাদি হাজারো রকমের প্রতারণা হরহামেশাই করা হয়ে থাকে। এগুলো প্রতিরোধ করে সরকারের প্রাপ্য যথাযথ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা দায়িত্বপ্রাপ্ত শুল্ক কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ। আর শুল্ক গোয়েন্দাদের কাজ হলো এখতিয়ারধারী শুল্ক কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে আসার পরেও, উল্লিখিত এক বা একাধিক ত্রুটিযুক্ত পণ্যচালানের ওপর নজরদারি রেখে শুল্ক কর্তৃক্ষের নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকা অবস্থায় কিংবা নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে আসার পরেও ঐ সমস্ত পণ্য জব্দ ও অপরাধীকে আটক করা। প্রথমেই যে গাড়িটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি ছিল এখতিয়ারধারী শুল্ক কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসা বেশ দামি একটি গাড়ি। তারপর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ নামক যে সরকারি সংস্থার কাছ থেকে গাড়িটি নিবন্ধন করাতে হয়েছিল তাদেরও কাগজপত্রের সাথে গাড়িটি মিলিয়ে দেখার কথা। 'চোখে ধূলো দিয়ে' বলে যে একটি বাক্যাংশ এরূপ ক্ষেত্রে সচরাচর ব্যবহার করা হয়ে থাকে, আমি সচেতনেই সেটি এড়িয়ে গেছি। কারণ গাড়ির মতো দৃশ্যমান বড়সড় রকমের একটি বস্তু জাহাজ থেকে বন্দরের সুরক্ষিত এলাকায় নামানোর পর শুল্ক ও বন্দর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অনেক সংস্থাসহ যতোগুলো স্তর পেরিয়ে তা বন্দর-নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিতে হয়, তাতে সংশ্লিষ্ট সকলের চোখে ধূলো দিতে হলে যতোখানি ধূলোর প্রয়োজন, কোনো আমদানিকারক কিংবা তার সাঙ্গপাঙ্গদের পক্ষে অতটা পর্বতপ্রমাণ ধূলো বহন করা ও ছিটানো কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং ধূলো ছিটানো সম্ভবপর না-হলে, অন্য কী ছড়ানো হয়ে থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই শেষোক্ত কর্মটির সাথে যারা জড়িত তাদেরকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদিচ্ছাই প্রশ্নবিদ্ধ হবার আশঙ্কা থাকবে।

এই গাড়িটি আটকের ব্যাপারে খুব উৎসাহিত হয়ে আমি শুল্ক গোয়েন্দা দপ্তরে যোগাযোগ করি। সেদিন আমার শুনে খুব ভালো লেগেছিল যে বোর্ডের চেয়ারম্যান গোয়েন্দা মহাপরিচালককে বোর্ডে ডাকিয়ে নিয়ে রাজস্ব বোর্ডের উর্ধ্বতন সব কর্মকর্তাদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই প্রশংসনীয় কাজের জন্য। খুশি হয়েছিলাম, আর ভেবেছিলাম যে যাক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রশাসনে এতদিনে তাহলে ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করার মতো উদারতার একটি সংস্কৃতি প্রচলন হলো! এ বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতা প্রায় উল্টোই বলা যেতে পারে। বোর্ডের খোদ চেয়ারম্যান তো হনুজ দুরস্ত, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে, কমিশনার মহোদয়গণও চাঞ্চল্য উদ্রেককারী অনিয়ম উদঘাটন এবং/ কিংবা অপরাধী আটক যেন উটকো একটা ঝামেলা বলেই মনে করতেন; আর উদঘাটক কর্মকর্তাকে যেন চিনতেনই না। 'তুমি খালি গণ্ডগোল লাগানোর মধ্যেই থাকো' বলে চাঞ্চল্যকর আটক ও উদঘাটনের পর দুয়েক চেয়ারম্যান কোনো কোনো কমিশনারকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছেন এমনটিও আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই আছে। চেয়ারম্যান কিংবা সদস্যগণ এই যে অভিনন্দন জানালেন, ভবিষ্যতেও যেন তা চালু থাকে আমরা এই আশাই করবো। গাড়ি আটক সম্পর্কে আর দুয়েকটি কথা বলে এ প্রসঙ্গে ইতি টানবো। ওটি ছিল অপঘোষোণার

মাধ্যমে গাড়ি ছাড়ানো ও নিবন্ধন করানোর ঘটনা। অনুরূপ ঘটনা নিশ্চয়ই আরও থেকে থাকবে। কিন্তু কূটনৈতিক ও 'বিশেষ সুবিধাভোগী' লেবেলের আওতায় শুল্কমুক্তভাবে যতোগুলো গাড়ি দেশে আসে তার কতগুলো শুল্কমুক্তভাবে দেশের মধ্যে থেকে গেছে খুব সহজেই তার একটি হিসাব বের করে ফেলা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এদিকে নজর দিতে পারেন।

উল্লিখিত গাড়ি আটকের দিনকয়েক আগে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাকে শুল্কগোয়েন্দা সদর দপ্তরে একটু যেতে হয়েছিল। আমার পুরনো সহকর্মীদের মধ্যে জনাকয়েককে ওখানে কর্মরত দেখে ভালো লাগল। এরা বেশ দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে সুপরিচিত। অধুনা শুল্কগোয়েন্দা অধিদপ্তর চমকপদ যেসব চোরাচালানের রহস্য উন্মোচন করছে ও এর সাথে জড়িত অনেক বড় বড় চাঁইদের মুখোশ খুলে ধরছে তার পেছনে ঐ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চোখকান হিসেবে ঐসব কর্মকর্তাগণ একযোগে কাজ করছেন বলেই এমন ঈর্ষণীয় সাফল্য আসছে বলে আমার ধারণা। ঐদিনের কাজটুকু সেরে বেরোবার মুখে দেখি একটি আধা-ঝরঝরে গাড়ি উপচে পড়া বোঝাই করে ওরা তাড়াহুড়া করে কোথাও বেরোচ্ছিল। আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে খানি-কটা কুশল বিনিময় করে, ঐ গাড়ির পক্ষে যতটা সম্ভব দ্রুত বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছিল, এসব ক্ষেত্রে তা জিজ্ঞেস করার রীতি নেই বলে তা করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে এটা বিলক্ষণ বুঝেছিলাম যে কোন শিকারের গন্ধ পেয়ে তার পিছনেই ছুটে গিয়েছিল ওরা। এমনি করেই গোয়েন্দারা ছুটে চলে দিন-রাত---সময়ে-অসময়ে। সব সময়েই যে শিকার ধরতে পারে তা নয়। কখনো হয়তো তাদের যথাস্থানে পৌঁছার আগেই চিড়িয়া উড়ে যায়, কখনো সম্ভাব্য শিকার আগেভাগেই গোয়েন্দাদের গন্ধ পেয়ে অন্য পথে চলে যায়, নয়তো আসাই স্থগিত করে দেয়, কিংবা এমনও কখনো কখনো দেখা যায় যে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সবকিছু মিললেও, কাম্য বস্তু হয়তো মিললোই না। তথ্যের হেরফের গোয়েন্দা কার্যক্রমের একটি প্রায়-অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এর অবশ্য কারণও আছে।

গোয়েন্দা কার্যক্রম মূলত জানা-অজানা ব্যক্তিদের সরবরাহ করা খবর-নির্ভর। মানুষের অনীর্ষ্ণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ঈর্ষা। এই ঈর্ষার কারণেই বিরাট সংখ্যক মানুষ তাদের পরিচিতি-বৃত্তের মানুষদের অপরাধ-প্রচেষ্টার খবর আগেভাগেই গোয়েন্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়। যে-কর্মকর্তা বা যে-দপ্তর ওরকমে-পাওয়া সংবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অপরাধীকে ও অপরাধ-সংশ্লিষ্ট পণ্য জব্দ করে, আমার অভিজ্ঞতা বলে, অপরাধ-সংক্রান্ত সংবাদের জন্য তাঁকে আর ছোটাছুটি করতে হয়না; অনুরূপ খবরই তাঁর পিছুপিছু ছুটতে শুরু করে। এরূপ সংবাদদাতাদের অধিকাংশই সংবাদ দেয়ার জন্য বেশ ভালো অঙ্কের টাকা পাওয়া যায় জেনেও কখনো সামনে আসে না।

পেশাদার সংবাদদাতাদের বিষয়ে গোয়েন্দা সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন। কিছু অগ্রিম ও সফল সংবাদের পরে অর্থপ্রাপ্তির আশায় তারা চোরাচালান, মিথ্যাঘোষণা ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। এতেও অন্যায়ের উদঘাটন হয়ে থাকে; কিন্তু কখনো কখনো অসচ্চরিত্রের কিছু লোক গোয়েন্দাদের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগিয়ে নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। তবে পরীক্ষিত সৎ, সাহসী ও দক্ষ কর্মকর্তাদের বেছে বেছেই সবসময় গোয়েন্দা কার্যক্রমে লাগানো উচিত। তা নাহলে কী ফল হতে পারে তার অনেক উদাহরণ এই বিভাগের লোকদের জানা আছে।

আগে কিন্তু এমন ছিল না। চোরাচালান, অপঘোষণা, কিংবা অন্যান্য হরেক রকম শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও অন্যান্য কর ফাঁকির ঘটনা উদঘাটন, তার প্রচেষ্টা নিরোধ কিংবা ফাঁকির উৎস নিশ্চিহ্নকরণ ইত্যাদির জন্য এখন যে-ধরণের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত পুরস্কারের আইনানুগ ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ একজন কর্মকর্তা আক্ষরিক অর্থেই ঈর্ষণীয় পরিমাণের অর্থ সৎভাবে আয় করতে পারেন; তাঁকে কোনোরূপ নৈতিক স্খলনের পথ ধরতে হয় না। কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন থাকে। যে-সকল উঁচুস্তরে বসে এই সমস্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সে-সমস্ত স্তরের কোথাও যদি অনভিজ্ঞতা, অসততা, হীন আঞ্চলিকতা, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কোনো এক বা একাধিক দুষ্টব্যাধি অনুপ্রবেশ করে ফেলে, তাহলে কী হতে পারে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত বলার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। এমন ঘটনা আমরা হরহামেশাই ঘটতে দেখি। উর্ধ্বতন নীতিনির্ধারকদের এ ব্যাপারে সদাসচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা ফল অশুভ হতে বাধ্য।

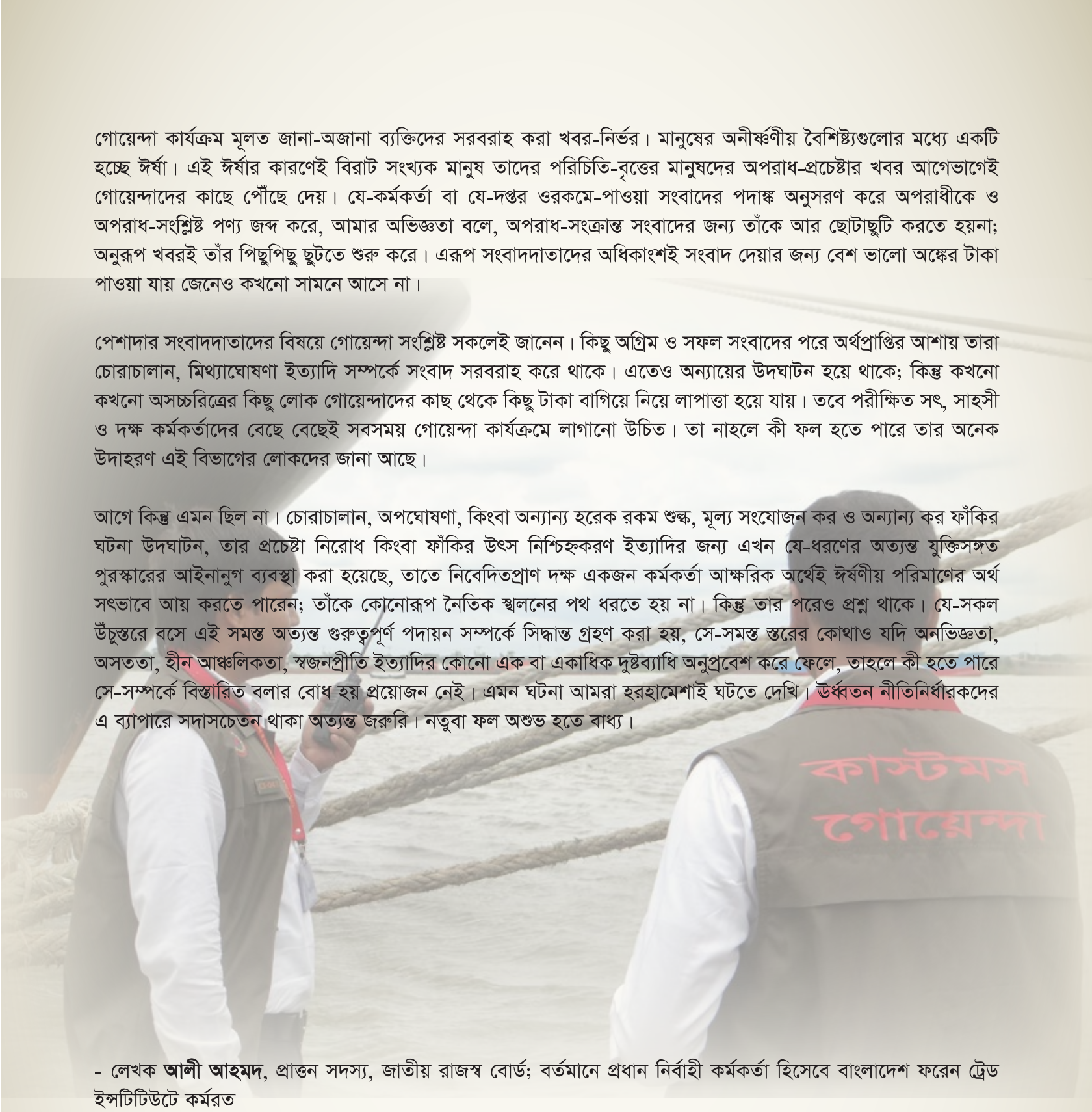

- লেখক **আলী আহমদ**, প্রাক্তন সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউটে কর্মরত

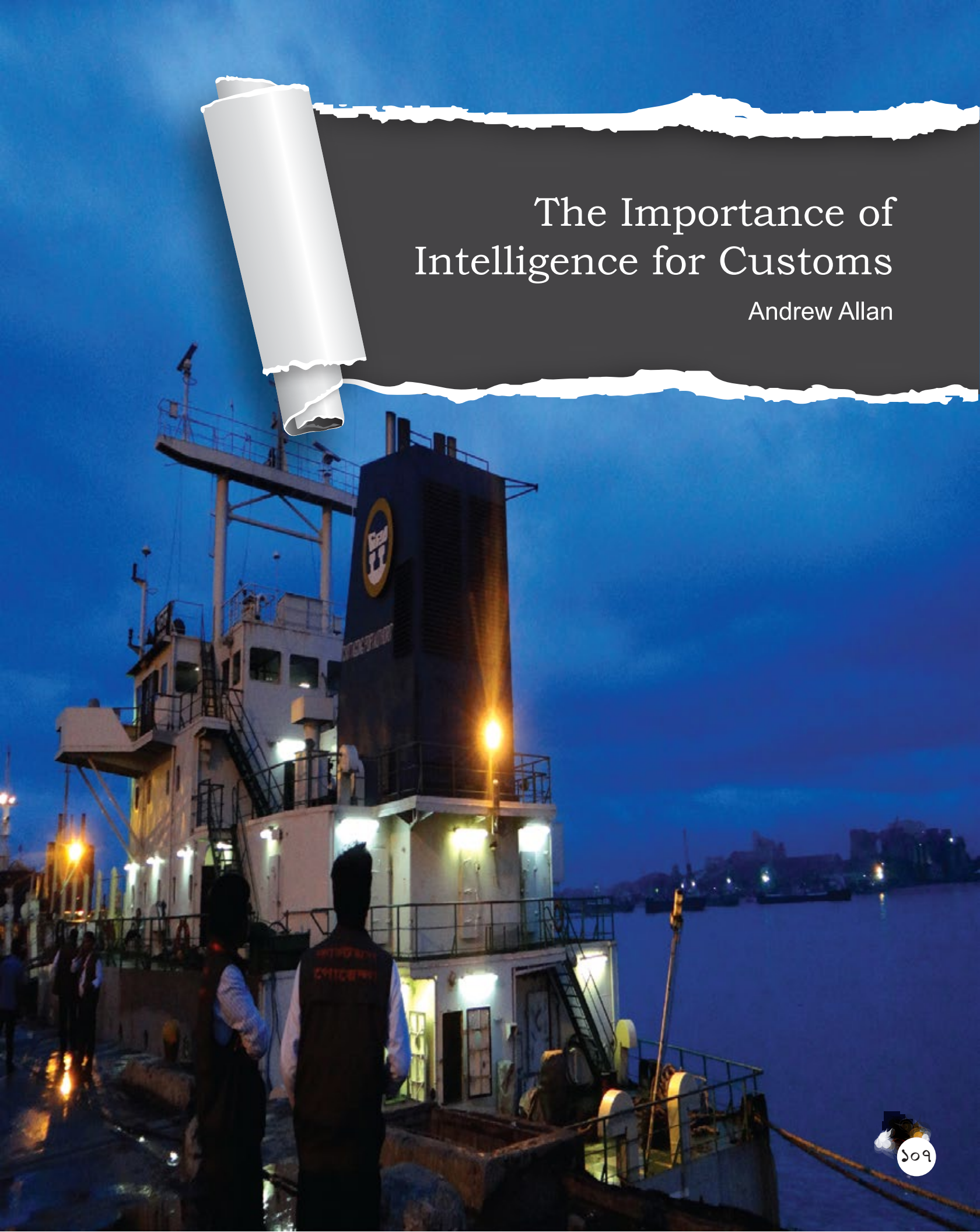

The Importance of Intelligence for Customs

Andrew Allan

Customs Intelligence

Modern customs administrations all have an Intelligence section, but where should it sit, and how should it operate? Normally the Intelligence section will form part of an 'Enforcement Directorate'. The below diagram shows a typical Enforcement Directorate and its components. You will see some differences in the diagram to what is currently in place at the NBR/ customs, as Intelligence and Investigation are combined at present. Also you will see there is an 'Anti-Smuggling' section, these are mobile units used for targeted interceptions, risk management exercises, investigations support and other front line compliance activities. Also typically within an Enforcement Directorate, are Risk Management and Post clearance Audit. Intelligence is a largely centralized function, but with Intelligence liaison officers at key locations to work with local officers, stakeholders and other Govt. agencies.

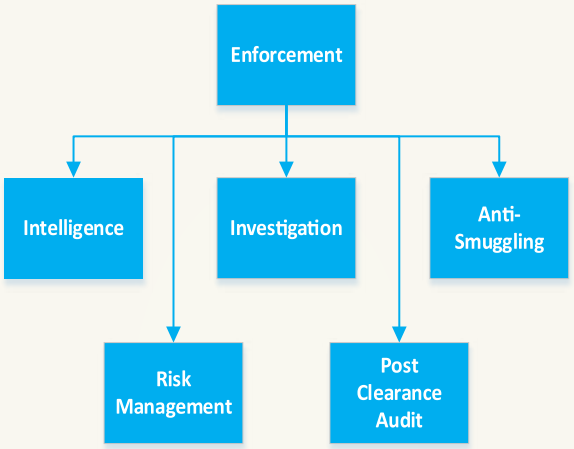

Why do we need Intelligence?

The volumes of goods and passengers crossing borders in this more connected world, means that customs officers must be 'selective' on what or who they intercept, as it is impossible to look at everything. Modern trade demands also place an obligation on customs, and other border agencies, to be more selective; compliant trade rightly expects to be rewarded for that compliance, and expects customs departments to provide a level playing field for trade by penalizing the non-compliant. This 'level playing field' is important, not just to make sure trade is conducted fairly, but to ensure the maximum amount of available revenue is collected, to reduce costs to trade, reduce costs of goods to the consumer (YOU!), but to also make a country more competitive for investors, which creates jobs, and grows the economy. Quite a responsibility!

This situation has meant that customs administrations around the world are implementing Risk Management strategies to enable them to identify Risk, and Treat risk. This will not be news to many reading this article, but here in Bangladesh, Risk currently remains largely unidentified, with emphasis on officers applying there own personal 'risk management' when determining what or who to look at. Now, many officers are experienced, and can do this with a reasonable success rate, but it

remains on an individual level, and so is less efficient, and is generally lost when the officer retires or rotates to new post. It also means that treatment of 'risk' is uneven, and the non-compliant have a reasonable chance of evading customs control.

To become more efficient at identifying and treating 'risk', organizations such as the NBR need to develop Intelligence sections, along modern principles, as part of their Enforcement arms. In the NBR, this will likely mean the development of Intelligence sections in Customs, VAT and Revenue. Each departments Intelligence section would feed into their respective Risk Management Units, to promote compliance through better targeted interventions. Further than that though, these separate intelligence units will share data to allow the NBR to better address all of its' 'risks'.

What is Intelligence?

So now we understand better why we need it, what exactly is it? The World Customs Organization offers a high level definition as:

- ***"A product, derived from the collection and processing of relevant information, which acts as a basis for user decision-making."***

Under this high level definition are three type of Intelligence, defined by the WCO as:

- **Strategic** - ***"An intelligence product, which supports policy makers in formulating and implementing the high-level aims, objectives, policies and plans of Customs."*** At a strategic level, policy makers need intelligence about new and changing threats or opportunities, to help them make decisions about the strategic positioning of Customs within Government.

- **Tactical** – ***"An intelligence product, which supports national and local managers of front-line units in planning activity and deploying resources to achieve operational objectives."*** At a tactical level, managers need intelligenceabout new or changing patterns of compliance to support decisions about how to target frontline resources in the most effective way.

- **Operational** – ***"An intelligence product, which supports frontline units in taking case-specific action to achieve compliance or enforcement objectives."*** At an operational level, front-line units needintelligence about the activities, capabilities and intentions of specific non-compliant individualsand businesses.

Intelligence assists decision makers, whether that be the Chairman of the Board, Members, Commissioners, or Revenue Officers, to make better informed decisions, whether this is through automated systems such as ASYCUDA World in relation to selectivity, stopping a passenger at an airport/ border crossing, deciding on legislative or developing strategic plans.

Intelligence is a critical enabler for the rest of the Enforcement Directorate, providing them with the necessary data to make informed decisions these units are all less efficient:

- Risk Management Unit
- Investigation
- PCA and
- Front-line units

Where does Intelligence come from?
Intelligence is derived from 'information', and information can come from a variety of sources. Below is a basic example of what is referred to as the 'Information Pool'.
A key source for the NBR/ customs Intelligence section, will be ASYCUDA World, which as mountains of data to be mined. Intelligence analysts can be assigned 'projects', which could be a sector of imports – classification codes – to research for anomalies – value/ description/ weights/ etc.

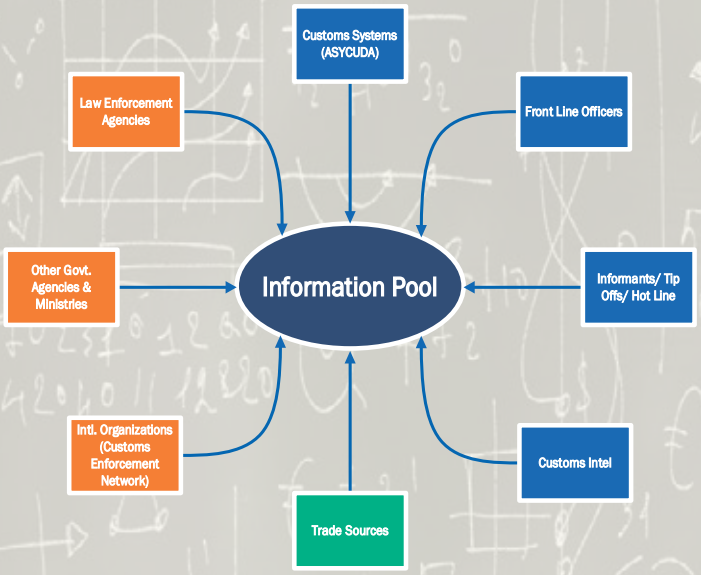

As seen from the diagram, there are multiple sources from where customs can get information, which can then be analysed, graded and then disseminated. Information remains exactly that until it can be analysed or assessed, its credibility needs to be determined or graded before being disseminated and resources applied to deal with it.
Already mentioned, is ASYCUDA, but what about other sources of information?

- **Front Line customs** – It is vital that customs officers realise how important their role is in the gathering of information for intelligence purposes. It may be the recording of suspicious vehicle movements at a border, a document found during the inspection of a passengers baggage, the correct recording of cargo examination details on ASYCUDA (inspection act), or something noticed by PCA officers when at a traders premises. If an officer feels something is suspicious, it should be noted on an Intel Report form, and sent to the Intelligence section.

- **Human Intelligence (Humint)** – this can be sources such as the trade, businessmen who know their competitors are cheating and want a level playing field; concerned citizens who-

just want to do the right thing; persons seeking a reward for their information; criminals seek ing to put their completion out of business. 'Humint' has to be carefully managed, and any rewards only paid on a results basis.

- **Review of Trade Data –** this can be identifying value trends from internet sources; end of year statement of companies; export data from other countries; chambers of commerce; etc.
- **Other Govt. Agencies –** inter agency cooperation is vital in the Intel arena, the NBR already has VAT and Revenue with whom Customs can share data, but there are also other agencies such as the BSTI, DGDA, Min of Agriculture, and more, who all may encounter goods illegally imported or exported into/ out of Bangladesh. Customs Intelligence should establish links and MoU with such agencies.
- **Other Law Enforcement Agencies** – a good example here would be the Border Guard; Immigration; Airport Security; National Intelligence and the Military. The NBR should establish liaison links with other agencies, along with MoU on the sharing of intelligence. In an age of increasing international crime and terrorism, customs has a vital role to play.
- **Other Nations** – The WCO promotes international cooperation on enforcement issues (see later section on CEN), and the NBR should proactively seek to develop Customs Cooperation MoU with neighbouring countries, and its main trading partners.

The development of an Intelligence Section should be coupled with an 'outreach' plan, for the education of officers and stakeholders (including the private sector) and to inform the public on how to share information with the Intelligence Section, and on how such information is protected, a major concern for private sector informants and members of the public.

So what do we do with this information?

The Intelligence Cycle

Intelligence units are not passive, sitting waiting for information to arrive in their laps, they should focus their activities on the priorities of the administration, which in almost all countries falls into two categories, 'revenue' – reduction of evasion and smuggling and 'Protection of Society' – narcotics, firearms, indecent/ obscene material, harmful substances, etc.

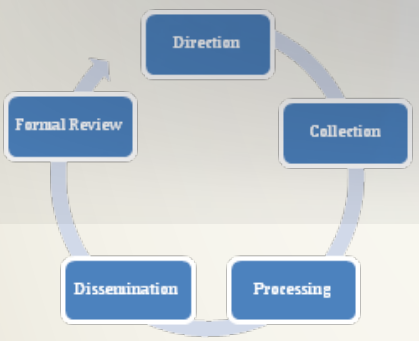

The Board will determine the priorities, based on national need,and this gives the Intelligence unit its **'Direction'**.The **'Collection'** process should be planned. To ensure the most relevant sources of information are selected.For **'Processing'**, the information is evaluated, collated, analysed and interpreted. As part of the'processing' phase, the intelligence is graded, and this determines which users receive the product. Once processed, the intelligence section will be responsible for **'Dissemination'** (delivery) to the appropriate user. During the **'Formal Review'**, the intelligence product is discussed to determine how useful it has been. This feedback is critical for the ongoing intelligence process, as it allows the Intelligence section to widen or narrow its focus to provide what the end users need.

Grading Intelligence

There is a commonly used system for the grading of intelligence, aimed at helping decision makers decide on how best to use it. The system is called the '5x5x5 System', and it is used to show the level of trust placed in the source of the information, and how highly the information is rated. For example, the best possible intelligence would be graded A1. This grading system is also used as part of documenting the information/ intelligence process. It is extremely important that the information-to-intelligence process is properly documented. From the initial registering of the information onto a specific form, to the recording of the analysis, grading and dissemination.

Source and information/intelligence evaluation to be completed by submitting officer

Source evaluation	A Always reliable ☐	B Mostly reliable ☐	C Sometimes reliable ☐	D Unreliable ☐	E Untested Source ☐
Information/ intelligence evaluation	1 Known to be true without reservation ☐	2 Known personally to the source but not to the person reporting ☐	3 Not konwn personally to the source but corroborated ☐	4 Cannot be judged ☐	5 Suspected to be false ☐

Managing Intelligence

Intelligence is by its very nature 'sensitive', and so it must be managed through a series of protocols, to ensure it does not fall into the wrong hands, do not forget, we may be dealing with personal or business sensitive data. This is where the third '5' in the above mentioned '5x5x5 system' is used, and below is an example of what those protocols could look like.

1	2	3	4	5
Default: Permits dissemination within the NBR Customs service **and** to other law enforcement agencies as specified.	Permits dissemination to Bangladesh non-prosecuting parties.	Permits dissemination to foreign law enforcement agencies.	Permits dissemination within originating service/agency only: specify reasons and internal recipient(s). Review period must be set.	Permits dissemination but receiving agency to observe conditions as specified.

This culture of security extends to the operations of the Intelligence Section, their offices normally have controlled access, biometric door locks for example, and only authorized officers should enter them. Files and papers must always be locked away at the end of the day, a 'clear desk policy', with hard drive back-ups secured in a safe.

The Customs Enforcement Network (CEN)

This is a WCO organization, focused on assisting and connecting customs administrations. The CEN offers software which can connect customs to worldwide seizure data, allowing the administration to understand trends, and data-mine for intelligence gathering purposes. The software is in three parts:

- Global Customs Enforcement Network (CEN) – This acts a central repository for seizures and offences, and includes photographs of concealments.
- National Customs Enforcement Network (nCEN) – nCEN enables administrations to manage much of their enforcement data, seizures, and suspects in databases for analysis.
- Customs Enforcement Network Communication (CENcomm) – A web based platform providing the ability to communicate, exchange and disseminate information in a secure environment.

(For further information on CEN, see the WCO website – www.wcoomd.org)

- Author **Andrew Allan**, Team Leader, National Single Window, USAID Bangladesh Trade Facilitation Activity *(The views expressed herein are the sole responsibility of IBI International and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government)*

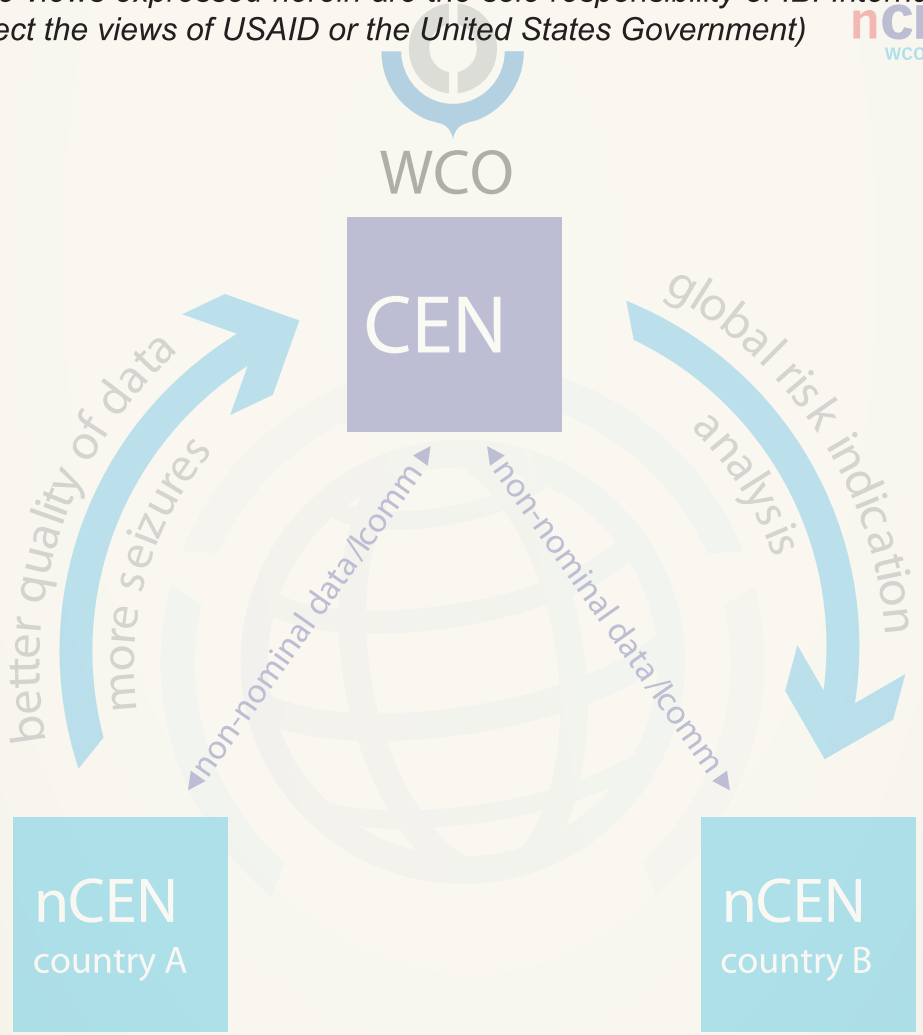

ফলোআপ

শাহাবুদ্দীন নাগরী

ঘটনাটা অনেকটা এ রকম হয়।

একটা গোপন সংবাদ পাওয়া গেলে সচল হয়ে ওঠে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের ফোনগুলো।

'শোনেন, আপনি কোথায়?'

'স্যার, আমি এয়ারপোর্টে।'

'একটা ইনফরমেশন নোট করেন।'

অফিসার লোকজন থেকে আলাদা হয়ে যান। ডায়েরি বের করে নোট করেন।

'জ্বি স্যার।'

'ফ্লাইট নং ....।'

'জ্বি স্যার।'

তারপর যাত্রীর বর্ণনা, নাম, কী অবৈধ পণ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, কীভাবে লুক্কায়িত থাকবে ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয়া হয় অফিসারকে।

'লোকবল লাগলে বলবেন, হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠিয়ে দেবো। ফ্লাইট আসবে দশটায়, আপনারা ন'টার মধ্যে পজিশন নিয়ে নেবেন।'

'জ্বি স্যার।'

এয়ারপোর্টের গোয়েন্দা কর্মকর্তাগণ সকলে ব্রিফ নেন। কার কী কাজ হবে তা বণ্টন করে দেয়া হয়। পুরো বিষয়টি খুবই গোপনীয়তা এবং সতকর্তার সঙ্গে করা হয়ে থাকে।

এরপর ফ্লাইট আসার আগেই প্যাসেঞ্জার লিস্ট সংগ্রহ করা হয় সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স থেকে। অনেক সময় সেটার যদিও দরকার পড়ে না, তবুও প্যাসেঞ্জার লিস্ট এবং কার্গো ম্যানিফেস্ট এয়ারপোর্টে কর্তব্যরত বিভিন্ন দপ্তর এবং এজেন্সিগুলো সংগ্রহ করে থাকে কাজের সুবিধের জন্য।

ধরা যাক, এরপর একজন যাত্রী ধরা পড়ল অবৈধ পণ্যসহ। এই অবৈধ পণ্য শুল্ক গোয়েন্দার অফিসারগণ অন্যান্য সকল এজেন্সির সম্মুখে বের করেন, গোনাগুনি বা ওজন করেন, আটক মামলা করেন, সদর দপ্তর ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জানানো হয়, তারা আসেন, টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে কথা বলেন, প্রশ্নের জবাব দেন, তারপর স্বর্ণ হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমার জন্য পাঠান, অন্য পণ্য হলে শুল্ক-গুদামে জমা দেন, যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করে বিমানবন্দর থানায় যাত্রীকে সোপর্দ করেন।

এই কাহিনিটির সঙ্গে আমরা প্রায় সবাই কমবেশি পরিচিত। শুধু বিমানবন্দরে স্বর্ণ বা পাখি বা কচ্ছপ আটক এই গোয়েন্দা অধিদপ্তরের কাজ নয়, এটি বিশাল কাজের একটি অংশমাত্র। দেশের সকল সমুদ্র ও স্থল বন্দরগুলোতে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার পণ্য আমদানি হয়। এখানে ঘোষিত পণ্য আমদানি হচ্ছে কি না, বা

ঘোষিত পণ্যের আড়ালে অন্য কোনো পণ্য আমদানি করা হয়েছে কি না, যে সমস্ত ডকুমেন্ট পণ্য খালাসের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া হয়েছে সে সমস্ত ডকুমেন্ট সঠিক কি না, পণ্যের পরিমাণ, মূল্য, এইচ এস কোড, উৎসদেশ, বাহন সঠিক আছে কি না গোপন সংবাদদাতা লাগিয়ে অথবা ম্যানিফেস্ট পরীক্ষা করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অফিসারদের তৃতীয় নয়নে পরীক্ষা করতে হয়। কাস্টমস ট্যারিফ বইটি নিয়ে অনুশীলন করলে খুব সহজেই বের করে ফেলা সম্ভব কী ঘোষণা দিয়ে কী পণ্য আনা হচ্ছে। এই বিশাল কাজটি তাদের প্রতিনিয়তই করতে হয়। সদর দপ্তর বা আঞ্চলিক অফিসগুলো সংবাদদাতাদের সংবাদ বিশ্লেষণ করে শুল্ক ফাঁকি হতে পারে বিষয়টি নিশ্চিত হলেই মাঠ পর্যায়ের অফিসারদের সেভাবে নির্দেশনা পৌঁছে দেন।

ধরা যাক, এখানেও কোনো একটি কনটেইনারে অবৈধভাবে আনীত পণ্য পাওয়া গেল। সেখানে তখন খালাস কার্যক্রমের অগ্রগতি বিবেচনায় রেখে আটক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বা রিপোর্ট লিখে কাস্টম হাউস কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়ে থাকে। শুল্ক ফাঁকির সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রিপোর্টে বা মামলায় উল্লেখ থাকে। ফাঁকির অংক বড় হলে অনেক সময় থানায়ও মামলা করা হয়।

এছাড়া দেশের ভেতরে কোথাও, কোনো বাড়ি, অফিস, গুদাম বা ফ্যাক্টরিতে অবৈধ পণ্যের মজুদের তথ্য গোয়েন্দা অধিদপ্তরের নজরে এলে সেখানেও অভিযান পরিচালনা করে পণ্য ও পণ্যের মালিককে আটক করা হয়। আটককৃত পণ্য শুল্ক গুদামে এবং আটক মালিককে থানায় হস্তান্তর করা হয় মামলা দিয়ে।
এই পর্যন্ত খবরাখবরগুলো পত্রপত্রিকা এবং অনেক সময় টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আসে। অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খুশি হয়। এনবিআর চেয়ারম্যান ফোন করে সবাইকে ধন্যবাদ জানান। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। অফিসারগণ পরবর্তী কোনো ফ্লাইট বা কনটেইনার বা গুদামের জন্য খবর সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গোপন সংবাদদাতাদের হাতে কিছু গুঁজে দিয়ে নেমে পড়তে হয় নতুন অভিযানে।

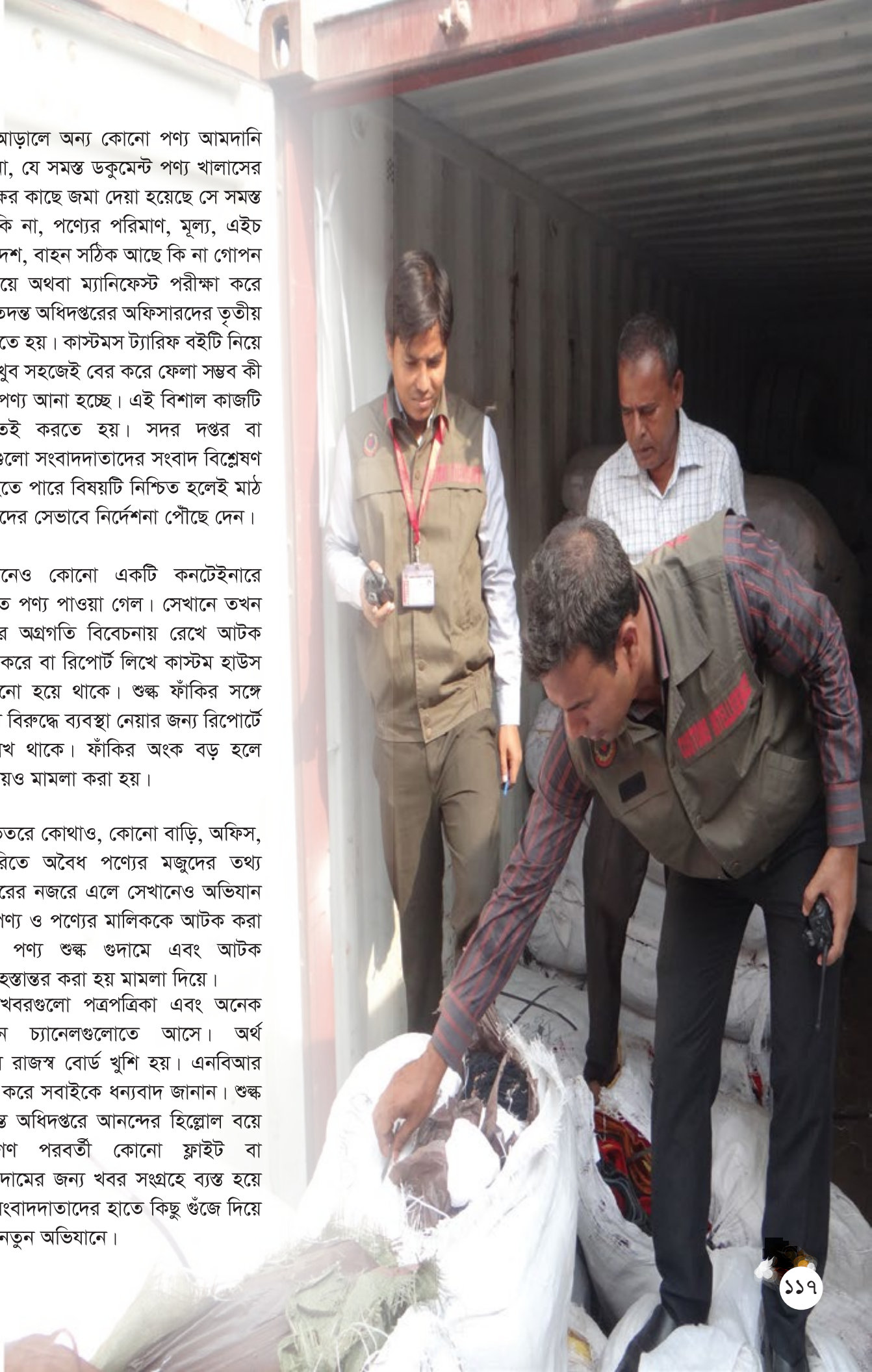

ঘটনাগুলো যদি এখানে এভাবেই শেষ হয়ে যেতো আমার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু আমি জানি এর শেষ এখানেই নয়। যে কাজগুলো মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে উদঘাটন বা আটক করে সরকারি রাজস্ব সুরক্ষা করা হয়েছে, তা কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। থানায় মামলা করে একটি বীজ পুঁতে দেয়া হয়েছে সবার সামনেই, সেই বীজটি থেকে চারা গজালো কি না, নাকি পরিচর্যা বা ফলোআপের অভাবে সেটি মাটির নিচেই চাপা পড়ে আছে, সেটি দেখার কাজ বাকি থেকে গেছে। সেই পরিচর্যার কাজটি এক দিনের বা এক বছরের নয়, অনেক সময় তা কয়েক বছর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়, যুগ পার হয়ে যায়, পরিচর্যার অভাব থাকলে সেটি গোয়েন্দাদের অগোচরে কোথায় গিয়ে যে ঠেকে তা বোধ করি চিন্তার বিস্তারকে শুধু বাড়িয়েই দেবে। পরিচর্যা বা দেখভাল করা হয় নি বলেই আটক ব্যক্তি কোর্ট-কাচারি করে জামিন নিয়ে চলে গেছে কি না তা আর জানা হয় নি।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও দুবার মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। এই ক্ষণকালে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল দপ্তরটির। এখন যে কারণে প্রচুর স্বর্ণ বাংলাদেশে ঢুকছে তখন সেরকম কোনো কারণ না ঘটলেও ২০০৪ সালে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বর্ণ আটক করেছিলাম। কমলাপুর আইসিডি দিয়ে মিথ্যা ঘোষণায় পৌণে পাঁচ কোটি টাকার অবৈধ কাপড় আটকের ঘটনাটি অনেকের মনে থাকতে পারে। এছাড়া, অবৈধ পর্দার কাপড় এনে ছাড় করাতে না পেরে প্রায় চারশত কনটেইনার ঐ সময়ে আইসিডিতে আটকা পড়েছিল। আমি সাড়ে চার মাস পরে ওই অধিদপ্তর থেকে বদলি হয়ে গেলে কীভাবে ঐসব অবৈধ পণ্য আইনানুগ খালাস হয়েছিলো তা আর জানার চেষ্টা করিনি। এসব কাজে সততার দরকার সবচেয়ে বেশি। কাস্টমস বা কাস্টমস গোয়েন্দাদের প্রতি মুহূর্তে সততার পরিচয় দিতে হয়।

দ্বিতীয় দফা শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে বদলি হয়ে এলে ঐ পৌণে পাঁচ কোটি টাকার অবৈধ কাপড় আমদানির নথিটা উল্টে দেখি। কী ঘটেছিল ঐ আটকের জানার আকাঙ্খা থেকেই নথিটা দেখা। কিন্তু না ঢাকা কাস্টম হাউস না আইসিডি কেউ ওই পণ্যের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তার কোনো কাগজপত্র দিয়ে আমাকে সহায়তা করতে পারেননি। অথচ কাপড় আইসিডি থেকে খালাস হয়ে গেছে এই তথ্য বন্দরের খাতাপত্রে থাকলেও তারাও শুল্ক বিভাগের কোনো বিচারাদেশ দেখাতে পারেনি।

২০১০ সালে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে আমার দ্বিতীয় দফায় একটি বড় আটক করেছিল গোয়েন্দা অফিসাররা। তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে প্রায় ৮৫ কেজি এফিড্রিন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ দিয়ে মালয়েশিয়া পাচার হয়ে যাচ্ছিল। গোপন সংবাদটি আমি নেপাল থেকে পেয়েছিলাম। আমি যখন ফোন কলটি পাই তখন আমার সামনে উপস্থিত ছিলেন একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা। তথ্যটুকু নোট করে ফোনটি কেটে দিলে ওই অফিসার তাকে এই কাজের দায়িত্ব দেয়ার অনুরোধ করলে আমি না করিনি। অফিসার তার লোকজন নিয়ে সেদিন রাতে কার্গো ভিলেজে অবস্থান নিলেও পাচারের কাজটি সেদিন হয়নি। নেপাল থেকে রাতে আমাকে জানানো হয়েছিল কার্গোর প্লেনে জায়গা না পাওয়ায় সেটি সেদিন যেতে পারে নি, তবে পরদিন যাবে। পরদিন গোয়েন্দারা আবার জাল পাতে। তৈরি পোশাক ঘোষণা দিয়ে স্ক্যানিং সমাপ্ত হয়ে গেলে কার্টনগুলো যখন প্লেনে ওঠার জন্য প্রস্তুত, তখনই ওত পেতে থাকা অফিসাররা সেগুলো ঘিরে ফেলে। একটি কার্টনে পাওয়া যায় ৮৫ কেজি এফিড্রিন, যার ওষুধের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার থাকলেও এটি এক ধরনের মাদক, ইয়াবা জাতীয় পণ্য তৈরিতে এগুলোর ব্যবহার আছে। পণ্য আটক করে থানায় মামলা করা হয়, তদন্তের দায়িত্ব পায় গোয়েন্দা পুলিশ। মামলার নথিতে রপ্তানিকারক, ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট প্রমুখের নাম ঠিকানা আমরা দিয়েছিলাম। পুলিশ সেসব জায়গায় রেইড দেয়ার আগেই সবাই সটকে পড়ে, কেউ আটক হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ে না। এই মালামাল পাচারের সঙ্গে কারা জড়িত এ বিষয়ে নেপালের সংবাদদাতা আমাকে দুটি নাম বলেছিলেন। এ ঘটনার প্রায় বছর খানেক পর, তখন আমি গোয়েন্দা অধিদপ্তর থেকে বদলি হয়ে অন্যত্র কর্মরত, একদিন পত্রিকায় ডিবি'র একটি খবর দেখি। খবরে দু-তিনজনকে ওই মামলার সূত্রে আটক করা হয়েছে বলে জানানো হয়। আমি নামগুলো পড়তে গিয়ে আমার সংবাদদাতার দেয়া নামগুলোর একটির সঙ্গে মিল পাই। বুঝি তদন্ত ঠিক মতোই এগোচ্ছে। কিন্তু আজ প্রায় পাঁচ বছর পর জানতে ইচ্ছে করছে ওই মামলার সর্বশেষ অবস্থা কী?

এত কথার অবতারণা করলাম মাত্র একটি কথা বলার জন্য। আর তা হচ্ছে ফলোআপ বা অনুসরণ। আটক পরবর্তী কাজগুলো আর শুল্ক গোয়েন্দাদের হাতে থাকে না, মামলা হয়ে গেলে তার তদন্ত বা অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট থানা বা অন্য পুলিশ দপ্তরে স্থানান্তর হয়ে যায়। তাই, প্রতিটি আটকের জন্য চাই নিবিড় ফলোআপ, যা শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে আমি মনে করি।

কেউ আটক হলে তার কাছ থেকে পুলিশ বিভাগ কী কী তথ্য পেয়েছে তা সংগ্রহ করা যেমন ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনি আইন অনুযায়ী আদালত বা হাইকোর্টের সরকারি কৌসুলিকে যথাসম্ভব তথ্য দিয়ে তার জামিন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাও অন্যতম কাজ। এক্ষেত্রে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির তাগিদও দেয়া যেতে পারে। কেউ আটক না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ বিভাগ যেন আরো মনোযোগ দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে সে বিষয়ে তাদের বারবার অনুরোধ করা, প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার কাজটিও করা যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মামলা নিষ্পত্তি না হলে আটককৃত পণ্য বিক্রয় বা ধ্বংস করা যায় না, বিক্রয় না হলে আটককারী কর্মকর্তারাও তাদের পুরস্কার পান না। গুদামে থাকতে থাকতে অনেক সময় পণ্য তার গুনাগুণও হারিয়ে ফেলে।

পরিশেষে বলতে চাই, এখন অনেক যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে পদস্থ আছেন। আমি মনে করি এখনই কেস টু কেস ফলোআপের কাজটি শুরু করা উচিত। এই কাজটি শুরু করতে পারলে এই অধিদপ্তরের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন করা যাবে। মনে রাখতে হবে, আটক এবং ফলোআপ বা অনুসরণ চলতে থাকবে সমান্তরাল গতিতে। তবেই পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

- লেখক **শাহাবুদ্দীন নাগরী**, অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ইনফো-১১

মো. জামাল হোসেন

রাত দেড়টা। এমনিতে কৃষ্ণপক্ষের রাত। কিছুক্ষণ আগে বিদ্যুৎও চলে গেছে। নিকষ কালো আঁধার সবকিছু গ্রাস করেছে।

জাহিদ ড্রয়ার থেকে মোমবাতি বের করে লাইটার দিয়ে মোমবাতি জ্বালালো। এতে অন্ধকার কিছুটা কাটল বটে কিন্তু পরিবেশটা হয়ে উঠল গা ছমছমে– ভৌতিক।

এ মুহূর্তে সুপরিসর একটি কক্ষে জাহিদ একা। তার সামনে একটি কফিন। কফিনটি ঘণ্টা দেড়েক আগে আনা হয়েছে। কফিনের ভিতর একটি লাশ। লাশটি একটি যুবতী মেয়ের। মেয়েটি দু'দিন আগে ক্যান্সারে মারা গেছে। কফিনটি আগর-চন্দনের মিশ্রিত একটা ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। এ ধরনের ঘ্রাণ জাহিদের ভীষণ অপছন্দ।

এত সুন্দর কফিন জাহিদ ইতোপূর্বে দেখেনি। কি একটা ইংরেজি মুভিতে পিরামিডের ভিতরে রাখা এক ফারাও রাজার কফিন দেখেছিল। এ কফিনটিও জাহিদের কাছে তেমন মনে হল। জাহিদ কফিনটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ কফিনের ডালাটা খুলে গেল। জাহিদ দেখল কফিনের ভিতর একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে শুয়ে আছে। একপর্যায়ে মেয়েটি উঠে বসল। জাহিদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল– ছাড়, কি দেখেন কফিন না আমারে। আমি সুন্দর না?

জাহিদ প্রতিত্তোরে বলল– হ্যা, তুমি খুব সুন্দর, ঠিক সিমলা মতো, সিমলা আমার স্ত্রী। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

জহিদের কথার সূত্র ধরে মেয়েটি আবার বলল– ছাড়, এরা আমারে জোর কইরা ক্যান্সার রোগী বানাইছে। আসলে আমি ক্যান্সার রোগী না। আমি মধুখালীর ময়না– গেছিলাম দুবাই কাজ করতে। যে শেখের বাসায় ছিলাম সে ছিল একটা মস্ত লম্পট। এক রাইতে ..... । তারপর আর বাঁচার অর্থ খুইজ্যা পাইলাম না। ভোর রাইতে আত্মঘাতী হইলাম। স্থান হইল একটা বেওয়রিশ লাশ ব্যবস্থাপনা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। সেইখান থাইক্যা ক্যান্সার রোগী হইয়া এই কফিনে। ছাড় গেছি জিন্দা, আইলাম লাশ হইয়া। ভাল কথা ছাড়, আপনে দেখতে একেবারে সিনামার নায়কের লাহান। ময়না এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে গলা ছেড়ে হেসে উঠল। তার সে হাসি বড় তীক্ষ্ণ, বড় অশরীরী।

হঠাৎ জাহিদের গা একটু ছমছম করে উঠল। ভয় ও আতঙ্কে তার শরীরের লোম সজারুর কাটার মত দাঁড়িয়ে গেল। এ সময় কে যেন বলে উঠল– স্যার, চা খাইবেন, চা দিমু?
জাহিদ সম্বিৎ ফিরে পেল। তার আতংকিত ভাব কিছুটা প্রশমিত হল। সে বুঝতে পারল পরিবেশগত কারণে সে একটু হ্যালুসিনেশনে ভুগতে শুরু করেছিল। স্বাভাবিকতায় ফেরার পর জাহিদ বলল– আরে সিরাজ তুমি? তুমি যাওনি?
সিরাজ– জী না ছাড়, আমি যাই নাই। আপনারে একা রাইখা যাইতে মন সায় দিল না।
জাহিদ– বেশ করেছ। দাও, চা দাও, চায়ের খুব তেষ্টা পেয়েছে।

সিরাজের উপস্থিতি জাহিদকে খুশী করল। এতক্ষণ জাহিদ ভেবেছিল সে একা। একটা লাশ শুদ্ধো কফিন সামনে নিয়ে বসে থাকা খুব স্বস্তিকর না। কিন্তু জাহিদ বসে আছে– নিতান্তই কর্তব্যের খাতিরে। সম্ভবত সারা রাত থাকতে হবে। কফিনটা খুলতে হবে। লোক পাঠানো হয়েছে বিশেষ কাজে দক্ষ একজনকে আনতে। রাত আড়াইটা বেজে গেলেও তার দেখা নাই।
বসের আদেশ পেয়ে সিরাজ ফ্লাক্স থেকে কাপে চা ঢালল। চা বেশ গরম। কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়া ওঠা চা জাহিদের খুব পছন্দ। সিরাজ জাহিদের সামনে চায়ের কাপ রাখল। জাহিদ চায়ে চুমুক দিলো। গরম চা তার সকল অবসাদ শুষে নিল। সে রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো। তার মনের পর্দায় গত তিন দিনের ঘটনাগুলো ভেসে উঠল।
জাহিদের মনে পড়ল সে টয়লেটে প্রবেশ করেছিল।

অফিস ত্যাগের সময় হলে জাহিদ ব্রিফকেসটা গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করে। বছর দু'য়েক যাবত এটা তার প্রতিদিনের অভ্যেস। সে অভ্যাস মতই সে টয়লেটে গিয়েছিল।

জাহিদের অফিস মগবাজারে– বাসা উত্তরায়। অফিস থেকে বাসায় যেতে সময় লাগার কথা বিশ মিনিট। সন্ধ্যের এ সময়টায় রাস্তায় যানজট চরম আকার ধারণ করে। মগবাজার ক্রসিং, মহাখালি, বনানীর মত পয়েন্টগুলোতে গাড়ি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। ইদানীং উত্তরাও এই ক্লাবে যোগ দিয়েছে। ফলে বিশ মিনিটের পথ পাড়ি দিতে লাগে দু'ঘণ্টা। আগে হরতাল-ধর্মঘটে রাস্তা ফাঁকা থাকতো। এখন হয়েছে উল্টো। এখন হরতালে যানজট আরো বেশি হয়। যানজটে প্রচুর সময় নষ্ট হয়– সময়ের এ অপচয় জাহিদকে ভীষণ পীড়িত করে।

বছর তিনেক হল জাহিদের রক্তে চিনির আধিক্য ঘটেছে। ফলস্বরূপ ঘণ্টা দেড়েকের ইন্টারভেলে সে তীব্র পেশাবের চাপ অনুভব করে। এ জন্যই অফিস ত্যাগ করার আগে জাহিদ জল ত্যাগের কাজটাও সেরে ফেলে। বলাতো যায় না, জলের চাপ আর যানজটের চাপ এক হয়ে কখন কী বিপত্তি ঘটায়।

সিপাই মুর্তজা তার বসের এ অভ্যেসের কথা ভাল করে জানে। ব্রিফকেস তার হাতে দিয়ে বস টয়লেটে গেলে সে বুঝতে পারে, "আজকের মত অফিস শেষ"।

আজ মুর্তজা জাহিদের টয়লেটে যাবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। তার একমাত্র নাতনি অরনির আজ প্রথম জন্মদিন। সন্ধ্যের আগে তার বাসায় যাওয়া চাই-ই। অর্ডার দেওয়া জন্মদিনের কেক তাকেই বাসায় নিয়ে যেতে হবে। কেক কাটা হবে রাত সাড়ে আটটায়। তাই পাঁচটা থেকেই সে উশ-খুশ করছিল– বসকে কিছু বলতে পারছিল না। তাই সাতটার কিছুটা আগে বসকে টয়লেটে যেতে দেখে মুর্তজার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে মনে মনে হিসেব করে দেখল– এখন বের হতে পারলেও সময়মত বাসায় পৌঁছা যাবে!

জাহিদ টয়লেট থেকে ফিরে হোল্ডারে রাখা জ্যাকেট গায়ে চাপাল, জুতায় পা গলাল। এরপর টেবিলে রাখা 'গ্যালাক্সি নোট ফোর' এর দিকে হাত বাড়াল। ঠিক এ সময়ে ফোনটি ভাইব্রেট করল।
জাহিদের ফোনে তার স্ত্রী সিমলার স্ব-কণ্ঠ আবৃত্তি (তুমি আছো আমার/ কাজল চোখের নীড়ে/ তাইতো দেখি তোমায়/ বারেক ফিরে ফিরে) রিংটোনটি সেট করা আছে। বহু বছর আগে টিএসসিতে সিমলার এ আবৃত্তি শুনেই জাহিদ তার প্রেমে পড়ে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে প্রেম পরিণয়ে রূপ নেয়। কবিতাটা জাহিদের অসম্ভব প্রিয়। তারপরও অফিসে থাকলে জাহিদ মোবাইল ফোনটা ভাইব্রেশন মুডে রাখে। ইদানীং ফোনের রিংটোনের শব্দ তার কাছে অসহ্য লাগে। সম্ভব হলে জাহিদ ফোনটা মিউট করে রাখতো কিন্তু তার জব-নেচার সেটা পারমিট করে না। দাপ্তরিক প্রয়োজনেই তাকে ফোনটা খোলা রাখতে হয় এবং প্রতিটি চেনা-অচেনা কল রিসিভ করতে হয়।

জাহিদ কিছুটা বিরক্তি নিয়েই ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকাল। স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে 'ইনফো-১১' শব্দটি। একে শব্দ না বলে কোড বলাই শ্রেয়। কোডটা দেখে মুহূর্তেই জাহিদের অবয়ব থেকে বিরক্তি ভাব উধাও হয়ে গেল– সেখানে ফিরে এল সিরিয়াস মুড। দ্রুত সবুজ বাটন টিপে জাহিদ ফোনটা রিসিভ করে কানের সাথে ঠেসে ধরল। ফোন কানে নিয়ে জাহিদ পুনরায় রিভলভিং চেয়ারে বসে পড়ল। দরজায় দাঁড়ানো সিপাই মুর্তজাকে জাহিদ ইশারায় বেরিয়ে যেতে বলল।

বসের সিরিয়াস মুড দেখে মুর্তজা প্রমাদ গুনলো। সে বুঝতে পারল, "গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ এসে গেছে– বস এখন অফিস ত্যাগ করবেন না"। তার মন হতাশায় ভরে গেল। একমাত্র নাতনির প্রথম জন্মদিনের উৎসব বলে কথা।

জাহিদ শুল্ক-গোয়েন্দা দপ্তরের মহা-পরিচালক। এ মুহূর্তে যার সাথে জাহিদের ফোনে কথা হচ্ছে সে একজন ইনফরমার অর্থাৎ গোপন সংবাদ সরবরাহকারী। জাহিদ তাঁর নাম-ধাম জানে না। জাহিদের কাছে তার পরিচিতি কোড ইনফো-১১।

ইনফো-১১ প্রায়ই জাহিদকে চোরাচালান সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সরবরাহ করে– ইতোমধ্যে তার দেয়া দু'একটা সংবাদ কাজেও লেগেছে। ইনফো-১১ এর প্রতি জাহিদের মোটামুটি একটা আস্থা ও নির্ভরতা দাঁড়িয়ে গেছে।

বেশ কিছুদিন হল জাহিদরা বড় মাপের কোন স্মাগলিং কেইস পায়নি। এদিকে তাঁর উর্ধ্বতন দপ্তরে নতুন বস এসেছেন। তিনি অত্যন্ত কাজপাগল লোক– কঠিন পারফর্মেন্সে বিশ্বাসী। তাঁর কথা– ফেইলার হ্যাজ নো অপশন। এই সময়ে দু'একটা ভাল ডিটেকশন খুব দরকার। তা না হলে নতুন বসের কাছে 'ফেইস সেভিং' সম্ভব হবে না। এ প্রেক্ষাপটে ইনফো-১১'র ফোনের কারণে জাহিদ সুরঙ্গের অপর দিকে রূপালি আভা দেখতে পেল।

জাহিদ খুব আগ্রহ নিয়ে ইনফো-১১'র সাথে কথা বলল। জাহিদের সাথে ইনফো-১১ এর ফোনালাপ নিম্নরূপ:

ইনফো-১১– ছালাম ছাড় (স্যার)।
জাহিদ– ওয়ালাইকুম, খবর আছে?
ইনফো-১১– জে ছাড় ভাল খবর আছে। দু'এক দিনের মধ্যে বড় মাছ আইব।
জাহিদ– কোথা দিয়ে?
ইনফো-১১– ঢাকা।
জহিদ– কি জিনিস? কারা আনছে? একটু খুলে বলেন।
ইনফো-১১– সোনা, 'আজমত'।

'আজমত' কথাটি শেষ হতে না হতেই ইনফো-১১ ফোনের লাইনটি কেটে দিল। জাহিদ কয়েক মুহূর্ত হ্যালো হ্যালো করল– কোন সাড়া পেল না।

জাহিদ ইনফো-১১'র নম্বরে কল দিল। তাঁর কানে ভেসে এল গ্রামীনফোনের রেকর্ডকৃত নারী কণ্ঠ– ফোনটি বন্ধ আছে, এ মহূর্তে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব না। জাহিদের মেজাজ খুব খারাপ হল। ধুর শালা বলে জাহিদ সজোড়ে ফোনটা টেবিলে ছুড়ে মারল।

ইনফো-১১ এক বিচিত্র চিড়িয়া। কোন সংবাদ ব্যাটা ডিটেল বলে না– সামান্য ইংগিত দিয়ে ফোন অফ করে দেয়। তারপর একেবারে লাপাত্তা। ইনফো-১১ এর এ আচরণ জাহিদের কাছে অদ্ভুত লাগে। জাহিদের অন্য ইনফরমাররা এমন না। তারা যতটা সম্ভব স্থান, কাল, পাত্র উল্লেখ করে সংবাদ দেয়। ফলে জাহিদের পক্ষে কাজের প্ল্যান করা এবং সময় মত চালান ইন্টারভেইন করা সহজ হয়। জাহিদ ভাবল– সম্ভবত ইনফো-১১ কোন সিন্ডিকেটের ভিতরের কর্মচারী। যার জন্য সে অতি মাত্রায় সতর্ক।

জাহিদ বাসায় না ফিরে অফিসে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিল। তবে সিপাই মুর্তজাকে ছুটি দিয়ে দিল। পিয়ন সিরাজের কাছে জাহিদ পূর্বাহ্নেই জেনেছে আজ মুর্তজার নাতনির জন্মদিন। মুর্তজা বসের প্রতি মনে মনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বাসার পথ ধরল। জাহিদের এ মানবিক গুণগুলো খুব প্রখর। এ জন্য নিজ দপ্তরে জাহিদ অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ জনপ্রিয়তা তার কাজে যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

জাহিদ গোপন সংবাদটিকে নানা এঙ্গেল থেকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোন কিনারা করতে পারল না। "'ঢাকা', 'আজমত' এ সামান্য তথ্য দিয়ে কোন কিছু কিনারা কীভাবে সম্ভব?" জাহিদ ভাবল। জাহিদের কাছে বিষয়টি বঙ্গোপসাগরে সুঁই খোঁজার মত মনে হতে লাগল। কিন্তু সে হাল ছাড়ল না। তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল 'ঢাকা' আর 'আজমত' শব্দ দু'টো।

জাহিদ একটা বিষয় বুঝতে পারল– ঢাকা মানে ঢাকা এয়ারপোর্ট। অতীত রেকর্ড অনুযায়ী স্মাগলাররা এ পোর্টকেই ব্যবহার করেছে বেশি। কিন্তু আজমত লোকটা কে? আগে কোন ইনফর্মার এ নাম উল্লেখ করেছে এমনটি জাহিদ স্মরণ করতে পারলনা।

এ পর্যায়ে জাহিদ ভাবল– আমি একা কেন ভেবে মরছি। এক মাথায় তো সব সমাধান আসবে না। এ ভাবনা থেকে জাহিদ তার বিশ্বস্ত অফিসারদের সাথে বিষয়টা শেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিল। ইতোমধ্যে জাহিদ তার দপ্তরে একটা টিম স্পিরিট বিল্ড আপ করতে পেরেছে।

জাহিদ ওয়াকিটকিতে বিশ্বস্ত ও স্মার্ট দুজন অফিসারকে দ্রুত তার কাছে রিপোর্ট করতে বলল। তারা দু'জনই ঢাকা এয়ারপোর্টে পদস্থ। ডিটেকশন ও সিজিং কাজে এরা এরই মধ্যে নিজেদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। তাদের এক জনের নাম সহকারী পরিচালক– যারীন আমান, অপর জন্য আই.ও রাহাত সুমন।

ঘণ্টা খানেকের মাথায় কর্মকর্তা দু'জন জাহিদের দপ্তরে হাজির হল। জাহিদ কর্মকর্তাদ্বয়কে গোপন সংবাদ প্রাপ্তির বিষয়টা জানাল এবং তাদের মন্তব্য জানতে চাইল।

বসের অনুরোধে যারীন বলল– স্যার আমি আপনার সাথে একমত যে, ইনফো-১১'র তথ্য অপ্রতুল। কিন্তু অতীতে তার দেয়া তথ্য সঠিক হয়েছে। আমরা কেইসও পেয়েছি। গত সেপ্টেম্বর মাসে আটককৃত ঊনত্রিশ কেজি স্বর্ণের চালানের ইনফরমেশনটা কিন্তু ইনফো-১১ এর কাছ থেকে পাওয়া।

যারীনের কথার সূত্র ধরে রাহাত বলল– স্যার, আপনার প্রচেষ্টায় আমাদের এখন স্মাগলিং ইনফরমেশন সংক্রান্ত সমৃদ্ধ একটা ডাটা বেইস আছে। সেখান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারি।

জাহিদ– দ্যাটস রাইট। বোথ অব ইউ ইনভলব ইউরসেলফস্ টু কালেক্ট কুইক ইনফরমেশন। আমাদের ডেটা বেইস ফাইল ঘেটে দেখ কোন সূত্র মিলে কি না। বাট বাই দিস টাইম, তোমরা স্টেশনে গিয়ে সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখ। এয়ারপোর্টে কর্তব্যরত আমাদের সকল আই.ও'কে এলার্ট কর– কোন কিছুই যেন তাদের চোখ এড়িয়ে না যায়। আমি নিজে রিজিওন্যাল ইনটেলিজেন্স লিয়াঁজো অফিসে (রাইলো) যোগাযোগ করে দেখি বিশেষ কোন তথ্য মিলে কি না।

যারীন ওকে স্যার বলে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসে সে বলল– স্যার আপনি কাল একবার এয়ারপোর্টে এসে ঘুরে যান। আমি রাতে বিগত দশ বছরের ডিটেকশন রেকর্ডগুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নেব– পর্যালোচনা করব স্বর্ণ চোরাচালানের ধরন, রুট ও কৌশলগুলো। হোপ দ্যাট টুমরো ইউ উইল গেট গুড ফিডব্যাক ফ্রম মি।
জাহিদ ওকে বলে যারীনকে বিদায় জানিয়ে পি.এ'কে বলল রাইলো'তে ফোন লাগাতে।

এয়ারপোর্টে যারীনের নাইট শিফট ডিউটি শুরু হলো রাত ন'টায়। রোজকার মত সেনসেটিভ পয়েন্টসগুলোয় একটি চক্কর দিয়ে এসে সে নিজ অফিস কক্ষে প্রবেশ করল। দু'একটি জরুরী ফাইল ডিসপোজ করে যারীন বসে পড়ল ডেস্কটপে– শুরু করল ব্রাউজিং।

যারীন শুল্ক গোয়েন্দার নিজস্ব ডেটা বেইস, বিভিন্ন সিকিউরিটি এজেন্সির ওয়েব পেজ ইত্যাদি ঘাটল– প্রয়োজনমত কিছু প্রিন্ট আউট নিল। এগুলো পর্যালোচনা করে সে দেখল রুট হিসেবে প্রায় শতকরা নিরানব্বই ভাগ স্মাগলার ঢাকা এয়ারপোর্টকেই ব্যবহার করেছে। অধিকাংশ চালানের বাহন ছিল বাংলাদেশ বিমান। কোন ক্ষেত্রেই মূল ব্যক্তি ধরা পড়েনি। সর্ব ক্ষেত্রেই চালানগুলো ধরার পেছনে গোপন সংবাদ ছিল। অধিকাংশ কেইসে গতানুগতিকতার বাইরে তেমনি কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বন

করেনি পাচারকারীরা। বিমানের সিটের নিচ বা বিমানের টয়লেট ছিল চালানগুলোর গুপ্ত ধারক। দু'টি ঘটনায় আটক সন্দেহভাজনের পেট থেকে বেরিয়েছে স্বর্ণের বার। প্রাপ্ত এ সব তথ্যের মধ্যে যারীন কোন বৈচিত্র খুঁজে পেল না। সে বুঝল, এ তথ্য দ্বারা সে বসকে কনভিন্স করতে পারবে না।

যারীন ব্রাউজিং বাদ দিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। হঠাৎ তার মনে এল ইনফো-১১ এর দেয়া একটা নাম আজমত। যারীন পুনরায় কম্পিউটারের মাউসে হাত দিল, প্রবেশ করল এয়ারপোর্টে কাজ করে এমন লোকদের ডাটা নিয়ে। মিনিট পনেরোর প্রচেষ্টায় সে পোর্টে কাজ করে বৈধ-অবৈধ এমন চারজন 'আজমত' এর তথ্য পেল। এরা হল– আজমত ফরাজী, হাজী আজমত, আজমত আলী ও আজমত উল্লাহ পাটোয়ারী।

যারীন দেখতে পেল যে, আজমত ফরাজী গত এক বছর সতের বার মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করেছে। রেকর্ড বলছে সে একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু কি ব্যবসা সেটি সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া গেল না। কেন সে এতবার মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছে এ বিষয়টি যারীনের নিকট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া এ ব্যক্তির নামের পার্শে রেডস্টার আছে যার মানে ব্যক্তির গতিবিধি নজরদারিতে রাখা সমীচীন এবং মজার ব্যাপার হল গত পরশুই সে দুবাই গিয়েছে।

হাজী আজমত ফ্রেইটে কাজ করে। সে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। ঢাকায় অবস্থিত এ দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি গরিব ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য দুবাইয়ের একটি হাসপাতালে পাঠায়। প্রেরিত কোন রোগী মৃত্যুবরণ করলে প্রতিষ্ঠানটি নিজ খরচে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনে। হাজী আজমত তার প্রতিষ্ঠানের হয়ে ফেরত আসা লাশ খালাস করে এবং রোগীর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। গত তিন বছর সে এরূপ নয়টি লাশ খালাস করেছে। হাজী আজমতের রেকর্ড ফাইলে কোন বিরূপ মন্তব্য নেই।

আজমত আলী নামক ব্যক্তি সম্পর্কে পাওয়া গেল সন্দেহ করার মত যথেষ্ট তথ্য। বছর পাঁচেক আগে সে স্বর্ণের একটি বড় চালান পাচারের সাথে জড়িত ছিল। তখন শুল্ক গোয়েন্দা তাকে আটক করে থানায় দিয়েছিল। পরবর্তীতে থানা থেকে কোর্ট হয়ে সে জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। এখনো সে এ পেশায় আছে তবে ছদ্মনামে। ছদ্মনাম সম্পর্কে কোন তথ্য ওয়েব পেজে পাওয়া গেল না।

চতুর্থ জন অর্থাৎ আজমত উল্লাহ পাটোয়ারী একজন পুলিশ কর্মকর্তা। সে কিছুদিন হল বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন থেকে প্রশাসনিক কারণে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। ডাটা বেইসে এর বেশি কিছু তথ্য তার সম্পর্কে নেই। তার নামের পার্শ্বে কোন মন্তব্য বা তারকা চিহ্নও নেই।

মজার ব্যাপার হল 'আজমত আলী' ছাড়া বাকি তিন 'আজমত' এর ছবিও ডাটা বেইসে পাওয়া গেল। এবার যারীন সন্তুষ্ট হল। বসকে দেবার মত প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে তার ঠোটে হাসির রেখা দেখা গেল।
পরদিন যারীন জাহিদের কাছে চার 'আজমত' এর তথ্য তুলে ধরল। জাহিদ, যারীন ও রাহাত সুমন এদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তগুলো খুটিয়ে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করল। তারা পুলিশ আজমত ও হাজী আজমতকে সন্দেহ তালিকার বাহিরে রাখল। তাদের সন্দেহের তালিকার এক নম্বরে থাকল মধ্যপ্রাচ্যে ঘন ঘন যাতায়াতকারী আজমত ফরাজী। এর কারণ হল রাইলোর সাথে যোগাযোগ করে জাহিদ একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে, বড় এ চালানটি আসবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে– আগামীকাল রাত এগারটায় এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি বড় বিমানে। এছাড়া এ সময়ে আজমত ফরাজীও দুবাইতে অবস্থান করছে।
প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনার পর জাহিদরা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে যে যার দপ্তরে চলে গেল।

পরদিন রাত এগারটা। এমিরেটসের ফ্লাইট নং- ইকে-৩০৩ ঢাকা এয়ারপোর্টের রানওয়ে স্পর্শ করল। বোর্ডিং ব্রিজে দাঁড়ানো রাহাত সুমন সে তথ্য এই মাত্র ওয়াকিটকিতে জাহিদকে জানাল। জাহিদ এয়ারপোর্টের সকল আই.ও.কে সতর্ক করে দিল।

সে নিজেও ওয়াকিটকি হাতে কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়াল। শুধু সহকারী পরিচালক যারীনকে আশেপাশে দেখা গেল না। তবে জাহিদ নিশ্চিত, যারীন যেখানেই থাক নিজের মত সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

এমিরেটসের সুপরিসর বোয়িং ৭৩৭ ধীরে ধীরে ট্যাক্সিং করে এসে পাঁচ নম্বর বোর্ডিং ব্রিজের সামনে দাঁড়াতেই অপারেটর ব্রিজটিকে ক্রাফ্টের ফ্রন্ট ডোরের সাথে সংযুক্ত করল। রাহাত সুমন মুহূর্তে তার দু'জন সঙ্গীসহ বোর্ডিং ব্রিজের গোড়ায় দাঁড়িয়ে গেল। রাহাতের পকেটে আজমত ফরাজীর ছবি। তার শ্যেন দৃষ্টির সামনে দিয়ে একে একে সকল যাত্রী বোর্ডিং ব্রিজ গলে অ্যারাইভেল লাউঞ্জমুখী হল। কিন্তু এদের মধ্যে রাহাত সুমন আজমত ফরাজীকে দেখল না। রাহাত কিছুটা হতাশ হল। বিষয়টি সে জাহিদকে ট্রান্সমিট করল।

রাহাতের কল শেষ হতেই জাহিদের ওয়াকিটকিতে ভেসে এল যারীনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর– স্যার শীঘ্র ফ্রেইট বিল্ডিংয়ের সামনে আসুন। যারীনের কণ্ঠস্বর শুনে জাহিদ বুঝতে পারল সামথিং রং। সে দ্রুত ফ্রেইট বিল্ডিংয়ের দিকে রওনা হল– তাকে দ্রুত পায়ে অনুসরণ করল শুল্ক গোয়েন্দার চার জন দক্ষ অফিসার।

পাঁচ মিনিটের মাথায় জাহিদ এয়ারপোর্ট সাইডে ফ্রেইট বিল্ডিংয়ের সম্মুখে পৌঁছল। সে দেখল একটি কফিনের সামনে যারীন দাঁড়িয়ে আছে। একজন মাওলানা গোছের লোকের সাথে তার উত্তেজিত বাক্য বিনিময় চলছে। সামনে এগিয়ে জাহিদ দেখল ব্যক্তিটি হাজী আজমত। গতকাল সে এর ফটোগ্রাফ দেখেছে।

আজ রাত এগারটার সামান্য আগে জাহিদ যখন সকল আই.ও'কে সতর্ক হবার চূড়ান্ত নির্দেশ দিচ্ছিল ঠিক তখন যারীনের মোবাইলে একটি কল আসে। কলটি পেয়েই যারীন দৌড়ে ফ্রেইট বিল্ডিংয়ের সামনে পার্কিং এলাকায় চলে আসে। এসেই দেখে পণ্যবাহী টাগে একটি কফিন। হাজী আজমতের নির্দেশে চারজন লোডার সেটিকে টাগ থেকে নামাচ্ছে। নামানোর সময় হঠাৎ কফিনটির একটি পায়া সজোরে কংক্রিটের ফ্লোরে ঘষা খেল। এর ফলে পায়াটার সাদা রং চটকে গিয়ে সোনালী হলুদ রং উঁকি দিল। পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে সহকারী পরিচালক যারীন সে দৃশ্য দেখল। জিনিসটি দেখে সে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল– মুহূর্তে সে সর্তক হয়ে উঠল। সে লোডারদেরকে কফিনটি বিমানবন্দরের কংক্রিট মেঝেতে নামাতে নির্দেশ দিল।

অন্যদিকে হাজী আজমত লোডারদেরকে নির্দেশ দিল কফিনটি দ্রুত বাইরে নিয়ে যেতে। সে এক গাদা কাগজপত্র যারীনের সামনে তুলে ধরে বুঝাতে চাইল, "এটি একটি লাশবাহী কফিন। দু'দিন আগে একজন রোগী ক্যান্সারে মারা গেছে। লাশটি তাড়াতাড়ি খালাস করা জরুরী"। এই বাদানুবাদের মধ্যেই জাহিদ কফিনের সামনে পৌছাল। যারীন সংগোপনে কফিনের হলুদ অংশের দিকে জহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। মুহূর্তেই জাহিদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ তার আই.ও রাহাত সুমনকে কফিনটি সিজ করতে বলল। তার ধারণা হল লাশবাহী কফিনটি পুরোটাই স্বর্ণের তৈরি যার বহিরাঙ্গ সিলভার কোটেড। এ অনুভূতির প্রাবল্যে জহিদ নিজের অজান্তেই বলে উঠল– ইউরেকা। ইনফো-১১ তোমাকে ধন্যবাদ।

যারীন, জাহিদ ও আই.ও'গণ ঘটনার আকস্মিকতায় এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, হাজী আজমতের কথা তারা ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎই জাহিদের মনে পড়ল হাজী আজমতের কথা। সে আজমতের দিকে ঘুরল। কিন্তু আজমতকে দেখতে পেলনা। জাহিদ এদিক ওদিক তাকাল কিন্তু তার দৃষ্টি সীমার কোথায় আজমত নেই। সবাই মিলে চেষ্টা করেও এয়ারপোর্টের ত্রিসীমানায় কোথাও আজমতকে খুঁজে পেল না। হাজী আজমত যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এ ঘটনা থেকে জাহিদ বুঝে ফেলল, আজমত এক ধূর্ত স্বর্ণচোরাচালান চক্রের সদস্য।

রাত বারোটার দিকে জাহিদের আই.ও'রা এই কফিনটিই জাহিদের মগবাজারস্থ অফিস কক্ষে রেখে গেছে। একজন আই.ও রাহাত সুমনকে পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোনীত স্বর্ণপরীক্ষককে নিয়ে আসতে। উদ্দেশ্য কফিনটি আসলে স্বর্ণের তৈরি কি না তা পরীক্ষা করা। স্বর্ণকার থাকে যাত্রাবাড়ী। রাহাত সুমন স্বর্ণকারকে নিয়ে এখনো ফিরেনি। কফিন সামনে নিয়ে জাহিদ সুমন ও স্বর্ণকারের অপেক্ষায় রয়েছে। ইত্যবসরে তার চায়ের কাপ খালি হয়ে গেছে। জাহিদ সিরাজের কাছে আরেক কাপ চা চাইল। কিন্তু সিরাজের কোন সাড়া পেল না। চলে যাওয়া ভয়ের অনুভূতিটা আবার জাহিদের মনে ফিরে আসতে শুরু করল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভয়ের প্রাবল্যে জাহিদ জ্ঞান হারাল।

পরদিন সকল জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় "শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক স্মরণকালের সবচেয়ে বড় স্বর্ণের চালান আটক" শিরোনামে নিম্নরূপ একটি সচিত্র খবর ছাপা হল:

ঢাকার শুল্ক গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মকর্তাগণ গতকাল বিমান বন্দরে আড়াই মণ ওজনের স্বর্ণ নির্মিত একটি কফিন আটক করেছে। এর ভিতর ক্যান্সারে মারা যাওয়া একজন নারীর লাশ পরিবাহিত হচ্ছিল। কফিনটি গতকাল রাত এগার ঘটিকায় এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ইকে-৩০৩ ফ্লাইটে বাহিত হয়ে ঢাকা এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। হাজী আজমত নামের এক ব্যক্তি লাশবাহী এ কফিনটি খালাস প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কফিনটি আটককালে সে কর্মচারীদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যায়। আটক স্বর্ণের কফিনটি বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে আর কফিনে বাহিত নারীর লাশটি আঞ্জুমানে মফিদুলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিতে জাহিদের নতুন বস ও শুল্ক গোয়েন্দার আটককারী কর্মকর্তাদের হাস্যোজ্বল মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছবিটিতে শুল্ক গোয়েন্দা দপ্তরের মহাপরিচালক জনাব জাহিদ খান মিসিং। কারণ, ভোর রাতে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে এ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এখনো তার জ্ঞান ফিরেনি– জ্ঞান কখন ফিরবে কিংবা আদৌ ফিরবে কি না এ্যাপোলোর ডাক্তাররা তা নিশ্চিত করতে পারেনি।

- লেখক **মো. জামাল হোসেন**, কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর

Together Towards Tomorrow
Customs Intelligence

Enforcement of TRIPS Agreement and the Role Customs Can Play in Detections and Seizures of Infringement

Dr. Md Khairuzzaman Mozumder

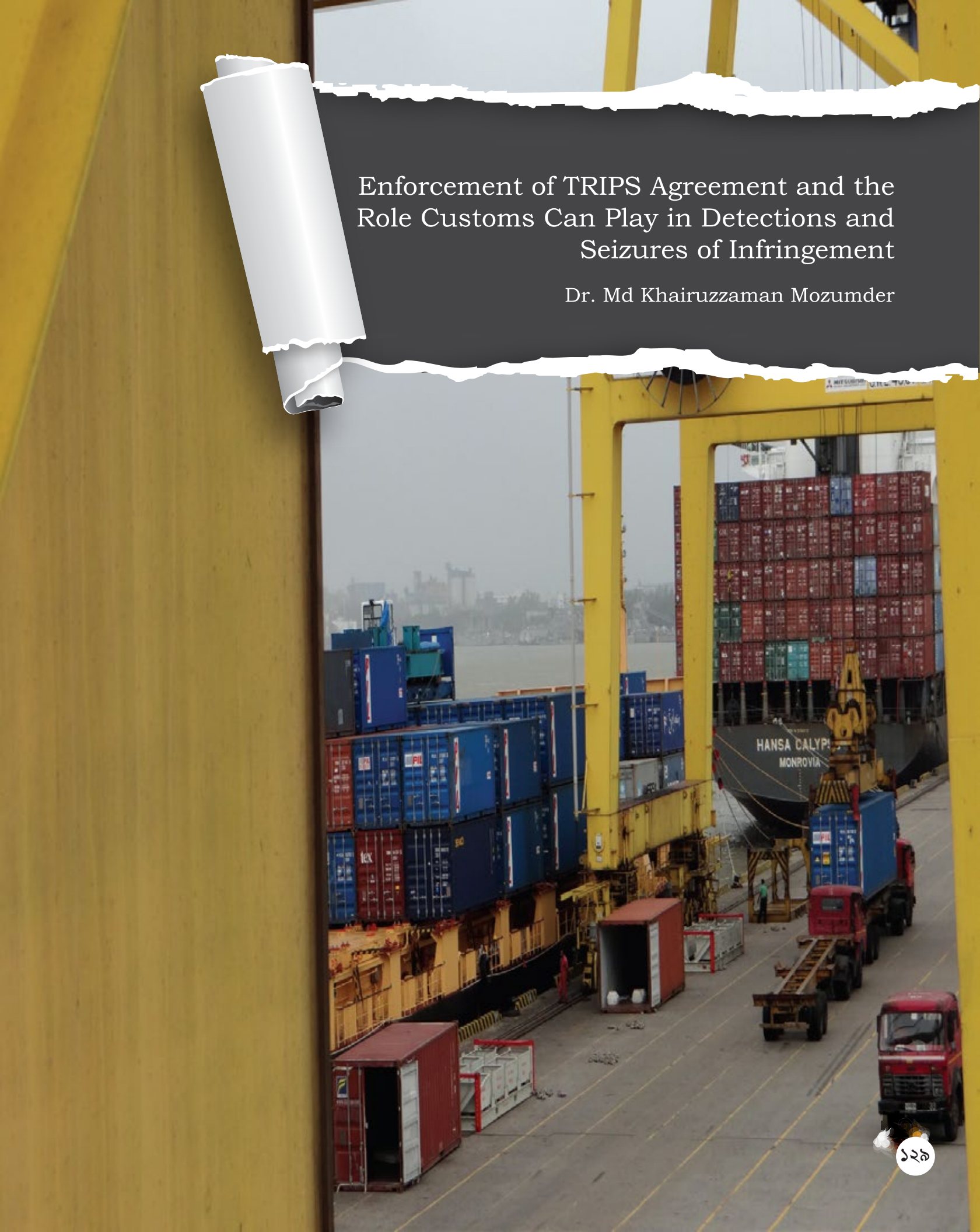

Creators of ideas and knowledge require to have the right to prevent others from using their inventions, designs or other creations, and to use that right to negotiate payment in return for others using them. These rights are frequently referred to as ‘intellectual property rights’ (IPRs), and rules have been devised and institutionalized by the international Community (the World Intellectual Property Organization, for example). These rights take a number of forms. For example, books, paintings, music, paintings etc. come under copyright, inventions can be patented, brand names and product logos can be registered as trademarks.

As ideas and knowledge gradually became an increasingly important part of trade, the international community felt the need to protect those rights internationally, and therefore to introduce the intellectual property rules into the multilateral trading system. As part of the 1986-1994 Uruguay Round of GATT negotiations, the Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS) was concluded. The World Trade Organization’s (WTO’s) TRIPS Agreement establishes minimum levels of protection that each country has to give to the intellectual property of other countries. Types of rights covered under the TRIPS Agreement are copyright, trademarks, patents, geographical indications, industrial designs, layout design of integrated circuits, and undisclosed information including trade secrets.

The TRIPS Agreement covers five broad issues, which are highlighted below:

- How basic principles of the trading system and other international intellectual property agreements should be applied.
- How to give adequate protection to intellectual property rights
- How countries should enforce those rights adequately in their own territories
- How to settle disputes on intellectual property between members of the WTO
- Special transitional arrangements during the period when the new system is being introduced

The purpose of this paper is not to dwell on various nitty-gritties of the TRIPS Agreement, but to focus only on one of those five broad issues; that is, to examine the performance of Bangladesh Customs to enforce the TRIPS-related IPRs adequately. The paper will progress through highlighting the enforcement provisions in TRIPS Agreement, the current state of TRIPS enforcement in Bangladesh (especially in the context of the country enjoying a waiver), Bangladesh Customs' role in the enforcement of TRIPS provisions, the benefits available to the right holders, the current instances of IPR infringement and apparent lack of appropriate initiatives from the rights holders, and finally the possible role of Customs in enhancing detections and seizures of IPR infringement.

Enforcement provisions in TRIPS Agreement

Enacting legal provisions for the protection of the intellectual property rights would not be enough unless there are also provisions that would ensure enforcement of such rights. Therefore, part III of the TRIPS Agreement deals with this particular aspect. Articles 41-61 under Part III of the Agreement elaborates on how enforcement of such rights should be handled. This includes rules for obtaining evidence, civil and administrative procedures and remedies (including fair and equitable procedures, evidence, injunctions, damages and other penalties, right of information etc.), provisional measures, special requirements related to border measures, and criminal procedures.

Section 4 under Chapter III delineates the special requirements to border measures, under which the role of Customs comes to the fore. The TRIPS Agreement emphasizes that governments should make sure that intellectual property rights holders can receive the assistance of Customs authorities to prevent imports of counterfeit and pirated goods. The relevant measures under Section 4 (Articles 51-60) provides for suspension of release by Customs authorities (Article 51), Application (Article 52), Security or equivalent assurance (Article 53), Notice of Suspension (Article 54), Duration of suspension (Article 55), Indemnification of the Importer and of the owner of the goods (Article 56), Right of Inspection and information (Article 57), Ex officio action (Article 58), Remedies (Article 59), and De Minimis imports (Article 60).

It should be noted that Part III of the TRIPS Agreement contains only a general description of mandatory and permissive provisions, but not detailed rules governing the application of such provisions. These detailed rules are left to the countries themselves to devise. Enforcement issues are becoming increasingly important as more countries enact laws which are generally TRIPs consistent.

Current state of TRIPS enforcement, in the context of Bangladesh waiver as LDCs

Although the obligations under TRIPS apply equally to all member states, however developing countries and least development countries (LDCs) were allowed extra time to implement the applicable changes to their national laws. The transition period for developing countries expired in 2005. But the transition period for LDCs to implement TRIPS in general was extended to 2013, and for pharmaceutical patents until 1 January 2016, with the possibility of further extension. However, the general waiver for LDCs did not expire in 2013 and instead got further extended until 01 January 2021, and negotiations will soon be on to extend the period for pharmaceutical patent waiver as well. There is no doubt that it is in the strategic interest of LDCs to make maximum use of this flexibility available in TRIPS. Bangladesh has rightly done so. The flexibility has allowed Bangladesh to become extremely competitive in many industrial sectors, especially in the generic pharmaceutical sector. While enjoying such flexibility, Bangladesh has not been sitting idle, and instead making rules and regulations to make it TRIPScompliant in the long run.

Bangladesh has made significant development in terms of enacting laws and regulations to protect intellectual property. Although laws in some minor areas, such as Utility Model, Plant Varieties and Farmers' Rights Protection, Protection of Traditional Knowledge and Folklore, and Layout Designs (Topographic) of Integrate Circuits etc., are still being drafted, in all the main areas of IPR, there are legislations in place. Therefore, we can conclude that Bangladesh's present IPR protection is well organized, as the current laws mostly cover both with the general IPR issues, and the IPR issues under TRIPS. The laws in place in Bangladesh to deal with both general IPR and the TRIPS IPR issues include-

- The Copyright Act, 2000
- The Patents and Designs Act, 1911
- The Trademarks Act, 2009
- The Customs Act, 1969
- The Seed Act, 1977
- The Consumers' Right Protection Act, 2009
- The Competition Act, 2012
- The Geographical Indication (GI) (Registration and Protection) Act 2013

The protection of IPR issues in Bangladesh is mainly administered by two agencies, namely The Department of Patents, Designs and Trademarks under the Ministry of Industries, and the Copyright Office under the Ministry of Cultural Affairs. However, for the enforcement of such laws, these agencies also rely upon other government agencies. Of them, the Police, the Rapid Action Battalion (RAB), and the Mobile Courts are more useful in relation to enforcement of local IPR issues. These agencies are well coordinated and they demonstrate impressive advancement in deterring infringement of IPR issues and enforcing and protecting them.

But when it comes to the issue of enforcement of TRIPS provisions in relation to international trade, the role of Customs assumes the paramount importance. Clause 109 of the Trademarks Act, 2009 authorizes the Customs officials to call for records and disclose the source of imported goods prohibited under the Customs Act, 1969.

Bangladesh Customs' role in the enforcement of TRIPS Agreement provisions

The National Board of Revenue has taken steps to incorporate the necessary provisions under its Customs legislation. For example, Section 15-17 under Chapter IV (Prohibition and Restriction of Importation and Exportation) of the Customs Act, 1969 provides the enforcement mechanism to deal with the infringement of TRIPS provisions in relation to importation and exportation. Such measures, as provided for under Section 15, are highlighted below:

> *"(d) goods having applied thereto a counterfeit trade mark within the meaning of the Penal Code, 1860, or a false trade description within the meaning of the Trademarks Act, 2009;*
>
> *(e) goods made or produced outside Bangladesh and having applied thereto any name or trade mark, being or purporting to be the name or trade mark of any manufacturer, dealer or trader in Bangladesh unless-*
>
> > *(i) the name or trade mark is, as to every application thereof, accompanied by a definite indication of the goods having been made or produced in a place outside Bangladesh; and*
> >
> > *(ii) the country in which that place is situated is in that indication shown in letters as large and conspicuous as any letter in the name or trade mark, and in the same language and character as the name or trade mark;*
>
> *….*
>
> *(g) goods made or produced outside Bangladesh and intended for sale, and having applied thereto, a design in which copyright exists under the Patents And Designs Act, 1911 and in respect of the class to which the goods belong and any fraudulent or obvious imitation of such design except when the application of such design has been made with the license or written consent of the registered proprietor of the design; and*
>
> *(h) goods or items produced outside Bangladesh involving infringement of Copyright Act, 2000 or infringement of layout design of integrated circuit that are intended for sale or use for commercial purposes within the territory of Bangladesh."*

Section 17 of the Act provides for detention and confiscation of goods imported or exported in breach of Section 15. It says that *"Where any goods are imported into or attempted to be exported out of Bangladesh in violation of the provisions of Section 15 … such goods shall, without prejudice to any other penalty to which the offender may be liable under this Act, or any other law, be liable to be detained and confiscated and shall be disposed of in such a manner as may be prescribed."*

The penalty provisions for any infringement of such IPRs are also incorporated in the Customs Act in Clause 9 under Section 156(1). According to Clause 9, for such violation or infringement in relation to an imported or exported goods, *"such goods shall be liable to confiscation; and any person concerned in the offence shall also be liable to a penalty not exceeding two times the value of the goods".*

Since the mid-1990, Bangladesh Customs has come a long way from its original image of the principal revenue earning agency in the country. It has gradually been able to transform itself over the years, as revenue collection has assumed a secondary importance. By performing duties at the seaports, riverine ports, land ports and airports, Bangladesh Customs today plays a critically important role in facilitating the economic growth in Bangladesh and the country's overall development through controlling the arrival and departure of goods, supervising and monitoring the goods clearance process, and handling passengers and baggage. Its role has also been expanded to that of enforcing myriads of national and international non-Customs legislations in order to deter their infringement in international trade in relation to environmental, animal protection, public health, national security, safety standards, drugs and narcotics, dangerous goods, regulation of foreign currencies, and various other priorities. Enforcement of TRIPS provisions through deterring any infringement of IPR issues in relation to imported or exported goods is one such added responsibility for Bangladesh Customs.

The legal provisions under the Customs Act described above allow Bangladesh Customs to intercept any consignment, whether declared for import or export, which infringes the IPR provisions currently in force in the country and are delineated in Section 15 of the Customs Act.

Benefits available to right holders

As discussed earlier, Section 4 under Chapter III of the TRIPS Agreement provides for the procedures concerning enforcement related to border measures. Such provisions also enable a right holder to lodge an application for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods (Article 51). To do that, the right holders must have valid grounds for suspecting that the importation or exportation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place. The right holders are also entitled to submit applications for suspension of customs release of goods that involve other intellectual property rights (e.g., patents) provided that the requirements of Articles 51 through 60 are satisfied.

Any right holder seeking to suspend the release of goods by customs authorities is "required to provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under the laws of the country of importation, there is prima facie an infringement of the right holder's intellectual property rights and to supply a sufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by the customs authorities" (Article 52).

Another important issue under TRIPS that favours the right holders is that Customs must have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods. Of particular interest to the right holders (e.g. the trademark owners) is a provision that bars the re-exportation of counterfeit trade

mark goods "in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances" (Article 59). This implies that the only expected disposal procedure for any confiscated goods would have to be destruction, and that Customs would not be able to dispose them through auction.

Current instances of IPR infringement and apparent lack of appropriate initiatives from rights holders

In Bangladesh, Customs at the border often makes detections of TRIPS infringement. Instances of such infringement normally relate to importation of goods. Imported products that violate TRIPS provisions are mostly counterfeit trademark goods or pirated copyright goods. There are no database of detections by Customs of IPR infringement. Data gathered from secondary sources suggest two well-known cases, namely Samsonite Corporation vs Moon Light Travels, and Kraft Foods Globe Brands LLC. Vs IBN Sina Food Products Pvt. Ltd. In these cases, the law enforcement agencies (RAB and Police respectively) seized counterfeit Samsonite travel bags and unpatented Ibnsina Oranage Tang products on the basis of applications from the original right holders, namely Samsonite Corporation (for Samsonite Travel Bags) and Kraft Foods Globe Brands LLC. (for Tang Orange products).

In the absence of any reliable database, it is difficult to provide any statistics with regard to the number of detections by Customs or to attempt any estimate as to the major categories of such seizures over the years or the main country of origin of the infringed goods. However, from the personal experience of the writer of this paper during his tenure of office at Chittagong Custom House, it has been witnessed that China usually remains the main country of origin from where goods suspected of infringing an IPR were sent. Other major countries of provenance are Thailand, Hong Kong, Taiwan and United Arab Emirates.

The main categories of products that suffer mostly from such infringement and that Customs officials often detect and seize included-

- Cosmetics and perfumes
- Toiletries
- Bags, wallets and purses
- Clothing
- Watches,
- Pens
- Sunglasses
- Medicines and food supplement
- Cigarettes
- Toys

It needs to be emphasized here that the actual instances of TRIPS infringement would be far higher than the number of detections made by Customs at different ports (sea, land or air). The main factor that contributes to such a dismal performance is the apparent lack of initiatives from the right holders. Even though the TRIPS Agreement provides adequate protection to the right holders, and offers them a number of benefits, as highlighted in the preceding section, with regard to border enforcement measures on IPR infringement, the truth of the matter is that the right holders seldom approach Customs with applications for interception to impending import or export consignments containing counterfeit trademark products or pirated copyright products.

The detections and seizures that Customs normally make, and are highlighted above, are mostly done on its own. Precisely for this reason, it becomes very difficult for Customs to establish such cases of infringement in the absence of the actual right holders to defend Customs, when the alleged offenders take resorts to the courts. It even happens in many cases that Customs finds itself in a position that it is forced to release the seized consignments in the end. In cases where the offense is established, Customs usually dispose them off through destruction.

Role of Customs in enhancing detections and seizures of IPR infringement

Experience suggests that the detections and seizures related to IPR infringements are mostly done by Customs officials posted in the field Customs offices, such as the Custom Houses. Customs Intelligence officials, on the other hand, remain more engaged and busy in detecting cases of smuggling, contraband goods and illegal currency transfer. It is the humble opinion of this author that should Customs intelligence gear up their enhanced focus on this particular aspect; that is, on ensuring the enforcement of TRIPS provisions, the number of detections and seizures of IPR infringement will see a manifold increase in the country. This would be so because, while the field Customs officials are busy with their assessment and clearance tasks, and have very little time to concentrate on anything else, Custom intelligence officials will be in a far better positon to do enforcement operations with their inherent capacity to maintain appropriate vigilance and conduct effective information gathering.

Movement of IPR infringed goods do not only occur through commercial freight traffic. Recently detections at the global level suggest that such movement also occur through passenger traffic, express and courier traffic, and transit traffic. Customs intelligence, with their ubiquitous presence in all those places, is again in an advantageous position to handle such violations.

Gearing up the role of Customs intelligence alone will not serve the purpose unless Bangladesh Customs takes steps to boost confidence among the original right holders in the efficiency of its enforcement mechanism. In order to enhance participation of the right holders in the enforcement initiatives, the NBR needs to undertake measures to promote cooperation between Customs and the right holders. For example, a Manual may be prepared and published, which will contain information for right holders for lodging and processing applications for action requesting Customs to take action in cases where a suspicion exists that an IPR is infringed may be prepared. Secondly,information of seizures and detection by Customs of IPR infringed goods may be posted and regularly updated in the Customs website as a Prominent Menu so that the concerned right holders can easily access such information.

References:

1. Advocates IP Law Alliance, web publication, “Enforcement of Intellectual Property Rights-Bangladesh” at http://www.hg.org/article.asp?id=20278.

2. National Board of Revenue, 1669, *The Customs Act, 1969.*

3. Naznin, S.M. Atia, 2011, “Protecting Intellectual Property in Bangladesh: An Overview”, in *Bangladesh Research Publications Journal*, vol. 6, issue 1, September-October.

4. World Intellectual Property Rights Organization, 2013, *Developing National Intellectual Property Policy for Bangladesh: An Assessment of National Intellectual Property System.*

5. World Trade Organization, 1994, *The Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights.*

- Author **Dr. Md Khairuzzaman Mozumder**, Deputy Chief of Party, USAID Bangladesh Trade Facilitation Activity

সর্ববৃহৎ কোকেন চালান উদ্ধারের নেপথ্যে

ড. মইনুল খান

কোকেন উদ্ধার! শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। ধরা পড়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে। এটি সাম্প্রতিক সর্ববৃহৎ উদ্ধারের ঘটনা। আজ পর্যন্ত যেসব কোকেনের চালান ধরা পড়েছে তার মধ্যে এটি উল্লেখযোগ্য। তাও আবার অভিনব পদ্ধতিতে। ধরা পড়ার কাহিনিও অত্যন্ত কৌশলী। ঘটনাটি সবার যেমন দৃষ্টি কেড়েছে, তেমনি আলোচনা ও বিশ্লেষণও উঠে এসেছে নানা দিক থেকে। এটি ইতিবাচক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারি সংস্থাগুলোর সক্ষমতা, দেশের ভাবমূর্তি, সরকারের সুশাসন, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো সামনে চলে এসেছে। এতে সবল দিকগুলো আরো সুসংহতকরণ এবং বর্তমান দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠার তাগিদ অনুভূত হয়েছে।

ঘটনা উদঘাটিত হয় ৬ জুন ২০১৫ এ। নানা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, চট্টগ্রাম বন্দরে একটা কোকেনের চালান এসেছে। কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক সর্বপ্রথম একটি চিঠি দেয়া হয় বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে। চিঠিতে বলা হয়, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর নানা সূত্র থেকে জানতে পেরেছে যে, THOR-

STREAM জাহাজ (রোটেশন নং-২০১৫/১১৯৮ ও লাইন নং-৩৪) এর মাধ্যমে ১২ মে ২০১৫ এ আগত একটি কন্টেইনারে (CBHU9145769) সানফ্লাওয়ার অয়েল ঘোষণায় আমদানিকৃত পণ্যচালানের মধ্যে আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য কোকেন রয়েছে। গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ দপ্তর প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয় যে, আলোচ্য চালানটিতে কোকেন আমদানি হয়েছে। চিঠিতে কন্টেইনারটির পণ্য এ দপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে ছাড় প্রদান না করার জন্য উভয় দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। এই চিঠির পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কেউ কেউ এটিকে উড়িয়ে দেন। অনেকে আবার উৎসুক দৃষ্টিতে অপেক্ষা করেন। ঠিক হলো ঢাকা থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে এটি খোলা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে একটি রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও তার টিম (মোবাইল ল্যাবসহ) উপস্থিত হই চট্টগ্রামে। ৮ জুন ২০১৫ এ সবার উপস্থিতিতে এটি খোলা হলো।

অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় নিরাপত্তাজনিত কারণে বিষয়টি গোপন রাখলেও তা গোপন থাকেনি। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রায় অর্ধশত সাংবাদিক ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। কী আছে এই কন্টেইনারে? কেন ঢাকা থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসেছেন? এই প্রথম এধরনের টিম কাজ করছে। ঐ দিন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে প্লেনে যাওয়ার সময় একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার হেডলাইন দৃষ্টি কাড়লো। বড় একটা সংবাদ ছাপা হয়েছে। চট্টগ্রামে কোকেন সন্দেহে আটক একটি কন্টেইনার খুলতে ঢাকা থেকে বড় কর্তারা আসছেন। বন্দরে সাংবাদিকদের উৎসুক দৃষ্টি। কেউ কেউ লাইভ প্রচার করছেন। কী হচ্ছে? কী আছে? কসকো শিপিং লাইন্সের ৪০ ফুটের কন্টেইনারটি আগে থেকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো। একে একে ১০৭ টি ড্রাম নামানো হলো। নামানোর আগে, ঠিক হলো এজাতীয় চালানে আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্র জড়িত থাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য লুকিয়ে রাখতে পারে। বিভিন্ন মুভিতেও এটি দেখা যায়।

জেমস বন্ড অভিনীত 'ডাই এনাদার ডে' নামের মুভিতে এজাতীয় ঘটনার ছাপ আছে।[১] অবৈধ চালান যাতে ধরা না পড়ে অথবা পড়লেও যাতে স্পষ্ট না হয় সেজন্যে বিস্ফোরক দ্রব্য এমনভাবে রাখা হয় যাতে পুরো চালানটি পুড়ে যায় বা তাৎক্ষণিক ধ্বংস হয়ে যায়। তবে নির্দিষ্ট এজেন্ট খুললে তিনিই জানবেন কীভাবে খুলতে হবে। অথবা নির্দিষ্ট কোড ব্যবহারের প্রক্রিয়ার প্রশিক্ষণ থাকে ঐ এজেন্টের। এক্ষেত্রে এবিষয়টি মাথায় রেখে খোলার আগে কন্টেইনারটি বন্দরের স্ক্যানিং মেশিনে চেক করা হয়।

[১]লি টামাহরি কর্তৃক পরিচালিত এই বিখ্যাত একশন মুভিটি প্রথম প্রকাশ হয় ২০ নভেম্বর ২০০২ সালে এবং তা বেশ জনপ্রিয়তা পায়।

কোন বিস্ফোরক দ্রব্য নেই তা নিশ্চিত হওয়া গেল এক্সরে ইমেজে। ইমেজ দেখে বোঝা গেল, ভেতরে ড্রাম আছে। দুই স্তরে সাজানো। তারপরও বাড়তি সতর্কতা। মুখ খুলে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করা হলো। যারা খুললেন তাদেরও সতর্ক থাকতে বলা হলো। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে। একটা বাজে গন্ধ। সবার নাকে ধরা পড়লো। একজন রুমাল নাকে দিলেন। সন্দেহটা অমূলক নয় মনে হলো। বিশ্লেষণমতে, যে কোন একটি বা দুটোতে কোকেন আছে। কিন্তু কীভাবে বুঝবো? কীভাবে আলাদা করবো?

গোয়েন্দার দৃষ্টিতে এটি কঠিন নয়। ঠিক করা হলো। এজাতীয় চালানে একাধিক প্যাকেজ থাকলে ভিন্নধর্মী মার্কস অথবা ইঙ্গিত থাকবে। প্রত্যেকটি চালানের ড্রাম দেখা হলো। ড্রামগুলোর রং নীল। পুরোনো মনে হয়। দেখলে মনে হবে না এতে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কিছু আছে। উপস্থিত অনেকে হাস্যরসও করেছেন। পাশে কানাঘুষা। দমে যাওয়ার সুযোগ নেই। চিহ্নিত করার সুবিধার্থে প্রতিটি ড্রামের গায়ে নম্বর দেয়া হলো। এক হতে ১০৭ নম্বর। এগুলোর বাহ্যিক ভিন্নতা খোঁজার জন্য গোয়েন্দার টিম কাজ করছে। টিমের সদস্যরা এসে জানালেন ১১টি ড্রামে ভিন্ন ধরনের মার্কস পাওয়া গেছে। বাকিগুলো একরকম। এই ১১টি আলাদা করা হলো। এগুলোর নমুনা উত্তোলন করা হলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। নমুনাগুলো কীভাবে রাখা হবে? এগুলো তরল পদার্থ। ঘোষণা সানফ্লাওয়ার ভোজ্য তেল। এসেছে ক্রুড (অপরিশোধিত) আকারে। স্বচ্ছ বক্স আনা হলো যাতে বাইরে থেকে নমুনার রং বোঝা যায়। নমুনা উত্তোলন করার আগে নিজেরা বসলাম আরেকবার।

আলোচনা করলাম। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একটা মাঝারি আকারের বাঁশের লাঠি আনা হলো। উদ্দেশ্য হলো, লাঠি দিয়ে ভেতরের মাপ এবং বাহিরের মাপ সমান হয় কি না তা দেখা। অভিজ্ঞতায় বলে, এসব ড্রামের ভেতরে একাধিক স্তর থাকতে পারে। উপরে তেল এবং ভেতরের স্তরে কোকেন থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া গেলো না। বাঁশের লাঠি এক্ষেত্রে কার্যকর প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হলো। কম্পিউটারের ব্যবহার এক্ষেত্রে অচল। তেলের ভেতরে খুঁচিয়ে দেখা হলো। একইসঙ্গে নমুনা নেয়া হলো লাঠি দিয়ে নেড়ে নিচ থেকে। কারণ কোকেনের ঘণত্ব বেশি হলে তা নিচের দিকে থাকতে পারে। পরীক্ষায় তখন ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি হবে। পাশেই শেডের নিচে সকলে বসা। অদূরে একটি টেবিলে বসে আছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেমিস্ট। টেবিলে সাজানো

হয়েছে নমুনাগুলো। নানা কেমিকেলস ও কিটস। পেশাদারিত্বের ছাপ স্পষ্ট। এই পেশাদার কেমিস্টের উপর নির্ভর করছে সবকিছু। গোয়েন্দাদের চৌকসবৃত্তি এই পরীক্ষার উপর নির্ভর করছে। তীব্র আগ্রহ মিডিয়ার। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি টেবিলের দিকে। কেমিস্ট এক এক করে কেমিকেলস মিশ্রিত করছেন আর কিটস দিয়ে পরীক্ষা করছেন। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের একজন হঠাৎ দৌড়ে আসলেন; বললেন, "স্যার একটা ড্রামের মুখ খুলতেই তীব্র গন্ধ বেরোচ্ছে। বললাম, গন্ধতো সবগুলো থেকে আসছে! গোয়েন্দা কর্মকর্তা বললেন, স্যার এটি ভিন্ন। দৌড়ে গেলাম। দেখলাম, সত্যি তাই। এই ড্রামটির নম্বর ৯৬। হাতে তরল পদার্থ নিয়ে নাকের কাছে নিলাম। মনে হলো এটি অন্যদের থেকে ভিন্ন। ঘণত্ব বেশি। আঠালো জাতীয়। রং ভিন্ন। ভাবলাম, যাক গোয়েন্দার চোখের সফলতা আসবে এই ড্রাম থেকে। রং, ঘণত্ব, গন্ধ ভিন্ন হওয়ায় এটিকে বিশেষভাবে সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচনা করা হলো। কেমিস্টের টেবিলে এসে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ফলাফল আছে কি না? কোন হ্যাঁ সূচক জবাব পেলাম না। হতাশ হলাম না। বিশেষ অনুরোধ করলাম, ৯৬ নম্বর ড্রামের নমুনাটি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। তিনি দেখলেন। এদিকে বিকেল গড়িয়ে গেল। মিডিয়াগুলো অধীর আগ্রহে। কোন কোকেন পাওয়া গেছে কি না? উপর মহল থেকে বারবার জানতে চাওয়া হচ্ছে কোন ফলাফল আছে কি না? আমরা এই কেমিস্টের উপর নির্ভর করছি।

ভিন্ন এক সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আলাপ হলো। তিনি বলছিলেন, আজকে কোকেন পাওয়া গেলে সারা দেশে জাতীয় খবর হবে। কাস্টমস গোয়েন্দাসহ অন্যরাও নন্দিত হবেন। এতে দেশের সুনাম রক্ষা হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হবে, এই দেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এর আগে দশ ট্রাক অস্ত্র এই বন্দরেই উদ্ধার হয়েছিলো। তখনও এটিকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু তা ধরা পড়েছে। আজকের কোকেনের ঘটনা ঘটলে আরেকটি ইতিহাস হবে। তিনি আলাপ প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন পরিমাণ কতো? প্রায় ৬০ কেজির তথ্য আছে। হিসেব কষছেন তাহলে প্রতি কেজি কোকেনের দাম ৫০ কোটি টাকা হলে এর দাম হবে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। তবে একেকজন একেক দাম বলছেন। কেউ বলছেন প্রতি কেজি ৩৫ কোটি টাকা। সর্বনিম্ন দাম পাঁচ কোটি পাওয়া গেছে। তাতেও তিন শত কোটি টাকা হবে। তিনি আগাম সতর্ক থাকার জন্য বললেন। কারণ আন্তর্জাতিক মাফিয়াদের এজেন্ট এদেশেও থাকতে পারে। এজেন্ট ছাড়া এরকম বড় চালান কেউ পাঠাবে না। আগে থেকে সব ঠিক করা আছে। তারা হয়তো পাশ থেকে লক্ষ্য করছেন। কে কে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন তা দেখছেন। বললাম, সরকারি দায়িত্ব পালন করছি। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টি এখনি ভাবছি না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্বটা গুরুত্বপূর্ণ। কাস্টমস গোয়েন্দা এরই মধ্যে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়েছে এবং এর অনেক সফলতা দৃশ্যমান হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পাশে উপবিষ্ট একটি সংস্থার বন্ধুবর কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, কখনো কোকেন দেখেছি কি না। এর স্বাদ কেমন? কী হয় খেলে? এটি কেন নিষিদ্ধ? কী দিয়ে তৈরি হয়? এসব প্রশ্নের জবাব আমারও জানা নেই। ফোন দিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগের এক অধ্যাপককে। তিনি অত্যন্ত পরিচিত। এসব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। ভেজালবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের প্রবক্তা। বিভিন্ন আলোচনায় পরিচিত মুখ। স্যারের কাছ থেকে আরো অনেক তথ্য ফোনে জানা গেল। বন্ধু কর্মকর্তাকে জানালাম এসব তথ্য। কোকা পাতার নির্যাস থেকে এটি তৈরি হয়। মূলত বলিভিয়া ও উরুগুয়েতে এর ব্যাপক চাষ হয়। কলোম্বিয়াতেও এখন এর ব্যাপ্তি ঘটেছে। এটি মূলত সাময়িক উত্তেজনা যোগায়। প্রাচীনকালে ঐসব দেশে গরিব লোকজনকে দিয়ে কাজ করার শক্তি যোগানোর জন্য এসব কোকা পাতা খাওয়ানো হতো। পরবর্তীতে তা জনপ্রিয়তা পায়। পশ্চিমা দেশেও চলে আসে এটি। শক্তিবর্ধক হিসেবে এর প্রচার পায় এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। উনিশ শতকে পরিশোধিত আকারে এটি মাদক দ্রব্য হিসেবে বাজারজাত শুরু হয়। বিভিন্নভাবে এটি ব্যবহৃত হয়। ইনজেকশন, ধোয়া আকারে, সাপোজিটার ও ট্যাবলেট আকারেও গ্রহণ করে মাদকাসক্তরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাউডার হিসেবে এটি বাজারজাত হয়। শরীরে প্রবেশের সাথে সাথে তা ব্রেইনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। শরীর ও মন তাজা হয়। ফুসফুস ও শরীরের রক্ত প্রবাহ বেড়ে যায়। স্পর্শ, গন্ধ ও দৃষ্টি প্রখর হয়। আবেগ ও অনুভূতিতেও তীব্রতা আসে। এর খারাপ দিক হলো, এটি আসক্তির সৃষ্টি করে এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির কারণ হয়। দিনে দিনে ডোজ বাড়িয়ে দিতে হয়। একসময় জীবনীশক্তি নষ্ট হয়। স্বাভাবিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয়। এসব আলাপ করতে করতে চা, বিস্কুট ও পানীয়ের ব্যবস্থা হলো টেবিলে। সাথে কোক পানীয় নিয়ে আসল একজন। বন্ধুটি কোকের গ্লাসে চুমুক দিতেই বললাম, এই যে কোক খাচ্ছেন এটিতেও কোকেনের ছায়া আছে।

— কেমন করে?

— ১৮৮৬ সালের ৮ মে আমেরিকান বিজ্ঞানী জন পেম্বারটন কোকা পাতা ও কোলা পাতার সমন্বয়ে একটি এনার্জি ড্রিঙ্ক তৈরি করেন। নাম রাখেন 'কোকা-কোলা'। কার্বোনেটেড সিরাপ হিসেবে জর্জিয়ার আটলান্টায় এটি বাজারজাত করা হয়। এতে কোকেনের নির্যাস থাকায় এই ড্রিঙ্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায়। 'ইউ উইল ফিল গুড' ধরনের নানা বিজ্ঞাপন দিয়ে এর প্রসার ঘটে। ব্যবসা

জমজমাট। পরবর্তীতে আমেরিকান আদালত কোকেনের নির্যাস ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় ১৯০৩ সালে।
— বর্তমানেও যে কোকা পাতা ব্যবহার হচ্ছে না তার নিশ্চয়তা কী?
— ঠিক বলেছেন, শুনেছি এর মূল রেসিপি ঐ কোম্পানির মাত্র দুজন ব্যক্তি জানে এবং এটি তাদের ট্রেড সিক্রেট। এরা একসাথে ভ্রমণ করে না কোম্পানির নিরাপত্তার কারণে। তবে 'কোকা-কোলা' নামটি এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানেও এর ব্যবহারে আছে আসক্তি। শিশু, কিশোর সবাই এর ভক্ত হবে কেন?

সকল মিডিয়া কেমিস্টের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কী হচ্ছে বুঝে উঠলাম না। কেমিস্ট মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর একজন টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার লাইভ টেলিকাস্টের পর বক্তব্যে জানাচ্ছেন, কোকেন সন্দেহে আটক ভোজ্য তেলের ভেতর কোন কোকেনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাত দিয়ে বারবার এটি বলছেন। মাদকের বিষয়ে এই অধিদপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। এই সংস্থা বলছে কোন কোকেন নেই! মাদকের বিষয়ে এই সংস্থার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হতাশ হলাম না। মিডিয়াগুলো কন্টেইনারটি আটকের লিড এজেন্সি হিসেবে আমার বক্তব্য জানতে চাইলো। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যে বক্তব্য তা খণ্ডন করলাম না। বললাম, তাদের যে কিটস ও কেমিকেলস সরবরাহ করা হয়েছে তাতে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। আমাদের কাছে যে তথ্যাদি ও পারিপার্শ্বিকতার বিশ্লেষণ আছে তাতে এই কন্টেইনারকে সন্দেহভাজন হিসেবেই মনে করছি। আমরা আরো নির্ভরযোগ্য ল্যাবে প্রেরণ করে নিশ্চিত হতে চাই এতে কোন অবৈধ কিছু নেই। তাছাড়া, কোকেন উদ্ধার না হলেও কাস্টমস আইন অনুযায়ী এই চালানে ইতোমধ্যে 'মিথ্যা ঘোষণা' ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং তা আইন অনুযায়ী জব্দ হবে।

এই চ্যালেঞ্জ নেয়াটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভেবেও তা নিতে হয়েছে। প্রতিটি ড্রাম হতে আরো দুই সেট নমুনা নেয়া হলো উপস্থিত সবার স্বাক্ষরে। একইভাবে সবার স্বাক্ষর নিয়ে কন্টেইনার সিলগালা করা হলো। এক সেট শীঘ্র ঢাকায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ঢাকায় পরীক্ষায় কোকেনের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে কি না তাতে শঙ্কা আছে। কিন্তু তারপরও এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু কেন?
এখানে গোয়েন্দার চোখের তীক্ষ্ণতার প্রতিফলন ঘটেছে। কেন এই স্পষ্ট উচ্চারণ? কেন এই সন্দেহ?

১. আইজিএম অনুযায়ী, আলোচ্য চালানটির কান্ট্রি অব অরিজিন হচ্ছে বলিভিয়া। কিন্তু শিপমেন্ট হয়েছে উরুগুয়ে-সিঙ্গাপুর-চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে ১২/৫/২০১৫ এ। প্রায় একমাস লেগেছে পথে। তবে বন্দরে দীর্ঘ ২৫ দিন পড়ে থাকার পরও কেউ এর মালিকানা দাবি করেনি। কেউ খালাসের জন্য বিল অব এন্ট্রি দাখিল করেননি। এটি সন্দেহজনক। একটি নির্দিষ্ট সময় পর আমদানিকারককে পোর্ট ডেমারেজ দিতে হয়। এই চার্জ দিলে আমদানিকারকের খরচ বেড়ে যায়। লাভের চেয়ে লোকসানের পাল্লা ভারি হয়। পণ্য খালাসে যেখানে একদিন দেরি হলে নানা অভিযোগ ও তাতে মিছিল পর্যন্ত হয়েছে সেখানে এতোদিনে কেউ বিল অব এন্ট্রি দাখিল করলো না! এমনিতে এতদূর হতে আগত একটি চালান বন্দরে পৌছাতে সময়ক্ষেপণ হয়েছে। তার উপর ২৫ দিন বন্দরে রয়েছে। এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

২. আইজিএম অনুযায়ী, চালান এসেছে খান জাহান আলি লি., ২৩২ খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রামের নামে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিনি এই মালের মালিকানা অস্বীকার করেছেন। কে বা কারা এটি পাঠিয়েছে তার নামে! তিনিই যে এই চালানটি আমদানি করেছেন এরকম কোন রেফারেন্স পাওয়া যায়নি। এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড নামের অটোমেশন সিস্টেম পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ প্রতিষ্ঠান কেবল স্পাইস আমদানি করে। কখনো তিনি ভোজ্যতেলের চালান আমদানি করেননি। নতুন এই চালান আমদানির ঘটনায় সন্দেহের সৃষ্টি হবে এটিই স্বাভাবিক। আধুনিক ঝুঁকিব্যবস্থাপনা তাই বলে। কেউ কোন ভিন্ন বা নতুন পণ্য আমদানি করলে সেটি 'রেড চ্যানেল' এ ফেলতে হবে, এটি সঙ্গত।

৩. কন্টেইনারটি এলসি ব্যতীত এসেছে। এলসি ছাড়া কোন বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি করা যায় না। এক্ষেত্রে পণ্যের বিনিময় মূল্য কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। কন্টেইনারের নিজস্ব হাত-পা বা পাখা নেই যে, এটি এমনি চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে। কোন না কোনভাবে চুক্তি ও পেমেন্ট না হলে এটি বলিভিয়া থেকে আসার কথা নয়। পেমেন্ট পদ্ধতি গোপন রাখা এবং বিনিয়োগ করে তা আবার দীর্ঘদিন বন্দরে ফেলে রাখার সদুত্তর মেলে না। এখানে অবৈধ কোন যোগসূত্র থাকার সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক।

৪. দক্ষিণ আমেরিকা বিশেষ করে বলিভিয়া হতে বাংলাদেশে কখনো ভোজ্য তেল আমদানি হয়নি। এই প্রথম সানফ্লাওয়ার অয়েল বলিভিয়া থেকে এসেছে। অধিকন্তু, এই তেল এসেছে ক্রুড ফরমে। যার নামে এসেছে অতীতে তার এধরনের পণ্য আমদানির নজির নেই। তিনি বাণিজ্যিক আমদানিকারক। তার কোন রিফাইনারি মেশিনারিজ নেই। রিফাইনারি না থাকলে এটি বাণিজ্যিকভাবে আমদানি করা যায় না। ভোজ্যতেলের রিফাইনারির বিনিয়োগ ভিন্ন একটা খাত। তাই আমদানি চালানের প্রকৃতি এবং আমদানিকারকের ব্যবসায়ের এই ভিন্নতার বিবেচনায় এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কার্গো হিসেবে বিবেচিত।

৫. কন্টেইনারটি বন্দরে এমন এক জায়গায় রক্ষিত ছিল, এতে মনে হবে এটি কারো নজরদারিতে লুকায়িত অবস্থায় আছে। এটি সন্দেহজনক। অন্যদিকে, আইজিএম ঘোষণায় এর কতিপয় তথ্যাদি এমনভাবে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে যা সহজে সার্চ দিয়ে বের করা কঠিন। সানফ্লাওয়ার অয়েল বা কান্ট্রি অব অরিজিন বলিভিয়া দিয়ে সার্চ দিলে এই চালানের তথ্য বের হয় না। তার মানে এই তথ্য এমনভাবে এন্ট্রি দেয়া হয়েছিলো যেন অটোমেশন সিস্টেমে সার্চে ধরা না পড়ে। পরবর্তীতে ইন্টেলিজেন্স প্রয়োগ এবং নানা ধরনের যোগাযোগ বিশ্লেষণ করে চালানটির কন্টেইনার নম্বর ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বের করা হয়।

৬. অন্যদিকে, এই দপ্তর একটি গ্রুপ কর্তৃক এই কন্টেইনারটি তৃতীয় দেশে পাচার করে দেয়ার জন্য ই-মেইলে যোগাযোগের তথ্যাদি উদ্ধার করে। প্রথমে তারা চট্টগ্রামে বের করার চেষ্টা করে। এখানে ইন্টেলিজেন্স নজরদারি থাকার কারণে অন্য একটি দেশে পুনঃরপ্তানি চেষ্টা চলে। এই যোগাযোগের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের তিনজনকে ঢাকা থেকে কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে গ্রেফতার করেছে (৩০ জুন ২০১৫)।[২] এই তিনজন এই পণ্য চালানটি খালাসের সাথে এবং পুনরপ্তানির সাথে জড়িত ছিলেন এমন স্বীকারোক্তিও দিয়েছেন। এরা নিজেরা লাভবান হওয়ার প্রয়াসে এই কাজ করেছেন এমন প্রমাণাদি আছে। এদের সূত্র ধরেই হয়তো মূল হোতাদের ধরা বা আইনের আওতায় আনা অসম্ভব নয়। তদন্তকারী সংস্থা বা কর্মকর্তা একাজটি এগিয়ে নিবেন।

৭. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা ইঙ্গিত হচ্ছে, প্রায় তিন মাস পূর্বে কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ বলিভিয়া হতে সানফ্লাওয়ার অয়েলের ভেতরে আনীত প্রায় ৩১০ কেজি কোকেন উদ্ধার করে। চট্টগ্রামে আনীত চালানটিও এসেছে বলিভিয়া থেকে। এটিও একই ভোজ্যতেল। এর গোয়েন্দা অর্থ দাঁড়ায় এই যে, দক্ষিণ আমেরিকা হতে সরাসরি উত্তর আমেরিকা বা পশ্চিম ইউরোপের দেশে সরাসরি রপ্তানি হলে তাতে কোকেন বা অন্য কোন মাদকদ্রব্য নেই এটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য উত্তর আমেরিকা বা পশ্চিম ইউরোপের দেশে কঠিন কায়িক বা অন্যান্য পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এটি এড়ানোর জন্য তৃতীয় কোন দেশের মাধ্যমে বা ট্রানজিট করে ঐ সব দেশে প্রবেশ করালে এই কঠিন পরীক্ষা এড়ানো যাবে এই ভরসায় বাংলাদেশকে হয়তো এই মাফিয়া চক্রটি বেছে নিয়েছিলো। বাংলাদেশ বা এশিয়ার কোন দেশ থেকে ঐ ৯৬ নম্বর ড্রামটি অন্য কোন রপ্তানি চালানের রপ্তানির মধ্যে মিশ্রণ করে দিলে আর যাই হোক কোকেন আছে এমন সন্দেহ জাগবে না এটি হয়তো বিবেচ্য ছিলো এই চক্রটির। কানাডায় কোকেন উদ্ধারের উদাহরণ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের চালানটির মিলের বিষয়টি কাস্টমস গোয়েন্দাদের কাছে মুখ্য ভিত্তি ছিলো। কাস্টমস গোয়েন্দার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় এতে।

[২]এরা হলেন মো. আতিকুর রহমান, মোস্তফা কামাল ও একেএম আজাদ।

DESIGNATED REFERENCE INSTITUTE FOR CHEMICAL MEASUREMENTS

DESIGNATED REFERENCE INSTITUTE FOR CHEMICAL MEASUREMENTS
Bangladesh Council of Scientific & Industrial Research
Dr. Qudrat-I-Khuda Road, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh
Tel: +880-2-9671810, Fax: +880-2-58615819, Email: mkakhon_67@yahoo.com

Measurement Service Section (MSS)

Reference Measurement Division

Measurement Service Report

DRICM Report Ref:	DRICM/MSR/2015/06/15	**Report Delivery Date:** 15 June, 2015
Analytical Service Cell Ref:	**DM-68, 15.06.2015**	
Name of the Client:	Customs Intelligence & Investigation Directorate	**Sample Receiving Date:** 11 June, 2015
Client Code:	DRICM-CL-2015-137	
Contact Person: (Name & Designation)	Dr. Moinul Khan Director General	
Address of the Client: (Including Tel, Fax, E-mail)	Customs Intelligence & Investigation Directorate IDEB Bhaban (9th Floor) 160/A Kakrail VIP Road, Dhaka-1000 Phone: +88-028316145, Fax: +88-02-8313697	
Product	Sun Flower Oil	

Lab sample ID	User Sample ID	Method/ Instrument	Parameter	Result (ppm)
MSS15061101	01/1	GC-MS	Cocaine	Not Detected
MSS15061102	02/1			Not Detected
MSS15061103	03/1			Not Detected
MSS15061104	04/1			Not Detected
MSS15061105	05/1			Not Detected
MSS15061106	06/1			Not Detected
MSS15061107	07/1			Not Detected
MSS15061108	08/1			Not Detected
MSS15061109	09/1			Not Detected
MSS15061110	10/1			Not Detected
MSS15061147	47/1			Not Detected
MSS15061196	96/1			Detected
MSS150611105	105/1			Not Detected

Special Notes:
a. The result reported here pertained to the sample received in the laboratory only.
b. The laboratory is not responsible for the data quality affected due to the above. The precision & accuracy are defined only for the laboratory process, not for the sampling, transporting and storage processes.
c. The result should not be reproduced partly or fully without prior concern of the laboratory.

No. of Samples	13		
No. of Total Analytes		01	
No. of Total Services			13

Analysis Performer	Approved by	Forwarded by
Process Owner Date: 15-06-2015	In-charge, DRICM Date: 15.06.15 Dr. Mala Khan In-Charge DRICM, BCSIR	Research Coordinator Date: 15.06.2015 মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ গবেষণা সমন্বয়কারী বিসিএসআইআর, ঢাকা

মূল প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী
জনশক্তি ইন্টারন্যাশনাল, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং ডিটিএল/...০০২১/০৬/১৫/২৬৫৩..... তারিখ : 16 JUN 2015

১৯৫০ এর সেকশন ২৪(১)/সেকশন ২৯, অনুযায়ী গভর্নমেন্ট এনালিস্ট কর্তৃক ঔষধের নমুনা পরীক্ষা বিশ্লেষণের সার্টিফিকেট।

নমুনা প্রাপ্তির তারিখ	:	১১/০৬/১৫ইং।
নমুনা গ্রহণের সূত্র নং	:	০৫/০৭(৪৮)কমস/২০১১(সাব ফাইল)/৩৭৯, তাং-১১/০৬/১৫ইং
ঔষধের নমুনা প্রেরকের নাম ও ঠিকানা	:	ডঃ মইনুল খান, মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

১। নমুনার সাধীক,ও ঔষধের (ক) বাণিজ্যিক নাম : অজানা তরল (Unknown sample)
বিশদ বিবরণ। (খ) জেনারিক নাম :
(গ) ব্যাচ নং/তা/উ নং : ১৬/১
(ঘ) প্রস্তুতকারক : উল্লেখ নাই।

২। পরীক্ষা/বিশ্লেষণের বিস্তারিত বিবরণ :

ক্রমিক নং	বাহ্যিক/গুণগত/পরিমাণগত পরীক্ষার বর্ণনা।	পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল।	মোবিত নাম্বী ও প্রয়োগের বি, পি/ইউ, এস, পি, সীমা।
১।	বর্ণনা	ঃ হাল্কা হলুদ রঙের ঘোলাটে তরল। ক্যাপযুক্ত টেষ্ট টিউবে ০৫ মিলি পরিবেশিত।	
২।	সনাক্তকরণ পরীক্ষা	ঃ কোকেইন সনাক্ত।	

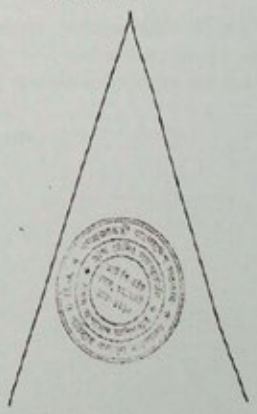

সরকারী বিশ্লেষকের মন্তব্য ঃ-

পরীক্ষিত নমুনাটিতে কোকেইন সনাক্ত।

স্মারক নং:
তারিখ, ঢাকা.....
ইং 16 JUN 2015

১১/৬/১৫
ডাঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ
সরকারী বিশ্লেষক।

The Daily Star | DHAKA SUNDAY JUNE 28, 2015

Liquid cocaine, not edible oil

Confirm tests on contents of barrels from seized container at Ctg port

STAR REPORT

A barrel imported through the Chittagong port one and a half months ago contains cocaine, said customs intelligence yesterday.

The cocaine was detected in a liquid substance inside a barrel that weighed 185 kg, which was imported from Bolivia along with 106 other barrels on May 12.

The other barrels carried sunflower oils, said intelligence sources.

Moinul Khan, director general of Customs Intelligence and Investigation Directorate, said they became sure about the cocaine after two tests, one of which were done at Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research in Dhaka.

"Both reports confirm the presence of cocaine in one of the seized barrels," he told The Daily Star over the phone.

He said the quantity of the cocaine could not be known immediately as they do not have the adequate technical equipment to ascertain this.

He added that the liquid in the barrel was different in smell, colour and thickness from the sunflower oil in other barrels.

A top official of the intelligence, however, claimed one third of the liquid could be "liquid cocaine".

Chittagong Metropolitan Police said the container was imported without following proper procedures, so it remained stuck at the port.

A top official of the Special Branch (SB) of Police said they were informed by a foreign intelligence agency about the smuggling of a drug through a container from South America to somewhere else using Bangladesh as a transit.

Liquid co

FROM PAGE 16

Sources said all the 10
found in a container w
sealed off by Chittago
Branch (DB) of police

They added the con
opened on June 8 in th
top officials from diffe
enforcement agencies.

Initially an expert
Narcotics Control D
(NCD) conducted a
on samples collected
barrels but could not
presence of any drug.
Our Chittagong corre
reports.

DB officials on June
Sohel, an employee of a
connection with the imp
barrels.

প্রথম আলো | রোববার, ২৮ জুন ২০১৫

তেলের সঙ্গে কোকেন

চট্টগ্রাম বন্দরে জব্দ ১০৭ ড্রামের একটিতে কোকেন পাওয়া গেছে। অন্য ড্রামগুলো একে একে পরীক্ষা হচ্ছে

চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি করা ভোজ্যতেলের কনটেইনার। তেলের আড়ালে কোকেন রাখার সন্দেহে নমুনা পরীক্ষার জন্য এগুলো খোলা হয়। ফাইল ছবি

সমকাল | রোববার | ২৮ জুন ২০১৫ | ১৪ আষাঢ় ১৪২২

ভোজ্যতেলের আড়ালে তরল কোকেন

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ধরা পড়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসা ৩শ' কোটি টাকার চালান

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আনা নমুনা পরীক্ষা করা হয় ঢাকার ল্যাবরেটরিতে

তেলের সঙ্গে কোকেন

কালের কণ্ঠ

ভোজ্যতেলের আড়ালে তরল

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বন্দরে। থানা নিয়ন্ত্রণ অফিসারের সহকারী পরিচালক নাজমুল করিম সমকালকে জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে ধারণাতীত প্রতি কেজি কোকেন বিক্রি হয় পাঁচ কোটি টাকায়। এ হিসাবে উদ্ধার করা কোকেনের মূল্য ৩০০ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে কোকেনের মান যাচাইয়ে কয়েক ধাপে পরীক্ষা করতে হয়। তবে ছোট্ট মার্কেটে এই কোকেনের নাম আহত অনেক বেশি।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত ৭ জুন চট্টগ্রাম বন্দরের এফসিটি ইয়ার্ডে থাকা কনটেইনারটি তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিক করে শিপমেন্ট করে নেয় শুল্ক গোয়েন্দা, অভিযান পরিচালনা করে শুল্ক গোয়েন্দা, কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ অফিসগুলি, চট্টগ্রাম বন্দর, কাস্টমসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কনটেইনারে থাকা ১০৭টি ড্রাম থেকে ১০৬টি নমুনা নিয়ে করা হয় পরীক্ষা। এর মধ্যে ১৮৫ কেজি সূর্যমুখী তেলের সঙ্গে কোকেন মেশানো পাওয়া যায়।

চালান খালাসের প্রক্রিয়া যুক্তরাজ্য থেকে

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, চীন থেকে খালি জাহাজটি কনটেইনারটি আনে বলিবিরহাট। আমদানি এক ব্যক্তি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা। ১০৭টি ড্রামে ভরে তেল কোকেন আনার বিষয়টি জানায় ঘণ্টায় ১১টিতে কোকেন আনে বলে ধারণা দিয়েছে তারা। এ কারণে সন্দেহভাজন কনটেইনারটি খোলার পর বিশেষ গ্রহের ঠিকানা থাকা ১৫ ড্রামকে প্রথমে আলাদা করে ফেলেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অফিসারের কর্মকর্তারা। কিন্তু যে মেশিন দিয়ে ৮ জুন তেলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে সেটি অত্যাধুনিক ছিল না। তাই তাকের লাগে কি না, তা যাচাইয়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এবার ১০৭ ড্রামের মধ্যে ৯৯ খণ্ড ড্রামের নমুনাতেই মেশানো তরল কোকেন। ১৮৫ কেজি ওজনের সূর্যমুখী তেলের সঙ্গেই মেশানো আছে এ কোকেন। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাকে তথ্য দিল; কোন ব্যক্তিকে তেলের সঙ্গে চিহ্নিত এ কারণে ১ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সেই কনটেইনারে আছে কোকেন

১৮৫ কেজি সূর্যমুখী তেলের এক-তৃতীয়াংশই কোকেন!

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ও চট্টগ্রাম

সূর্যমুখী তেল মেশানো নিয়ে বলিবিরহা থেকে আনা সেই কনটেইনারগুলোর মধ্যে কোকেনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। গত ৯ জুন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এসব কনটেইনার জব্দ করা হয়েছিল। এই তিন মাসজুড়ে অস্তিত্ব আসে থাকা অবস্থায় কথা হলেও প্রাথমিকভাবে একটি কনটেইনারে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শনাক্তকারি পরীক্ষায় কোকেনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তবে কোন কনটেইনারে কতটুকু কোকেন আছে, তা এখনো নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কাস্টমস। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

৮ জুন কনটেইনার থেকে ড্রামগুলো পরীক্ষার জন্য আলাদা করা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় এর নমুনায় কোকেনের উপস্থিতি দেখে (ওপরে)। সুপারিশ করেন করে পাঠানোর সময় ইয়ারবারলো আটক করা হয়।

ছবি : সংগৃহীত

সেই কনটেইনারে আছে কোকেন

১৮৫ কেজি সূর্যমুখী তেলের এক-তৃতীয়াংশই কোকেন!

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ও চট্টগ্রাম

সূর্যমুখী তেল মেশানো নিয়ে বলিবিরহা থেকে আনা সেই কনটেইনারগুলোর মধ্যে কোকেনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। গত ৯ জুন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এসব কনটেইনার জব্দ করা হয়েছিল। এই তিন মাসজুড়ে অস্তিত্ব আসে থাকা অবস্থায় কথা হলেও প্রাথমিকভাবে একটি কনটেইনারে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শনাক্তকারি পরীক্ষায় কোকেনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তবে কোন কনটেইনারে কতটুকু কোকেন আছে, তা এখনো নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কাস্টমস। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

▶▶ পূর্ব ১১ ক. ১

সেই কনটেইনারে আছে কোকেন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

৮. অধিকন্তু, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সূত্রও দাবি করছে বলিভিয়া থেকে আগত একটি চালানে কোকেন আছে। বর্তমানের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানা চুক্তির আওতায় গোয়েন্দা তথ্যাদির বিনিময় হয়। এসব তথ্যাদি যতো বিনিময় হবে ততো অপরাধী চক্র নিয়ন্ত্রণে থাকে। বর্তমানের অনেক অপরাধের ধরন ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। এক দেশে পরিকল্পনা হয়, আরেক দেশে পেমেন্ট হয় এবং অপরাধটি সংঘটিত হয় অন্য দেশে। এখনকার আন্তমহাদেশিয় অপরাধের এই চরিত্রের কারণে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান জরুরি। পুলিশের জন্য যেমন ইন্টারপোল, তেমনি কাস্টমস এর জন্য ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (ডব্লিউসিও) এর গোয়েন্দা সংস্থা রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স লিয়াজোঁ অফিস (রাইলো)। পাশাপাশি দেশিয় রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের মধ্যেও এসব যোগাযোগ হয়। এসব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যও কাস্টমস গোয়েন্দার সন্দেহের মাত্রা যোগ করেছে।

এতো তথ্য ও বিশ্লেষণ সত্ত্বেও যখন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেমিস্ট কোকেন নেই মর্মে প্রত্যয়ন করলেন, তখন এটি কাস্টমস গোয়েন্দার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিলো। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানও একমত হলেন আমার সন্দেহের ভিত্তির সাথে। নমুনা ঢাকায় পুলিশ প্রহরায় আনা হলো ট্রেনে করে। সিএমপি এবিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। বিসিএসআইআর রাষ্ট্রীয় উন্নততর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার হিসেবে বিবেচ্য। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলাম। বোঝালাম যে নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে তার রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব। একটি ডিও লেটার লিখলাম। একইসাথে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর মহাপরিচালককেও একই অনুরোধ করা হলো। তাদের মহাখালিতে অবস্থিত ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিজে এই পরীক্ষার আয়োজন করলেন তিনি। বিসিএসআইআর হতে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো। তাতে বলা হলো ১৩টি নমুনা পরীক্ষার মধ্যে ১টি (৯৬ নং) ব্যারেলের নমুনায় কোকেনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। পরীক্ষার সময় সার্বক্ষণিকভাবে এই দপ্তরের উপপরিচালক জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেমিস্ট্রিতে অনার্স ও মাস্টার্স পড়েছেন। তিনি বিষয়টি বুঝেন বলেই তাকে নিয়োজিত করা হয়েছে। তিনি জানালেন, কোকেন টেস্টটি বিশেষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে। একাধিকবার ঐ নমুনাটি টেস্ট করার পর তারা নিশ্চিত করেন এতে কোকেন আছে। ঐ একই নমুনা মহাখালির ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবেও পরীক্ষা করা হয়। এতে একই ধরনের রিপোর্ট এসেছে। তবে ল্যাবের সীমাবদ্ধতার কারণে কোকেনের প্রকৃত পরিমাণ কতো তা তারা নির্ধারণ করতে পারেননি। এর জন্যে ইতোমধ্যে ইউএনওডিসি (ইউনাইটেড নেশন্স অফিস অন ড্রাগস এ্যান্ড ক্রাইম)-কে অনুরোধ করা হয়েছে। তারা খুব শীঘ্র সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছে।

নমুনা তোলা ও লিখিত রিপোর্ট আসতে সঙ্গত কারণে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। রিপোর্ট আসার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তা প্রকাশ করলে সারা দেশে আবার বিষয়টি সামনে চলে আসে। বাংলাদেশ কি মাদক চোরাচালানের নিরাপদ রুট হয়ে উঠছে? এতে দেশের নিরাপত্তা কি বিঘ্নিত হচ্ছে না? বন্দর কি অরক্ষিত? ধরা পড়া কোকেন এই কি প্রথম? বাংলাদেশের জন্য এই কোকেন কতখানি বিপজ্জনক? পরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পর মিডিয়াগুলো সরব হয়। বিভিন্ন চ্যানেলে আয়োজিত হয় টক শো। পত্রিকায় বিশেষ প্রতিবেদনও চোখে পড়ার মতো।

যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তা অত্যন্ত যৌক্তিক মনে হয়েছে। কারণ অতীতে এবিষয়ে তেমন খোলামেলা আলোচনা হয়নি। এসব আলোচনা অনেকটা ধারণা থেকে, অনেকটা তথ্যভিত্তিক ও খানিকটা বিশ্লেষণধর্মী। এই চালান কি প্রথম? এর উত্তরে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ায় কোকেনের চালানটি এসেছে তা অভিনব। একইসাথে ধরার প্রক্রিয়াটাও কিন্তু অভিনব। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আলোকে কাজ করে। একদিকে বাণিজ্য ও ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য 'ট্রেড ফেসিলিটেশন' করা অগ্রাধিকার। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই এটি প্রয়োজন। অন্যদিকে, এর আড়ালে যেনো কোন অসাধু চক্র সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাও আবশ্যক। এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় ঝুঁকিপূর্ণ কার্গোর উপর। যেমন একটি চালান দীর্ঘদিন বন্দরে পড়ে আছে অথচ কেউ এর মালিকানা দাবি করছে না, অথবা রিফাইনারি না থাকা সত্ত্বেও ক্রুড ভোজ্যতেল আমদানি হয়েছে। অন্যদিকে, যে দেশ থেকে কখনো কোন তেল আমদানি হয়নি, সেই দেশ থেকে তা আমদানি হয়েছে।

একইসঙ্গে, এলসি ছাড়া চালানটি এসেছে। এমন কতিপয় মানদণ্ডে যে কোন চালান 'রেড চ্যানেল' এ বিশেষ পরীক্ষা সম্পন্নের নির্দেশনা দেয়া আছে। আরেকটি বিষয় হলো, বর্তমান কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক সরাসরি হস্তক্ষেপ ও চেক করাটার পদ্ধতিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চালানটির ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে।

এটি প্রথম ও শেষ কি না? বর্তমানে কাস্টমস প্রশাসনে এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড নামে অটোমেশন চালু আছে। সিস্টেম চেক করে দেখা গেছে, দক্ষিণ আমেরিকা হতে সানফ্লাওয়ার অয়েল অতীতে আসেনি। সুতরাং তেলের ভেতরে মিশ্রিত অবস্থায় এই চালানটি প্রথম, এটি বলা যায়। অন্যদিকে, এই চালানটিতে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হলেও তা আবার অভিনব পদ্ধতিতে ধরা হয়েছে। যেহেতু এই চালানে শত শত কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং এই বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই রুট সম্পর্কে সবাই এখন অবগত, তাই ভবিষ্যতে এই পদ্ধতিতে কোকেন আসা বন্ধ হবে, এটিও ধরে নেয়া যায়। বিনিয়োগকারীরা চট্টগ্রাম বন্দরকে অরক্ষিত মনে করেছিলো। কিন্ত তাদের এই হিসেব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই দেশ দুর্বল রাষ্ট্র নয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা নজরদারি চৌকস হওয়ায় তা ধরা পড়েছে। এখানে সুশাসনের একটি প্রতিফলন আছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদেশিয় এজেন্ট যেমন বের হবে তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তদন্তের মাধ্যমে বিদেশি এজেন্টদের পরিচয়ও বেরিয়ে আসবে। এতো বড় চালান যেহেতু পশ্চিমা দেশের জন্যে আনা হয়েছে এমন ধারণা করা হয়, তাই ঐ সব দেশ হয়তো বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করবে। চালানটি বাংলাদেশের জন্যে আনা হয়নি এর প্রমাণ কী? এর উত্তরে বলা যায়, চালানটি তেলের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় আসায় তা থেকে কোকেন আলাদা করে পাউডার আকারে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উন্নত ও আধুনিক মেশিনারিজের প্রয়োজন। এসব মেশিনারিজ সহজলভ্য নয় এবং তার জন্য অনেক বিনিয়োগের প্রয়োজন। এজাতীয় উন্নত শিল্প বা প্রযুক্তি বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে স্থাপন করা সম্ভব কি না তা ভেবে দেখা যায়। অন্যদিকে, কোকেনের মূল্য অত্যধিক। এদেশে ড্রাগস ব্যবহারকারীদের সংখ্যা কম নয়। তবে এদের অধিকাংশ ইয়াবা ও ফেনসিডিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ এগুলো যেমন সহজলভ্য তেমনি দামেও কম। কোকেনের দাম বেশি হওয়ায় তা সাধারণ ব্যবহারকারীদের সাধ্যের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সম্প্রতি যেসব মাদক ব্যবহারকারীদের আইনের আওতায় এনেছে তাদের মধ্যে কোকেনে আসক্তদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। এই বিবেচনায় আলোচ্য চালানটি ঐসব দেশের জন্যে আনা হয়েছে যেসব দেশে এর চাহিদা ও ব্যবহার আছে। যেমন এক হিসেব মতে, আমেরিকাতে দুই মিলিয়নের বেশি লোক এই কোকেনে আসক্ত। পশ্চিম ইউরোপের দেশেও এর চাহিদা ব্যাপক। কানাডাতে এর মধ্যে অনুরূপ ৩১০ কেজির চালানটি ধরা পড়েছে। এসব দেশের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহারের জন্য আনার ধারণা উড়িয়ে দেয়ার নয়।

চালানটির সাথে নিরাপত্তার বিষয়টিও জড়িত। কয়েকভাবে এই কোকেন বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারতো। **প্রথমত,** এই চালানটি ধরা না পড়লে ট্রানজিট অবস্থায় পশ্চিমা দেশে প্রবেশকালে আটক হলে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিলো। কারণ বাংলাদেশের অনেক পণ্য ঐসব দেশে রপ্তানি হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজরদারি দুর্বল হওয়ার অজুহাতে ঐসব দেশে এসব রপ্তানি পণ্যাদির উপর বাড়তি পরীক্ষা ও ধাপ তৈরি হতো। এটি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য চাপের সৃষ্টি করতো।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ট্রানজিট রাষ্ট্র হলেও মাদকের ধর্ম হলো যে সব রাষ্ট্রের উপর দিয়ে এসব মাদক পাচার হয় সেসব দেশেও চুয়ে-পড়ার মতো মাদকাসক্তের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। এতে ঐ পণ্যের প্রতি ঐসব ব্যবহারকারীদের সমর্থন যোগায় এবং তা পাচার নির্বিঘ্ন করত সাহায্য করে। এসব ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রথমে বিনামূল্যে বা কম মূল্যে বিতরণ করে আসক্তির সংখ্যা বাড়িয়ে চাহিদা সৃষ্টি করার প্রয়াস থাকে। আমরা জানি, ব্রিটিশ আমলে এদেশে চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য বিনামূল্যে চা বিতরণ করা হয়। পরে চাহিদা সৃষ্টির পর বিটিশ চা ব্যবসায়ীদের জন্য বাজার উন্মুক্ত হয়।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার উদ্বেগ হলো, এই চালানটিতে শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এটি সাধারণ ব্যবসায়ী বা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। যে প্রক্রিয়ায় আনা হয়েছে তা সংঘবদ্ধ গ্রুপ বা চক্র ছাড়া সম্ভব নয়। যারা এর সাথে জড়িত তারা নিশ্চয় শুভ শক্তি নয়। এদেশের এজেন্ট যারা আছে তাদের কোন না কোনভাবে এই অশুভ শক্তির সাথে সংশ্লেষ

রয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, জঙ্গিবাদ ও অপরাধ বর্তমানে একে অপরের পরিপূরক। জঙ্গিবাদ টিকে থাকার জন্য অস্ত্র কেনা ও লোক নিয়োগ করার জন্য অনেক দ্রুত টাকার প্রয়োজন। তাই তারা নানা ক্রাইমের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।[৩] আফ্রিকান সাব-সাহারান দেশসমূহে অনেক জঙ্গিগোষ্ঠি আছে যারা দক্ষিণ আমেরিকা হতে আনীত কোকেন উট ও নানা বাহন ব্যবহার করে পশ্চিম ইউরোপে তা পাচার করে। এর বিনিময়ে তারা অনেক টাকা আয় করে যা তাদের জঙ্গিবাদকে টিকিয়ে রাখছে। বাংলাদেশে যে চালানটি এসেছে তার পেছনে কে আছে তার উৎস সন্ধান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ এতো বড় বিনিয়োগ ও এর লাভের অংশীদার কারা, তাদের যোগসূত্র কোথায় তা বের করাটা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরি।

পরিশেষে, কাস্টমস গোয়েন্দা কর্তৃক কোকেনের চালানটি উদ্ধার ও সাথে সাথে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যেমন সুনাম রক্ষা হয়েছে, তেমনি এই দেশ যে অরক্ষিত এবং নিরাপদ রুট নয় তা আবার প্রমাণিত হলো। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এই উদ্ধারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এতে আত্মতুষ্টিতে থাকা সমীচীন হবে না। গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ও সমন্বয় আরো জোরদার করা প্রয়োজন। এই চালানটি আটকের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের ছাপ আছে। একে আরো এগিয়ে নেয়া দরকার। অন্যদিকে, কাস্টমস গোয়েন্দার ও কাস্টমস প্রশাসনের সক্ষমতার উপর জোর দেয়াটাও জরুরি হয়ে পড়েছে। কাস্টমস প্রশাসনে মাদকবিরোধী একটি শক্তিশালী ইউনিট তৈরি করা দরকার। এক্ষেত্রে ডগ স্কোয়াড, উন্নততর কেমিকেল ল্যাব সৃষ্টি এবং যেখানে ল্যাব নেই সেখানে দ্রুত ল্যাব তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। এসব ল্যাবে নানা কেমিকেলসহ মাদকদ্রব্যও পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। কাস্টমসের রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট এর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া ও এর জন্য আইন, লজিসটিকস, জনবল ও বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাটা আবশ্যক হয়ে উঠেছে। শত শত কোটি টাকার কোকেনের চালানটি উদ্ধারের মধ্য দিয়ে এই বিষয়গুলো এখন সামনে চলে এসেছে।

- লেখক **ড. মইনুল খান**, মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

[৩]শেলি লুইস, ২০০৬

এলেবেলে

আনোয়ার সেলিম

পোশাক সত্যিই ম্যাটার করে। সর্বত্র পোশাকের জয়-জয়কার। অন্তঃসার কিছু থাকলো কি থাকলো না সেটা আজকাল কেউ দেখেনা। সাইনবোর্ড আর বিজ্ঞাপনের যুগে আসল-নকল, খাঁটি-ভেজাল সব একাকার। পোশাক যে ম্যাটার করে সেটা নতুন কথা না। শেখ সাদীর পোশাক স্যাটায়ার গল্প তো সবার জানা। তখনকার মানুষের পোষাক অপশন বেশি ছিল না। অপশন এখন হাজারে হাজারে। পোশাক অবশ্য দরকার আছে। একেবারেই পোশাকহীন-নাঙ্গা মানুষ! অসভ্যতা! আমরা তো আর পশুপাখি না। জন্মের সাথে সাথেই মানব শিশুকে একখণ্ড কাপড়ে ঢেকে দেয়া থেকেই শুরু মানবের পোশাকি জীবন। পথ শিশুর প্রথম পোশাক আর রাজশিশুর প্রথম পোশাক দুটি মানবের মধ্যে প্রথমেই অনতিক্রম্য বিভাজন তৈরি করে দেয়।

আমরা আসলে প্রত্যেকে বিভিন্ন ধরনের হাজারো রকমের পোষাক পরে আছি। একেকজনের গায়ে কত্তোরকমের পোশাক! কাপড়-চোপড়, জামা-জুতা, ঘড়ি, চুল দাঁড়ি গোঁফ, টুপি, আলখেল্লা, পৈতা, লাঠি, সিঁদুর, ক্রস, গাড়ি, বাড়ি, পারফিউম, চশমা, গ্যাজেট, ব্যাগ, ধুতি, পাজামা, লুঙ্গি, ব্যক্তিগত চাকর, পদ, পদবি, টাইটেল, প্রেমিক, পিতা, বিবাগী, নেতা, অভিনেতা, সঙ্গী পুরুষ বা নারী। অগুনতি পোশাক। আমাদের জীবনযাত্রা দ্রুত বদলাচ্ছে আর গায়ে চাপছে অসংখ্য পোশাক। হাজারো পোশাকের আড়ালে দ্রুত চাপা পড়ছে মানুষ। মানবিক মানুষ।

আমার একখানা বেশ পুরোনো জরাজীর্ণ পারিবারিক বাহন আছে। আমি সচরাচর নিজেই সেটা ড্রাইভ করি। মজার ব্যাপার হচ্ছে ঐ গাড়িটা নিয়ে বের হলেই ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল দুই হাত উঁচু করে হুইসেল বাজিয়ে হৈ হৈ করে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্রিমিনাল ধরতে পেরেছেন এমন উত্তেজিত ভাব নিয়ে গাড়ি সাইড করায়। জানালায় থাপ্পড় দিয়ে কঠিন নির্দেশ 'গাড়ির কাগজ বের করেন'। আমিও গোবেচারা, অপরাধী ভাব করে কাগজ বের করে দিই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ দেখে, আমাকে দেখে তারপর সেগুলো পাচার করে দেয় আয়েশি ভঙ্গিতে মোটরসাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে থাকা সার্জেন্টের হাতে। আমার আপদমস্তক নিরীক্ষণ শেষে নির্দেশ 'স্যারের সাথে দেখা করেন।'

সার্জেন্টের কাছে গিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করি 'স্যার কোন সমস্যা?' আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে কনস্টেবলের প্রতি নির্দেশ 'এই! গাড়ি চেক করো'।

জ্ঞানমতে আমি সিগন্যাল অমান্য করিনি। ট্রাফিক আইনের কোন বিচ্যুতিও ঘটাইনি। আমার পাশ দিয়েই একের পর এক চকচকে নতুন গাড়ি হুস্ হুস্ করে চলে যাচ্ছে। সিগন্যালও অমান্য করছে কেউ কেউ। এটা কোন ব্যাপার না। বিষয়টা আমার কাছে কৌতুক এবং কৌতূহলের। একদিন শুধু ক্ষেপে গিয়েছিলাম বাচ্চার স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে।

সমস্যা আর কিছু না আমার গাড়ির চেহারা, আমার নিজের চেহারা, পোশাক। সাধারণভাবে এ ধরনের গাড়িতে অপরাধীরা চলাফেরা করে বলে পুলিশের বিশ্বাস। আমার এক বন্ধু, ভার্সিটির শিক্ষক। বেচারা এফোর্ড করতে পারে না বলে অতি পুরোনো একটা স্টারলেট চালায়। ইজ্জত রক্ষার জন্যে পাবলিক বাস, সিএনজি রিকশায় চড়তে পারে না। প্রায়শ তাকে একই ধরনের হেনস্থার শিকার হতে হয় বলে একদিন দুঃখ করছিল।

সমাজে গুরুত্বপূর্ণ একজন অপরাধীকে একদিন দেখলাম সোনারগাঁও হোটেল থেকে বেরুচ্ছেন। পরনে জমকালো পোশাক। চার পাঁচ বছর আগে প্রায় কপর্দকশূন্য এই লোকটিকে আমি চিনতাম। পিক আপ পয়েন্টে দাঁড়ানো। একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো- 'ভাই কেমন আছেন? চিনতে পারছেন?' ইতোমধ্যে সামনে একটা কালো নতুন ল্যান্ড ক্রুজার এসে দাঁড়িয়েছে। গর্বিত ভাব করে বললেন-'নতুন কিনেছি, প্রায় কোটি টাকা দাম পড়েছে। কেমন হলো বলেন? আপনি তো আবার গাড়ি-টাড়ি ভালো বোঝেন।'

আমার অনেক দোষের মধ্যে একটা বড় দোষ হলো বাড়াবাড়ি রকমের সোজাসাপ্টা কথা বলে ফেলি। এর হ্যাপা কম না। বিশেষ করে সরকারি চাকুরের সোজা কথা রীতিমতো অর্বাচীন ঔদ্ধত্য। একই কারণে গল্প লিখতে গেলে গল্পের ভেতর সত্য বেরিয়ে আসে। বিপত্তি ঘটায়।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা 'তেল' এবং 'উৎকোচ' এর বেশ কিছু উপকারিতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। রাষ্ট্র একটি যন্ত্রবিশেষ। এর মুভিং পার্টসগুলোকে সচল রাখতে তেল, গ্রিজ এর প্রয়োজন আছে বৈকি! ব্যক্তি চালকের প্রণোদিত হবার ব্যাপার আছে। 'তেল', 'উৎকোচ'এর বিষয়টি অবশ্যই সিরাতুল

মোস্তাকিম না। সোজাসাপ্টা হওয়ার ব্যাপারে তাই এখানেও বিপত্তি।

আমার বন্ধু দম্পতি দেশের নামকরা প্রথম সারির স্থপতি। আছে আন্তর্জাতিক বহু সুনাম ও স্বীকৃতি। একটা কনফারেন্স শেষে ইন্ডিয়া থেকে ফিরছিলেন। আমাদের কাস্টমস্-এর গ্রিন চ্যানেলে ব্যাগে চকের দাগ পড়লো। নির্দেশ হলো ব্যাগ খোলার। চেক করা হবে। ভেতরে শাড়ি কাপড় আরো কী কী সব নিষিদ্ধ জিনিস আছে সন্দেহ। কলকাতা ফেরত বলে কথা। তাঁরা বারবার বলছে ট্যাক্স দেবার মতো অথবা নিষিদ্ধ কোন কিছু তাদের কাছে নেই। ফ্লাইট এমনিতে ডিলে হয়েছে। জরুরি একটা মিটিং তাদের অপেক্ষায়। অথচ এই ব্যাগ চেক করার জন্যে তাদেরকে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে। নিষ্কৃতি দেয়ার জন্যে অনুনয় বিনয় করে ব্যর্থ, হতাশ, বিরক্ত হয়ে ব্যাগ খোলার অনুমতি দিল। একজন কাস্টমস কর্তা যেনতেনভাবে ব্যাগ খুলে ফেলে ভেতরের মালামাল ঘাটাঘাটি করে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ফেলছে দেখে স্ত্রী স্থপতি বন্ধুটির মেজাজ গেল সপ্তমে চড়ে। অধিকন্তু তাকেই আবার ব্যাগ গুছিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বিশেষত ব্যাগে থাকা তাঁর প্রাইভেট এটায়ার্সে হাত দেয়ায় তাঁর চূড়ান্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তিনি তাঁর হাতের আঙুল অফিসারের সামনে বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'বলেন তো আমার আঙুলে এটা কি'? অফিসার থতমত খেয়ে কিঞ্চিৎ সামলে নিয়ে বলল 'কেন! এটা আংটি'। বন্ধুটি জিজ্ঞেস করল 'বলেন তো এটা কীসের তৈরি আংটি?' অফিসার বলল, 'ইমিটেশন'।

বলেন তো এর দাম কত?

অফিসার নির্বোধের মতো আমতা আমতা করছে। প্রশ্ন না শোনার ভান করছে।

বন্ধুটি বলল, এটার দাম পনের লক্ষ টাকা। প্লাটিনামের তৈরী, হীরা বসানো। এর ওপর ট্যাক্স থাকলে বলেন- দিয়ে দেবো। নয়তো খুলে দিচ্ছি রেখে দেন। আপনারা আসল জিনিস চেনেন না। মেয়েদের আন্ডার গার্মেন্টস ঘাটাঘাটির মতো অশালীন কাজ শিখেছেন। আমাকে তখুনি ফোন করে বলল, তোমার লোকদের বলো ঐ ব্যাগ রেখে দিতে। জরুরি কাজ আছে আমার। ওটা

ফেলে রেখে যাচ্ছি। আমি তাকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করে সাথে সাথে সহকারী কমিশনারকে ফোন করে বললাম 'ব্যাপারটা একটু দেখো'। সহকারী কমিশনার গিয়ে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আপাত শান্ত করে বিদায় করেছে।

যে পোশাক নিয়ে কথা বলছিলাম। বিপত্তির কারণ সেই পোশাক। সম্ভবত বন্ধুটির চুল-চেহারা। কলকাতার যাত্রী। মহিলার ব্যাগে একগাদা শাড়ি তো থাকবেই। আর কী লাগে!

আমি অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে যখন এয়ারপোর্টের দায়িত্বে ছিলাম তখন অফিসারদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে কাউকেই সন্দেহ করতে হলে প্রথমে বিনীতভাবে তাঁর পাসপোর্টটি দেখতে চেয়ে খোশগল্প শুরু করতে। খুব সাধারণ সামান্য ইন্টেলিজেন্স খরচ করতে হয়। পাসপোর্টে যাত্রীর নাম পেশা, বয়স ঠিকানার সাথে সাথে বিদেশ গমনাগমনের বৃত্তান্ত থাকে। খুবই সহজ হিসাব। আমি নিজে গ্রিন চ্যানেলে দাঁড়াতাম মাঝে মাঝে।

Good morning/Evening/Afternoon sir, স্লামালাইকুম (যথাপ্রযোজ্য) May I have your passport please? Where are you from? On a holiday? Business? Conference? How was your trip? অনেক দিন পর দেশে আসছেন? ওখানে তো এখন অনেক ঠান্ডা। কত দিনের জন্যে আসলেন। কেমন লেগেছে ওখানে। সাধারণ ছোট্ট আন্তরিক আলাপচারিতার ভেতর পাসপোর্ট চাক্ষুস স্ক্যান করা হয়ে যেত। তড়িৎ চাহনিতে ব্যাগের আকার, যাত্রীর অবয়ব, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, Gesture লক্ষ করা হয়ে যেত।

একবার এক সন্দেহভাজনকে সালাম দিয়ে হ্যান্ডশেক করতে গেলাম। অমনি শুরু হলো কাঁপাকাঁপি, তোতলানো, ঘামতে শুরু করা। জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার কোত্থেকে আসছেন।' 'কাঁপতে কাঁপতে বলল 'বরিশাল' থেকে! আর কিছু কি দরকার হয়! বললাম আপনি শান্ত হয়ে বসে চা খান। আর ব্যাগটা আমরা একটু দেখবো। পাওয়া গিয়েছিল বিপুল ইন্ডিয়ান ফেক কারেন্সি আর নিষিদ্ধ ওষুধ। দেখা গেল এক মাসে তিনবার করাচি এবং দোহা আসা যাওয়া করেছেন নতুন পাসপোর্টে।

এয়ারপোর্টে প্যাসেঞ্জার কাস্টমস হ্যান্ডলিং-এর বিষয়টি ছোট্ট পরিসরের। বাণিজ্যিক আমদানি/রপ্তানিতে মারাত্মক ঝুঁকি এবং ডিটেকশন খুব সাধারণ কিছু জ্ঞান খরচ করেই সম্ভব। তার ওপর চাই সদিচ্ছা এবং পদ্ধতিগত কৌশল। রিস্ক এসেসমেন্ট/ম্যানেজমেন্ট-এর প্রায়োগিক কৌশল, ঝুঁকির

ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা বেশি দরকার। Information/IT System এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্তরালে যেটা থাকতে হয় সেটা Human Intelligence। অন্যথায় বায়বীয় পুস্তকের ভাষা, কিছু Jargon আওড়ানো নিতান্তই আই-ওয়াশ পাণ্ডিত্য ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রসঙ্গত: স্থপতি যুগল এই সেক্টরে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সর্বোচ্চ আয়কর ও মূসক প্রদান করে বলে দাবী করেছেন। জানতে চেয়েছে ভূষি মালের ইম্পোর্টারকে সি আই পি মর্যাদা দেয়া হয় উৎসে কেটে রাখা করের পরিমাণের ভিত্তিতে। প্রফেশনালদের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ কর দেয় (স্থপতি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিল্পী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট) তাদের কেন সম্মানিত করা হয় না। অথচ এই এলিট গোষ্ঠির কর ফাঁকির প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেলে তাদের কমপ্লায়েন্স বাড়তো এবং বিমানবন্দরে নিজেদের ঐ হেনস্থা হতে হতো না।

গল্পের পাদটীকা: স্ত্রী স্থপতি বন্ধুটি জানালো বাসার কাজের বুয়াকে দিয়ে ঐ প্রাইভেট এটায়্যারগুলো সে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। আর আমাকে প্রশ্ন করেছে- আচ্ছা তোমরা তোমাদের অফিসারদেরকে মানুষের ব্যাগ ঘাটাঘাটির সময় হাতে গ্লাভস পরতে বলোনা কেন?

- লেখক **মো. আনোয়ার হোসাইন,** কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা

For a Brighter Economy...
For a Brighter Bangladesh
Customs Intelligence

Advance Rulings as a Trade Facilitation Measure

Dr. Mohammad Abu Yusuf

Abstract: This article is a conceptual paper on Advance Ruling (AR) and its possible benefits. It highlights the legal basis, coverage and the benefits of AR. The procedure of requesting for AR, the formation of an AR unit at the National Board of Revenue (NBR), the process of making AR decision, validity of advance ruling, publication of ARs and the situations of modifications or revocation of an AR have been proposed in this paper. The paper details on the role of AR in facilitating trade followed by concluding remarks.

Introduction: An advance ruling (in the context of the Trade Facilitation Agreement) 'is a written decision provided by a Member to an applicant prior to the importation of a good covered by the application that sets forth the treatment that the Member shall provide to the good at the time of importation with regard to (i) the good's tariff classification, and (ii) the origin of the good' (TFA 3: 9.a.). In essence, the Article requires WTO Members to issue advance rulings regarding the tariff classification and the (non-preferential) origin of goods[1] (Hans-Michael Wolffgang and Edward Kafeero, 2014). In addition, pursuant to TFA 3: 9.b., WTO Members are encouraged to issue advance rulings for other areas such as customs valuation and requirements for relief or exemption from customs duties.

The objective of Advance ruling provisions is to set up a transparent and formal process whereby exporters and importers obtain, upon request, rulings from Customs administrations prior to the transaction. The ruling thus obtained is legally binding time bound ruling on the Customs authority as well as, in some countries, the trader. Moreover, as advance rulings (except confidential ones) are often published on Customs website, they are accessible and easily searchable by all Customs officers at all ports of entry. This will allow for great consistency and certainty in decision-making.

Advance Ruling GAPS in Current Customs Act (Act of 1969)

A close examination of the current situation in terms of Standard 9.9 of the WCO Revised Kyoto Convention and Article 3 of the WTO TFA reveals that the present customs legislation (the Customs Act, 1969) has provisions of prior ruling on tariff classification (duty rates), valuation methods of any goods or 'any other Customs matter'. Under Section 219A of the Customs Act, a Customs ruling must be made within thirty working days of the receipt of the application, and this Customs ruling is binding upon the concerned persons/applicants and the Customs officers. Copies of such advanced rulings are made public, as these are circulated to different Customs offices. These are publicly available, as anyone can get a copy (Section 204A & 215A of the Customs Act, 1969). However, Section 219A attempts to address only the RKC standards and not those under the TFA. It does not clearly refer to the term 'advance ruling', and merely mentions 'customs ruling'.

[1]The *Agreement on Rules of Origin* aims at harmonizing the non -preferential rules of origin.Such non-preferential origin of goods is necessary in the application of: most-favoured-nation treatment under Articles I, II, III, XI and XIII of GATT 1994; anti-dumping and countervailing duties under Article VI of GATT 1994; safeguard measures under Article XIX of GATT 1994, origin marking requirements under Article IX of GATT 1994; and any discriminatory quantitative restrictions or tariff quotas. Another purpose of non-preferential rules of origin is to determine country of origin *for trade statistics* and government procurement. (Source: WTO Agreement on Rules of Origin, Article 1).

The new Customs Act (to be passed in 2015) has included the AR ruling provision to incorporate both the RKC and TFA provisions on AR. As per Sec 275 of the New Customs Act, 2015 (to be passed soon as Act), the NBR will establish an Advance Ruling programme. The NBR will need to formulate Rules on Advance Ruling to operationalise the envisaged AR program. The procedures of AR will be completed according to the rules to be framed under the authority of Sec 275. Advance rulings must be requested in accordance with the procedures described in the said rules.

The obligation of the NBR

The national Board of Revenue will have to publish, at a minimum:

a. the requirements for the application for an advance ruling, including the information to be provided and the format;

b. the time period by which it will issue an advance ruling; and

c. the length of time for which the advance ruling is valid.

These obligations are imposed on Members by paragraph 6 of Article 3 of the WTO TF Agreement.

Coverage

The AR provisions of the WTO TF agreement and RKC are useful references to determine the scope of AR. WTO TF provision states that a customs administration would be expected to provide, at a minimum, rulings *on tariff classification; valuation; duty drawback, deferral, or other* relief; quota application; and rules of origin. Advance ruling, however, can be issued on issues beyond the WTO minimum.

However, as per Bangladesh Customs Act Sec 275 provisions, advance rulings may be issued on Tariff classification and Origin of goods at the request of the economic operator. Then, as resources allow and as customs gains experience and has the legal, regulatory, and procedural capacity to do so, the NBR may expand its advance rulings programme to other areas.

AR Unit to be designated by the NBR.

The National Board of Revenue, may, by notification in the official Gazette, form an Advance Ruling Unit. This Unit may be located at the NBR. This unit will house the records, documents and all other relevant materials related to AR.

Constitution of AR Authority/Unit.

The Advance Rulings Unit may consist of a Chair who is the Member (Customs: Policy) and five members of the Bangladesh Customs and the law officer of the NBR. This Unit will be responsible to make AR decisions thorough consultation, analysis, and examination of all the information, documents and other relevant issues. If necessary, the Authority may hear the applicant and listen to him before passing the decision.

The AR unit may be composed of 6 officials:

	AR Unit	Functions
Member (Customs: Policy):	Chairman of the AR Authority/Unit	Convene and chair the final review meeting before the AR is finalised and issued
A specialist official/technical staff (Customs classification)- DC to Commissioner	Member	Work in the AR team to contribute to Tariff classification matters.
A specialist official/technical staff in Origin Matters	Member	Work in the AR Unit as a subject matter expert on determination of country of origin issue
First Secretary (Customs: Policy)	Member	Work in the AR Unit to operationalize Advance Ruling Program.
Second Secretary (Customs: Policy)	Member Secretary	Every requisition, direction, letter, or notice to be issued on behalf of the Authority, shall be signed by the Secretary or officer authorized by the Chairman.
A representative from Chittagong Custom House	Member	Function on the AR committee on Customs classification/origin and other matters
Law officer/Legal staff	Technical member	Legal vetting (examination) of the text of Advance Ruling to be issued.

Selection of officials for the AR Unit: In order to implement the provision of advance ruling, an advance ruling unit will be required at the NBR. The Unit may be staffed with officials who will be selected based on their understanding and expertise in in understanding and applying complex international standards, such as the GATT Agreement on Customs Valuation, the Harmonized Commodity Description and Coding System and country-of-origin determination. Sound knowledge on tariff classification, valuation and country-of-origin matters and access to technical resources would help take good decisions and issue accurate rulings to make the AR system effective and facilitate trade.

In organising the AR unit, the best approach may be *to* co-locate the staff, *in the* in the AR unit *of the NBR* except the CCH representative. Clear and direct line of authority of all employees and offices involved in the advance ruling regime will have to be created. In this context, it seems relevant to mention that the advance ruling decision makers in the USA are located together. This helps bring great consistency, and managed outcomes. This single location also allows for cross-training of those employees issuing advance rulings, accessible research to paper files, and career development of employees.

PROCEDURE FOR SEEKING ADVANCE RULINGS

The AR application will be made as per the rules made under section 275 of the Customs Act, 2015 for issuing advance ruling. The following basic steps need to be followed by an applicant:

Filing of an AR application

An application for an AR has to be submitted to the Chair, AR Unit [who is Member (Customs: Policy)] in duplicate in prescribed format (to be developed for AR application) by an exporter, importer or any person with a justifiable cause or a representative thereof in person or may be sent by registered post / courier service to the AR Unit. Necessary documents have to be attached/annexed with the filled in prescribed application form. The following information has to be clearly stated in the AR application:

(a) An adequate description of goods to be imported including quantity/volume, package, brand (if any), supplier, country of origin and proposed HS classification.

(b) The name (s) of the port (s) in which the good will be entered (if known)

(c) A description of the transaction; for example, a prospective importation (merchandise) from country x, y, or z

(d) A statement that there are, to the importer's knowledge, no issues on the commodity pending before any court/tribunal.

(e) LC number and Lien Bank name.

(f) The question of law or fact on which advance ruling is sought

Issues on which an advance ruling may be sought

As per Customs Act 2015, **Advance** rulings can be sought in respect of –

a. Classification of any goods under the Customs Act, 2015.

b. Determination of origin of goods.

It is to be noted that usually, an AR request does not include more than one issue (e.g. tariff classification, country of origin) and one item. However, in other countries, usually a single request contain one item for classification.

Information to be stated in an AR application for Classification: The tariff classification determines the applicable duty rate and eligibility for various trade programs (e.g. to get tariff preferences) under a trade agreement. As classification depends on various factors and it varies according to the type of product involved, full disclosure will help determine proper classification. The following information will be helpful to determine appropriate HS codes.

As such these should be mentioned in the application for AR on Classification:

- A full and complete description of the good in its imported condition
- Constituent materials (composition of the item)- chemical composition, material composition,
- Brochures, pictures
- Form (i.e. powder, liquid)
- Product specification sheet[2]- Product information in a foreign language (other than English) should be translated into English/Bangla.
- The good's principal use in Bangladesh
- The commercial, common, or technical designation.
- Illustrative literature, sketches, digital photographs, flows charts etc.
- Printed literature and Chemical analysis
- Any other information that may assist in determining the classification of the good. Samples of the goods may also need to be provided if necessary.

Withdrawal of application

An applicant for AR may withdraw his application within 30 days from the date of filing the application, and thereafter at the discretion of the AR Unit. However, this does not preclude the applicant from withdrawing the application after the said period with the permission of the Authority.

Advance Ruling Decision

On receipt of the application for AR and other additional documents/information from the applicant as well as meeting/conference with the applicant (in applicable cases), the AR Unit may, after examining the AR request and all relevant information/documents, will either allow or reject the AR request. In taking decision for AR, the members of the AR unit (Under the leadership of the Chair) after careful examination and review of all information/documents will arrive at a decision. In arriving at the decision to issue AR, the AR unit, may (if necessary) consult field offices to ensure the accuracy of the decision. In taking the AR decision, the member secretary of the unit will coordinate with AR Unit Members and other officials outside the AR unit.

[2]Singapore Customs will evaluate and determine the full 8-digit HS code of the product. A Classification Certificate will be issued, indicating the applicant's/company's name and address, description of the product and 8-digit HS code of the product. The classification process may take up to 30 days, depending on the complexity of the product and the completeness of the information furnished. (Please note that classification rulings are only applicable for use within Singapore)
A fee of SGD 75.00 inclusive of GST will be charged for per good classification. Payment is to be made upon receiving the Billing Notification from Singapore Customs. The Billing which indicate the Bill Reference Number would only be generated upon receiving the complete submission of application form and supporting documents. The payment mode is via Inter Bank Giro (IBG), cash, NETS or credit cards.

Time required to issue an Advance Ruling

The WTO TF Agreement is accepted its Members to issue an advance ruling in *a reasonable, time bound manner* to an applicant that has submitted a written request containing all necessary information. However, there is no indication as to what time limit can be considered a reasonable time. The time limit to issue an AR varies from country to country. For example, the AR process in Singapore may take up to 30 days, depending on the complexity of the arrangement and the completeness of the information furnished while the AR Authority in India is required to pronounce advance rulings in writing within 90 (ninety) days of the receipt of a complete application. In line with other countries, the NBR may consider make rules to issue an advance ruling within 60 days[3] of the receipt of a valid application. However, in circumstances of exceptional nature, this time limit may be extended by 15 days.

As time is of critical importance because the substance of a ruling may affect the financial decisions of importers and exporters and because a timely advance ruling process promotes voluntary compliance by being clear, predictable, and transparent, Customs administration/NBR would strive hard to for timely issuance of advance rulings.

Binding Nature of an Advance Ruling Order

The Advance Ruling made by the Customs/Revenue authority is binding only-

a. On the applicant who had sought it;
b. On the Customs departments and all authorities subordinate to him.

It is binding in respect of the questions that have been raised in the application unless there is a change in law or in the material facts or circumstances on which the advance ruling is based. The NBR/AR Unit has the power to declare an advance ruling made by it void ab initio if it finds that such Ruling has been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation.

Duration of AR validity

The advance ruling shall be valid for a reasonable period of time after its issuance unless the law, facts or circumstances supporting the original advance ruling have changed. Usually, the AR is valid for one year. During this one -year -validity, it's not necessary to require an advance ruling again for any further delivery of the goods if the HS code of the goods remains the same. [This is Chinese Regulation]

Responsibility of AR for timely distribution of ruling: After the approval of the AR decision, the AR authority/AR (member secretary shall be responsible for timely issue/distribution of the AR decision to interested parties, including the requesting party (applicant), Customs Houses/LC stations, and NBR systems analysts. If the matter/issue of AR is not confidential (e.g. not valuation related), the AR decision may be communicated to importers, exporters, and agents.

Rectification of mistakes: The AR Authority, may, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any AR pronounced by it before such ruling has been given effect to. Such correction may be made *suomotu* or when the mistake is brought to the notice of

[3]The U.S.-Australia FTA obligates parties to issue rulings within 120 days, but the customs administrations have committed to providing rulings within 30 days.Similarly, Canada's commitment in the North American Free Trade Agreement (NAFTA) is to provide rulings within 120 days, but the Canadian Border Services Agency (CBSA) strives to provide rulings in a shorter period of time.

the Authority by the applicant or any Customs officer, but only after allowing the applicant and the official, a reasonable opportunity of being heard.

Publication of decisions: Within 90 days after issuing any AR decision relating to any import/export transaction, the NBR/Customs will publish the decision (except those that are treated confidential) in the Customs Website (or Bulletin, if any), preferably by means of an automated database using easily searchable criteria such as category, item description, tariff classification, and party to whom the ruling was issued. Rulings should be available to customs officials as well as eligible outside parties. Rulings on tariff classification that establish precedents and have been subjected to an intense review may be made available to importers/economic operators[4]. In publishing ARs, sensitive commercial information may be withheld, and no such information that would directly identify the client will be published.

However, Valuation Rulings (if it is brought under AR coverage by the NBR in future) should not be available for all outside parties. It may be made available only to the requester because they contain information on the requester's commercial and financial arrangements[5].

Modification of Advance Ruling: The issuing authority (E.g. NBR) may modify or revoke a ruling retroactively only if the ruling was based on inaccurate or false information. Before modifying the AR, the applicant should be given a reasonable opportunity of being heard. In this case, it is to be noted that the effective date of the modification or revocation may be delayed for thirty days (or a reasonable time period) from the time of final publication of the action so that parties have time to adjust their business processes to the change. And goods already *en route,* or "on the water" will be given the treatment they had expected under the original advance ruling. When a ruling is revoked or modified, the applicant should be provided written notice with the relevant facts and the basis for the decision.

Advance Ruling for Trade Facilitation

The main benefit for the importer/exporter (trader) is the legal guarantee that the decision mentioned in the AR will be applied.Advance rulings facilitate the declaration and consequently the release and clearance process, as the classification (or country of origin) has already been determined in the advance ruling and is binding to all customs officers for a period of time. It also provides certainty to the importer, or his or her representative, as to how goods are to be classified and thereby facilitates the documentation requirements for clearing goods at the border.The AR also helps the importers (Exporters) reap the benefits of efficiency and cost effectiveness by allowing them to make decisions early and make those decisions part of their manufacturing, importing, and business plans for all stages of business.

In sum, the AR offers the following benefits **for both governments and traders:**

- Enhance certainty, transparency and predictability of Customs operations; the trader finds certainty in the advance ruling because his (her) goods are entitled to the treatment set forth in the advance ruling until, if ever, the ruling is modified or revoked.

[4]In Canada, the policy content of advance rulings on tariff advice, or "tariff classification" that set a precedent may be published.
[5]Australia's Valuation advice rulings are available only to the requester on such ground.

- Speed up clearance of goods at the border;
- Ensure the fair and appropriate collection. For example, Japan Customs has implemented an 'Advance Ruling System' for correct import duty declaration and thus ensuring appropriate collection of duties and taxes. (Aoyama, 2008).
- Reduce disputes between Customs authority and traders on tariff, valuation and origin issues at the border;
- Help traders to be aware of the supporting documents they have to present to prove their claims on issues of classification, country of origin and valuation of the goods.

Advance rulings also provide comfort to the importers/exporters in the sense that he will be given the treatment set forth in the advance ruling at every Bangladesh port of entry.

Steps taken so far by the NBR

Bangladesh acceded to Revised Kyoto Convention (RKC) in **February 2013.** It is obligated to implement the provisions of RKC by 2016. As a member of the WTO, it is also obligated to implement the provisions of the WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) within the stipulated time. As such, the NBR has already taken initiatives to implement AR program in Bangladesh, one of the compulsions of both the RK and the TFA. A Working Group has been formed for establishment of an Advance Ruling Unit (Choudhury, 2015). The NBR has teamed up with the USAID BTFA team to implement AR. The BTFA project has already developed AR Guideline for NBR. The SRO to be issued to launch AR in Bangladesh Customs is being developed by USAID BTFA team. Technical assistance including providing training to officials will be given by the project. The NBR needs to conduct awareness/consultation meetings and outreach programs for the external stakeholders to make them aware about the requirements to request for AR and the benefits of the AR programme.

Conclusion

As advance ruling plays an important role in ensuring transparency, predictability, consistency and thelegal guarantee that the decision (communicated by customs before the import of goods) will be applied, the NBR is working with donor agencies to implement the programme successfully. The officials and the private sector would need awareness and training about the AR program. Considering the importance of the AR as a facilitation measure, the WTO trade facilitation agreement (Article 3) made it compulsory for its Members to issue an advance ruling. The WCO Revised Kyoto Convention [(RKC, GA §§ 1 (1.3), 6 (Guidelines), 7 (Guidelines) and 9 (9.4, 9.5, 9.6, 9.7] also emphasized advance rulings. Thus with regard to trade facilitation matters having bearing on Customs, the WTO and WCO have commonality and as such these two organisations may be seen as 'sister organisations.'

References

Aoyama, Y. (2008). Perspectives of customs in the 21st centur : from the experiences of japan customs, World Customs Journal, 2(1), 95-100

Choudhury, Waheeda Rahman (2015), Reform and modernisation of Bangladesh Customs *The Financial Express,* January 26, Dhaka.

Hans-Michael Wolffgang and Edward Kafeer(2014). Old wine in new skins: analysis of the Trade Facilitation Agreement vis-à-vis the Revised Kyoto Convention, *World Customs Journal,* 8(2), 27-38.

WTO Trade Facilitation Agreement.

WTO Agreement on Rules of Origin.

- Author **Dr. Mohammad Abu Yusuf** is a Member of BCS (Customs and Excise) Cadre. He is now a Deputy Secretary, currently Working as a Customs Specialist in the USAID BTFA Project.

Here we are for you... day and night

Customs Intelligence

বিমানবন্দরে কাস্টমস চেকিং: একজন যাত্রীর প্রস্তাব

মুহম্মদ জাকির হোসেন

ছোটবেলায় জার্নি বাই বোট, জার্নি বাই ট্রেন রচনা পড়ে এবং এগুলোতে চড়ে সে সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল। জার্নি বাই ট্রেন বললেই ঠক্কর ঠক্কর শব্দে সাপের মতো ট্রেন সবুজের বুক চিরে যাওয়ার দৃশ্য মনের মধ্যে উঁকি দিত। আবার জার্নি বাই বোট বললে মনের গভীরে ভয় জড়ানো উত্তাল নদী আর তার তীরে কৃষাণ-কৃষাণীর কর্মব্যস্ত পদচারণা নাড়া দেয়। কিন্তু জার্নি বাই প্লেন? ছোটবেলায় কোন বইয়ে জার্নি বাই প্লেন পড়েছি বলে মনে পড়ে না। সেটি হয়তো পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা ছিল না বলে লেখককুল তা বইতে দেননি। কী জানি, এমনও হতে পারে, লেখক বাহাদুরের হয়তো সে অভিজ্ঞতাই ছিল না।

তো আমার যখন সেই অভিজ্ঞতা হলো, তখন ভাবলাম, জার্নি বাই প্লেন বিষয়ে একটি রচনা লিখলে কেমন হয়? আমি আজ যা ভাবি, বুদ্ধিমানরা তা গতকাল করে ফেলে। পরেরদিন পত্রিকায় দেখলাম, একই ফ্লাইটের আরেক প্রফেসর যাত্রী সে বিষয়ে পত্রিকায় লিখে ফেলেছেন। পড়ে মনটা আরো খারাপ হলো। জার্নি বাই ট্রেনের শুরুতে ট্রেন আসতে কষ্টকর বিলম্ব হলেও শেষে থাকে আনন্দঘন পরিবেশ। জার্নি বাই বোটেও তাই। ঝড়ঝঞ্ঝা পার হয়ে সুখে শান্তিতে গন্তব্যে পৌঁছা। কিন্তু জার্নি বাই প্লেনে তো শেষটা সুখকর নয়, তাহলে সমাপ্তি টানবো কিভাবে? আমার জার্নি বাই প্লেন লেখার সাধ তাই কুড়ি বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

প্রিয় সহকর্মী অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর নাহিদার কঠিন-জটিল উৎসাহে শেষ পর্যন্ত লিখতে বসেই গেলাম। তবে জার্নি বাই প্লেন রচনা লেখার জন্য জার্নির শেষে যে আনন্দঘন দৃশ্যপট আঁকতে হয়, তা আজো হয়নি। তাই জার্নি বাই প্লেন রচনা লেখার সাধ বাদ দিয়ে জার্নির শেষ দৃশ্যপট কীভাবে আনন্দঘন করা যায় তা নিয়ে ভাবা যাক।

আমার কাছে যত ধরনের ভ্রমণ আছে, তার মধ্যে প্লেনের ভ্রমণই সবচেয়ে কষ্টকর। মানুষ প্লেন থেকে যখন মাটিতে নামে তখন সে মুক্তি খোঁজে কখন বিমানবন্দর থেকে বাইরে বের হবে। তিন ঘণ্টার জার্নি বাই প্লেনে ভিয়েতনাম হতে শাহজালাল বিমানবন্দরে নামা যায়, কিন্ত শাহজালাল বিমানবন্দরের সিকি কিলোমিটার ভবন থেকে বের হতে লাগে প্রায় সমান সময়। ইমিগ্রেশন শেষ করে ব্যাগেজ বেল্টের সামনে এসে শুরু হয় অনাদিকালের অপেক্ষা। যখন আর ধৈর্য ধরে রাখা যায় না, যাত্রীগণ সরকারের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার শুরু করেন, তখন দুলতে দুলতে ব্যাগখানা এসে হাজির হয়। একবুক জ্বালা নিয়ে যেই বিমানবন্দর হতে বের হতে যাবে, চৌকস দেখতে সাদা পোশাকের কেউ এসে কর্কশ স্বরে বলে, আপনার ব্যাগটা চেক করতে হবে। যাত্রী তখন বাকরুদ্ধ! কাস্টমস কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। তাই যাত্রী বিরক্ত হলেও মানতে হয়। মেনে নেন, মনে নিতে পারেন না।

বিমানবন্দর থেকে যখন তিনি বের হন, তখন সর্বশেষ কষ্টটাই তার মনে বেশি থাকে। পুঞ্জীভূত সব কষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তার ওপর এসে পড়ে। এ এক মহাবিপদ। কাস্টমস কর্মকর্তারাও তা জানেন। তাই তারা সাধারণত সন্দেহ না হলে কোনো যাত্রীকে ঘাঁটাতে চান না। তারা নির্ভর করেন কখন গোপন সূত্রে কেউ কোন তথ্য দেবেন তার ওপর। আর কাস্টমস কর্মকর্তাদের ঝুঁকিভিত্তিক চেকিং-এর ওপর কোনো প্রশিক্ষণ না থাকায় স্রেফ অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগান। এ সুযোগে মুরগিগুলো ঠিকই বের হয়ে যায়। বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলো চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্য। তা বন্ধ করার উপায় কী? কাস্টমস যদি সবার ব্যাগ চেক করে তাহলেই তো চোরাচালান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সহজ সরল যাত্রীর কষ্ট? তাও তো বেড়ে যাবে হাজার গুণ। কাস্টমসের সবসময় পরস্পরবিরোধী দুটি কাজ থাকে। আমদানির ক্ষেত্রে বেশি বেশি রাজস্ব আহরণ এবং একই সাথে ব্যবসায় সহায়তা (facilitation)। আর যাত্রী সেবার ক্ষেত্রে গ্রিন চ্যানেল ব্যবহার করে দ্রুত যাত্রী পার করা এবং চোরাচালান প্রতিরোধ করা। পরস্পর বিরোধী এ দুটি কাজ কাস্টমস একত্রে কীভাবে করতে পারে?

একজন যাত্রী হিসেবে কী করা যেতে পারে আমি তারই প্রস্তাব করবো। কাজটি আমার কাছে বেশ সহজ মনে হয়। কর্মপদ্ধতিতে একটু পরিবর্তন আনতে পারলেই হয়। বর্তমানে কাস্টমসের যাত্রী ব্যাগেজ চেক হয় সবার শেষে, যখন যাত্রী বিমানবন্দর হতে বের হয়ে যাবে। এই চেকিংটা যদি ব্যাগেজ বেল্টে ওঠার আগে করা যায় তাহলেই আর যাত্রী জানতে পারবে না তার ব্যাগেজ চেকিং হলো কি না। বেল্টে যেখানে ব্যাগ তোলা হয়, তার সাথে সংযুক্ত করে প্রতিটি বেল্টের জন্য হাই স্পিড ২টি করে স্ক্যানার যুক্ত করা হলে এটি সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। প্লেন হতে ব্যাগেজ এনে কাস্টমস-বেল্টে রাখবে। তা হতে স্ক্যান হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিমানবন্দরের বর্তমান বেল্টে পড়বে। এতে সব ব্যাগেজ চেক করা যাবে এবং যাত্রীও বিরক্ত হবে না। প্রতি বেল্টের জন্য হাই স্পিড ২টি করে তুলনামূলক বড় স্ক্যানার থাকলে ব্যাগ বর্তমানে বেল্টে আসতে যে সময় লাগে তার থেকে এক মিনিটও বেশি সময় লাগবে না। অথচ কাস্টমসের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হবে। স্ক্যানিং রিপোর্টে যেসব ব্যাগে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যাবে শুধু সেই সব ব্যাগের মালিকদের আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। প্রয়োজনে ব্যাগ খোলাও যেতে পারে।

বর্তমানে লক্ষ্য করলে দেখবেন, প্রতিটি ট্রলিব্যাগে একটি ইউনিভার্সাল লক থাকে। সব ব্যাগ উৎপাদক কোম্পানি সব দেশের কাস্টমসকে ইউনিভার্সাল লকের চাবি দেয়। একটি চাবি দিয়ে সব কোম্পানির সব ব্যাগ খোলা যায়। এটি কাস্টমসের ক্ষমতা। ৯/১১-এর পর সারা পৃথিবীর কাস্টমস তা ব্যবহার করছে। ব্যাগেজ চেকিংও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যাত্রী হয়রানি বাড়েনি। তারা নিরাপত্তার নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য স্ক্যানিং মেশিন সবার সামনে হতে পেছনে নিয়ে গেছে। মেশিনের সংখ্যা বাড়িয়েছে। আর জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করেছে।

বর্তমান প্রবণতা থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বিমানবন্দর চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য এবং বাংলাদেশ বিমান এর প্রধান বাহন। বিমানের জনবলকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বড় ধরনের চোরাচালান বন্ধ হয়ে যাবে। যাত্রীবেশে সাধারণত ছোট ছোট চালান ছাড় করানো সম্ভব। ব্যাগেজ চেকের পদ্ধতি বদলে তা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিমানবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তাগণ একটু বৃত্তের বাইরে যেয়ে চিন্তা করতে পারেন। আমার ধারণা এতে কাজ হবে।

- লেখক **মুহম্মদ জাকির হোসেন**, অতিরিক্ত কমিশনার
(এখানে একজন সাধারণ যাত্রী হিসেবে তার মতামত উপস্থাপন করেছেন)

স্মাগলার মাইকেল চ্যাং

অরুণ কুমার বিশ্বাস

ক.

কুয়ালালামপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। আইয়াটা কোড কেএলআইএ! মজা করে বলা যায় 'কেলিয়া'! মালয়েশিয়ার মোট চোদ্দোটি স্টেটের অন্যতম স্যালাঙ্গর। এর প্রান্তসীমায় অবস্থিত বিমানবন্দরটি এক কথায় অপূর্ব! ঝকঝকে তকতকে কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্ট সাউথ এশিয়ার সেমি-রিজিওনাল হাব হিসেবে ইতোমধ্যে বেশ নাম কুড়িয়েছে।

ডেপুটি কমিশনার অব বাংলাদেশ কাস্টমস, অলোকেশ রয় সরকারি সফর সেরে দেশের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরের অভিজ্ঞতা তাকে প্রায়শ তাড়িত করে। তবে প্রায় ডজনখানেক ট্রাভেলেটর (অনেকটা আনুভূমিক এসক্যালেটরের মতো যাতে চেপে বসলে এমনি এমনি সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় হাঁটতে হয় না, সোজা কথায় চলন্ত রাস্তা) ও অ্যারোট্রেনসমৃদ্ধ কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরের সুখানুভূতি তার মনে থাকবে অনেকদিন। এর পেছনে অবশ্য কারণও আছে একখানা জব্বর।

জানুয়ারির শুরুর কথা! রাজধানী শহর কুয়ালালামপুরের বুকিত বিনতাঙ রোডের হোটেল মায়া ইন্টারন্যাশনাল থেকে এয়ারপোর্ট কোচে চড়ে মাত্র কেএল (কুয়ালালামপুর) বিমানবন্দরে পৌঁছলেন ডিসি অলোকেশ। চাকরির সুবাদে ইদানীং একটি ব্যাপারে বড্ড ম্যানিয়াক হয়ে উঠেছেন তিনি। বেচাল কিছু নজরে এলেই অমনি শৌখিন চশমার ফাঁক গলে উৎসুক চোখ মেলে তাকান অলোকেশ। তার নেচার অফ জবটাই এমন যে কাউকে দেখামাত্র তার ঠিকুজি-কোষ্ঠি জানতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এয়ারপোর্টের ইস্ট কনকর্স হলে প্রবেশ করতেই মৃদু ঠোক্কর খেলেন এক ভিনদেশি যুবকের সাথে। প্রায় ছ'ফুটের মতোন উচ্চতা, সফেদ গায়ের রং, দু'গালে দাড়ির বড্ড হাহাকার, তবে থুঁতনিতে দু'গাছা ঠিক আছে। দেখে বেশ হাসিখুশি লাফাঙ্গা মার্কা বলে মালুম হয়।

সরি টু নক ইউ। এক্সট্রিমলি সরি। চোট লাগেনি তো? যেন বিনয়ের অবতার তিনি।
অলোকেশ অভ্যেসমতো মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, যার মানে ঠিক আছে। তবে তার হাসিটাকে ঠিক হাসি বলা চলে না। বরং মুখ টিপে দাঁত কেলানো বললে ঠিক হয়। এসব লাফাঙ্গাদের দেখে বোঝার উপায় নেই, ঠোক্করটা অনবধানবশত লেগেছে, নাকি ইচ্ছে করে লাগিয়েছে! মজাও পেয়েছে বেশ!

অলোকেশ লোকটাকে মনে রাখলেন। অবশ্য এর পেছনে কোনো কারণ নেই। বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে এমন অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সবার কথা তার মনে থাকে না, বা মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু এই ভিনদেশি ছাগদাড়ির কথা দিব্যি তার মনে সেঁটে রইল। ব্যাটা ফাজিল কোথাকার!

চেক-ইনের এখনো ঢের দেরি, তাই ডিউটি-ফ্রি শপে খানিক ঢুঁ মারলেন অলোকেশ। বিভিন্ন দেশ ঘুরে একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পেরেছেন তিনি, এই ফ্রি শব্দটার আলাদা কোনো মানে নেই। কারণ এখানে কিছু কিনতে গেলে ট্যাক্স দিতে হয় না ঠিকই, কিন্তু দাম তুলনামূলক চড়া। তাই পারতপক্ষে তিনি এসব ফালতু দোকান থেকে কখনো কিছু কেনেন না, যদি না খুচরো কিছু ফরেন কারেন্সি তখনও নিতান্ত অবহেলায় বুকপকেটে কেতরে পড়ে থাকে।

হ্যালো মিস্টার এ কে রয়! হ্যাভ ইউ জাস্ট অ্যারাইভড অ্যাট দ্য কেএল (কুয়ালালামপুর), অর গোয়িং ব্যাক? পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে পেছন ফিরে তাকান অলোকেশ।

আরে, মিস্টার জিলানি যে! হাউ আর ইউ? ডুয়িং ফাইন?
ডিসি অলোকেশ আকর্ণ বিস্তৃত হাসলেন। অনেকদিন বাদে একজন সত্যিকার বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে বেশ আনন্দ হচ্ছে তার। জিলানি মালয়েশিয়া কাস্টমসের চৌকস অফিসার। ড্রাগ মাফিয়াদের চৌপাট দৌড় করাতে তার জুড়ি নেই। ঢাকাতেই জিলানির সাথে আলাপ হয়েছিল একবার। এমন আমুদে মানুষ তিনি খুব বেশি দেখেননি।
এসেই চলে যাচ্ছেন যে! আমাকে একটা খবরও দিলেন না? অনুযোগের সুরে বললেন জিলানি।
সরি, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম। এমন টানা সিডিউল ছিল যে একদম সময় করতে পারিনি।
ইট্স ওকে। চলুন দুজন মিলে একটু কফি খাই। কত দিন পরে মিট করলাম বলুন তো! জিলানির ঠোঁটে হে হে গোছের আমুদে হাসি।

আই ডোন্ট মাইন্ড ব্রাদার। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। চলো যাওয়া যাক। জিলানির সাথে অন্তরঙ্গ আলাপনের ফাঁকে একবার ভালো করে ওর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নেন। কেমন সুন্দর ব্ল্যাকবেরি রঙের ইউনিফর্ম পরে আছেন মালয়েশিয়ান কাস্টমসের দুঁদে অফিসার! সত্যি, ইউনিফর্মের আলাদা গুরুত্ব আছে, আছে বিশেষত্ব। অলোকেশ ভাবছেন, এমন একটি ইউনিফর্ম তার থাকলে মন্দ কী ছিল! সাথে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, আই মিন ওয়েপনস!
তারপর বলুন কেমন আছেন মিস্টার রয়! ভ্রু নাচান জিলানি।
এই চলে যাচ্ছে! আপনার কী খবর? কোনো সেনসেশনাল কেস?
নাহ! ড্রাগ মাফিয়ারা বোধ হয় ম্যাদা মেরে গেছে! এদিকে আর ঘেঁষে না।
তাই বুঝি! আপনার দেশের মাফিয়ারা দু'নম্বরী ধান্ধা ছেড়ে সব বুদ্ধের উপাসনা শুরু করেছে! কৌতুকের সুরে আলোকেশ বললেন।
গুড হিউমার মিস্টার রয়। আই জাস্ট লাইক ইট। আপনার কোনো সাকসেস? ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড?
নাহ্ নেই। তবে একটা ব্যাপার আমাকে খুব ভাবাচ্ছে ভাই জিলানি। আমি ট্রেনিংয়ে আসার আগে একটা ইনফরমেশন ছিল।
গোল্ড, নাকি ড্রাগের চালান?
নট অ্যাট অল! ফরেন কারেন্সি। তা প্রায় এক মিলিয়ন ইউএস ডলার! বড্ড শেকি শোনালো অলোকেশের কণ্ঠস্বর।
এ-এ-এক মিলিয়ন! তাও আবার মার্কিন ডলার! আর ইউ কিডিং মিস্টার রয়? বিস্ময়ে জিলানির চোখ কপালে উঠে গেল, ঠোঁট পড়ল ঝুলে। ঠিক আটলান্টিক শার্কের মতো।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। আমি জানি চালানটা বেরিয়েছে। হয়তো আবার দেশে ঢুকবে! আলোকেশের কণ্ঠে পাহাড়প্রমাণ হতাশা।
আবার ঢুকবে মানে? জিলানি অবাক। যেন তিনি কিচ্ছু বোঝেন না। স্রেফ দুগ্ধপোষ্য শিশু।
অন্য কোনো ফর্মে। যেমন ধরুন কারেন্সি বেরিয়েছে। ঢুকবে ড্রাগ, গোল্ড বা নিষিদ্ধ কিছু। ফর এক্সামপল, যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট। ইয়াবা, ভায়াগ্রা বা মার্কিন ওষুধ কোম্পানি ফিজারের তৈরি রিভেটিও, সিয়েলিস ও লেভিট্রা। আমাদের তরুণরা এই সব ছাইপাশ খেয়ে একেবারে গোল্লায় যেতে বসেছে!
মাই গড! তার মানে নিউ জেনারেশনের অবস্থা কাহিল।
ঠিক তাই। তবে ইদানিং ওসব নিষিদ্ধ ট্যাবলেট ইন্ডিয়া থেকে স্থলপথে বেশি ঢুকছে না। সেখানে অসম্ভব কড়াকড়ি, তাই এয়ার-রুটে সম্ভাবনা বেশি।

বিশ্বখ্যাত স্টারবাকস চেইন শপ থেকে কফি খেয়ে বেরোলেন ডিসি অলোকেশ। এবার বিদায়ের পালা। সহসা সেই ছাগদাড়ি। আড়চোখে যেন অলোকেশকে দেখছে। হর্নবিল পাখির মতো ঘাড় কাত করে দেখছে। উপেক্ষা করলেন অলোকেশ। শালা, পা মাড়িয়ে দিয়ে এখন আবার নজরদারি হচ্ছে। সে কি জানে কে এই অলোকেশ! ছাগদাড়ি লোকটার কাঁধে ঝুলছে একখানা

গিটার মতোন জিনিস। বিশেষ কোনো মিউজিকাল ইনস্ট্রুমেন্ট হবে হয়তো! কিন্তু এই টুকুন গিটার! আশ্চর্য অলোকেশ। যেন কুকুর বটে, তবে জার্মান শেফার্ড বা গ্রে হাউন্ড নয়, জাস্ট সিসিলিয়ান পুডল। ছোটখাটো মায়াবি দেখতে। শরীরে হাড্ডির চেয়ে লোম বেশি। বেহুদাই ঘাউ ঘাউ করে।
অমন করে কী দেখছেন মিস্টার রয়? জানতে চান জিলানি।
নাহ কিছু না। ওই লোকটা আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছিল।
কবে, কখন?
এই তো একটু আগে।
এই সামান্য ঘটনা এখনো মনে রেখেছেন! আপনি পারেনও বটে! হা হা হা! আপনি কাস্টমস অফিশিয়াল না হয়ে বরং লেখক হলে ভালো করতেন। এত সূক্ষ্ম আপনার অনুভূতি! জিলানির কথায় যেন একটু খোঁচার আভাস পান অলোকেশ।
মিস্টার রয়, এবার আমাকে যেতে হবে। ডিউটি আছে। এখনকার মতো বিদায়! তবে বোর্ডিং পাস পাবার পর উড়ানের আগে একবার দেখা করতে ভুলবেন না কিন্তু। আমি গেট নম্বর জি-টেনে আছি। ট্রাভেলেটর এগারোর শেষমাথা। জিলানি বাই বাই জানান।

খ.

ট্যানডাস!
মালয় ভাষা, বোঝার উপায় নেই যদি না ইংলিশে ল্যাভাটরি লেখা থাকে বা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে টয়লেটের ছবি আঁকা থাকে। মেয়েদের টয়লেট বোঝাতে ফ্রক, আর ছেলেদের টয়লেটের গায়ে থাকে স্যুটকোট পরিহিত ছবি। ট্যানডাস বা টয়লেটে ঢুকলেন অলোকেশ। অখণ্ড অবসরে তার বেশি বেশি ছোটবাইরে পায়। বদঅভ্যেস একটা। অনেকে যেমন কাজ না থাকলে বসে বসে হাতের নখ খায় কিংবা আপন মনে পরনিন্দা করে।
সে কি! এখানেও ছাগদাড়ি! তার মানে লোকটা তাকে নজর করেছে। কড়া নজর। কিন্তু কেন! হোয়াট ফর! এনিথিং রং! নাকি পা মাড়িয়ে সুখ হয়নি, তার ঘাড়ে চাপতে চায়। এগুলো ডিসি অলোকেশের বালসুলভ আকাশকুসুম কল্পনা। আসলে প্রত্যেক মানুষের মাঝেই একটা শিশু লুকিয়ে থাকে। একে বেশি প্রশ্রয় দেয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনি ঠেলে বের করতে চাইলে মন হারিয়ে মানুষ হয়ে পড়ে যান্ত্রিক।

মনে মনে অলোকেশ ঠিক করলেন, লোকটার সাথে আলাপ করতে হবে। যদি কোনো প্লট পাওয়া যায়। লেখকদের এই এক বাতিক। যেখানে যখন যায়, শুধু গল্পের কাহিনি খোঁজে। ইচ্ছে করেই তিনি ছোট টয়লেটে একটু সময় নিলেন। কেউ হয়তো ভাববেন তিনি ছোটটা সারতে গিয়ে বড়টার চাপে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।
হ্যালো, দিস ইজ অলোকেশ। সিম্পলি অ্যা রাইটার! ফ্রম বাংলাদেশ! হাত বাড়িয়ে দেন ডিসি কাস্টমস। ইচ্ছে করেই তিনি তার পেশাগত পরিচিতি এড়িয়ে যান।
হাই, আই'ম চ্যাং। বা মাইকেল বলতে পারো। মি ফ্রম বেলারুশ। জাস্ট ইন বিটুইন লিথুয়ানিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন। ডানে বাঁয়ে রাশিয়া অ্যান্ড পোল্যান্ড।
ও আই সি। মাথা নাড়লেন আলোকেশ।
হ্যাভ ইউ বিন দেয়ার? মধুর সুরে বললেন মাইকেল চ্যাং।
নো। বাট আই নো বেলারুশ কালচার। তুমি কী করো? ঔৎসুক্য সংবরণ করতে পারলেন না অলোকেশ।
সিম্পলি নাথিং! হেঁয়ালি করেন মিস্টার চ্যাং।
আই লাভ টু নো মাইকেল?
এই একটু গান-টান করি আর কি!
আর ইউ অ্যা সিঙ্গার? ওয়াও! সো নাইস অফ ইউ! ওর প্রতি আলোকেশের এখন আর কোনো বিরাগ নেই। গান বলে কথা। দ্য ওনলি ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ।
বাট আই হ্যাভ নো প্রফেশন। নো ডেসটিনেশন ইভেন। এবারে মাইকেলের হাসিটা যেন কেমন নিস্প্রভ মনে হয়।
সত্যি!
মাথা নাড়ে মাইকেল। অলোকেশ খেয়াল করেন মাইকেলের গিটারখানা ছোট্ট সুন্দর একটা খোলের মধ্যে রাখা। আরও মজার বিষয়, সে ওটাকে কখনো ঘাড়ে তোলে না। বরং গিটারের খোলের সাথে দুটো চাকা লাগানো আছে। অনেকটা ট্রলিব্যাগের মতো। গিটারের ঘাড় ধরে বাধ্য শিশুর মতো টেনে নিয়ে বেড়ান। অবশ্য যেমন রোগাপটকা চেহারা। টানবে কী করে! খেতে পায় না নাকি! মনে ভাবেন অলোকেশ।

আমিও একটু আধটু গিটার বাজাই। মে আই সি ইওর অরগান? বললেন অলোকেশ।
ও শিওর, বাট আমার জন্য এক বন্ধু ওয়েট করে আছে। এক্ষুনি যেতে হবে যে! চট করে উঠে যায় মাইকেল।

অলোকেশ ভদ্রলোকের রুচির তারিফ করেন। দেশে ঘুরে ঘুরে বাজনা শোনান। স্টেডি পেশা বলে কিছু নেই। সত্যি সাহসী মানুষ এরা! দে জাস্ট লিভ ফর দ্য ডে, নট ফর ফিউচার। কিন্তু মাইকেল যাবে কোথায়! জানা হলো না তো। কেমন বাজায়, তাও শোনা হলো না। আলোকেশ শৌখিন মানুষ, রাজস্ব আহরণ তার পেশা হলেও নেশা অন্য। রহস্য টহস্য তাকে ভীষণ টানে! কোথাও কোনো অপরাধ বা রহস্যের গন্ধ পেলেই অমনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন তিনি। মাইকেলকে তার ভিন্নজগতের মানুষ বলেই মালুম হলো। বেলারুশের যুবক, চোয়াড়ে চেহারা, দুচোখে বেশ বন্যতা আছে।
মাইকেল বোধ হয় অনেকদিন পানির নিচে যায় নি। বড্ড বদখত একটা গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে ছিল এতক্ষণ। চ্যাং উঠে যাবার পরে টের পেলেন অলোকেশ। বিদেশি বেভুলো ছেলেটাকে দেখে মায়া হয়! কিন্তু ছেলেটা অমন চট করে উঠে গেল কেন! ওর গানের যন্ত্রটা ধরতে দেবে না তাই! হবে হয়তো। পছন্দের জিনিস, তাই হয়তো কাউকে অ্যালাউ করে না মাইকেল চ্যাং। বউ বা শখের জিনিস কখনও কাউকে ধার দিতে নেই। চটকে আঁচড়ে একেবারে বারোটা বাজিয়ে দেবে! আগের সেই পলিশ আর পাবেন না!

খানিক বাদে চেক-ইন। এবার গাত্রোত্থান করলেন ডিসি অলোকেশ। ইস্ট কনকর্স হলের কিছুটা সামনে এগিয়ে অ্যারোট্রেন। পোর্টম্যান্টো ওয়ার্ড। এয়ারপোর্ট পাস ট্রেন মিলে অ্যারোট্রেন। অনেকটা আরিচা নদীর রো রো ফেরির মতো। এই ট্রেনের কোনো বাঁক বা দিকবদল নেই। দুদিক থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে। মিনিট কয়েক লাগবে। অলোকেশ ভাবছেন দেশের কথা। মালয়েশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে খুব বেশি আগে স্বাধীনতা পায়নি। অথচ ওরা এখন কত এগিয়ে। বিশ্বের প্রায় সব নামী মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাবসিডিয়ারি বা শাখা অফিস এখানে আছে। স্ট্যানচ্যাট, সিটি ব্যাংক, রয়াল ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড, হিউলেট প্ল্যাকার্ড, জারা, ডেবেনহ্যামস, পার্কসন, স্টারবাকস, কারফোর, সুইডিস আইকিয়া, ফিনিস নোকিয়াসহ বাছা বাছা সব কোম্পানির রিজিওনাল হাব এই কুয়ালালামপুর। অথচ আমরা এখনো কত পিছিয়ে। কারণ একটাই- আমাদের কোনো স্বপ্ন নেই, এখনো পাইনি মাহাথিরের মতো একজন যোগ্য নেতা।

ওখানকার রাস্তাঘাট, আর্থিক বুনিয়াদ কত মজবুত! লোকেরা আইন জানে, আইন মানে, দেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটে। আর আমাদের ভুখানাঙ্গা মানুষ সেখানে ওদের খিদমতগার হয়ে উঞ্ছবৃত্তি করে বেঁচে আছে। অ্যারোট্রেন চলছে দুলকি চালে। ভূগর্ভস্থ টানেলের নিচে ডুব-সাঁতার দিয়ে। ডিসি আলোকেশ ডুবে আছেন চিন্তার সমুদ্রে। ভাবছেন তার সাম্প্রতিক ব্যর্থতার কথা। গেল হপ্তার কেসটা একটুর জন্য কেঁচে গেছে। মাঝরাতের ফোনটাকে তাচ্ছিল্য করে যদি উড়িয়ে না দিতেন!

উড়োফোন! গুজবের মতোই অর্থহীন! তাই কি! অন্তত এক্ষেত্রে তা প্রমাণ হয়নি!
অনামিকা! সেই রিনরিনে লাস্যময় কণ্ঠস্বর! বলল, স্যার, বড় অঙ্কের চালান যাচ্ছে বাইরে! আজ রাতে!
কে আপনি! কে বলছেন প্লিজ! অলোকেশের কণ্ঠ বড্ড কর্তৃত্বব্যঞ্জক শোনায়।
চেনা যাচ্ছে না? সেই আমি! আপনার সহযোদ্ধা! অবশ্য যদি আপনি তা মনে করেন!
অলোকেশ নীরব। গেল দুবার মেয়েটার কথা ঠিকঠাক মেলেনি। তাই সেই 'দুষ্টু বালক আর বাঘ আসার' গল্পের মতো আমল দেননি মোটেই। এবং ফলে তাকে বেশ ভুগতে হয়েছে। ওপরঅলা কথা শুনিয়েছেন, আরেকটু সতর্ক হও অলোকেশ। ক্যারিয়ার বলে কথা! কর্মক্ষেত্রে সামান্য ব্যর্থতা কিন্তু তামাম সাফল্যকে নিমিষে ম্লান করে দেয়!
অলোকেশ কিছু বলেননি! অথচ তার বলার মতো অনেক কিছু ছিল। বলতে পারতেন, তার এমন কোনো নবুয়্যতি ক্ষমতা নেই যে হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস পাবেন।

অলোকেশ জানেন, এই আমলাতন্ত্র নামক ব্যবস্থাখানা পুরুষকে স্রেফ কাপুরুষ করে দেয়। এখানে থেকে প্রায়শই সাদাকে সাদা বা কালোকে কালো বলা যায় না। সত্যবাদী হলে পস্তাতে হয়! তার চেয়ে বরং গিরগিটির মতো রঙ বদলালে সুবিধে বেশি। সাথে গ্যালনখানেক লিচুমার্কা খাঁটি সরিষার তেল! ব্যস, জমে যায় খেল! তেল খায় না এমন মানুষ আছে নাকি! তাই চাই তেলের বাটি, চাঁদিতে মারো চাটি! বস্ কিচ্ছু বলবে না! বরং খুশিতে বগল বাজাবে! তেল আছে না!

অনামিকা ঠিক বলেছিল। ফরেন কারেন্সির একটা বড় চালান তার হাত ফসকেছে! অবশ্য স্রেফ স্যালুট ঠুকতে ঠুকতে যারা ইন্সপেক্টর হয়েছে তাদের দিয়ে কখনো স্মাগলার ধরা সম্ভব নয়। অনেকটা যেন দাঁত খোঁচানো কাঠি দিয়ে হাতির বগলে কাতুকুতু

দেবার মতোই হাস্যকর।

অ্যারোট্রেন গন্তব্যে এসে থেমেছে। ডিসি আলোকেশ ভাবনা ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এলেন। ধূর্ত মানি লন্ডারার স্মাগলাররা এখন তাদের রুট, সময় ও পদ্ধতি সব বদলে ফেলছে। রাতের বদলে দিন, অফিসার বুঝে এ বি কিংবা সি শিফটে চালান পার করছে। যে শিফটে আয়েশি, বয়সী ও ঘন ঘন পানাসক্ত কর্মকর্তা বেশি, সেই সময়টাকে টার্গেট করেছে ওরা। পাচার করা টাকা দিয়ে কেনা মালামাল মিডল ইস্টের বদলে এখন সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইনসগুলোয় লোড হচ্ছে।

অলোকেশের অনুমান যদি ভুল না হয়, পাচার হওয়া কারেন্সির সমপরিমাণ স্মাগল্ড গুডস ডিউটি ফাঁকি দিয়ে আবার হযরত শাহজালাল এয়ারপোর্ট দিয়েই রিলিজ করবে। কিন্তু সেই কার্গো বা আইটেম কী ও কতটা তা বোঝা মুশকিল।

গ.

কেলিউআর! মানে হলো এগ্‌জিট বা বাহির!
মজার ব্যাপার হলো, বাহাসা মালয় ভাষা লেখা হয় ইংরেজিতে। সহজেই বোঝা যায়, যদিও পদবাচ্যগুলো মোটেও শ্রুতিমধুর নয়। যেমন 'বাহায়া' মানে বিপদ, 'মাকলুমাত' অর্থ তথ্য, 'সেলামাত ডাতাং' মানে হলো গিয়ে ওয়েলকাম বা স্বাগতম! 'পিন্টু' মানে গেট, সময়ের মালয় এক্সপ্রেশন 'মাসা', 'টেমপাত দুদুক' বললে বোঝায় সিট নম্বর। বাসের ভাড়া 'ট্যামবাঙ'।

ডিসি অলোকেশ অ্যারোট্রেনের পিন্টু দিয়ে কেলিউআর হলেন মানে বেরিয়ে এলেন। এমএইচ-১৯৬ মালয়েশিয়া এয়ারলাইনসে দেশে ফিরছেন তিনি। ই-টিকেট জমা দিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিলেন, টেমপাত দুদুক ২৯-এ। জানালার কাছে সিট। স্থানীয় সময় ছ'টা দশে বিমান টেক অফ করার কথা। বাংলাদেশের চেয়ে মালয়েশিয়ার সময় দু'ঘণ্টা এগিয়ে। এখানে সন্ধ্যা হয় আটটারও পরে। ভোর হয় দেরিতে। সেও প্রায় আটটা। মালয়েশিয়ার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাঝারি। হাওয়াই শার্ট গায়ে চাপিয়ে দিব্যি দিন গুলজার করা চলে।

বোর্ডিং পাস নিয়ে এবার ইমিগ্রেশন ফরমালিটিস। ডিসি অলোকেশের পাসপোর্ট অফিশিয়াল। তাই দেশের বাইরে গিয়ে খানিক আদর-সমাদর পেয়ে থাকেন। এই যেমন কেএল এয়ারপোর্টের লেডি ইমিগ্রেশন অফিসার দরাজ হেসে জানতে চাইলেন, হোয়াট ডিপার্টমেন্ট ডু ইউ ওয়ার্ক ইন?
বাংলাদেশ কাস্টমস!
কাস্টমস! দ্যাটস গুড। পোস্টেড অ্যাট এইচএসআইএ? মানে হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।
ইয়েস। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন অলোকেশ।
জিনিয়া তাকে খাতির করে বসালেন। আবার কফিও অফার করলেন। অলোকেশের অবশ্য যত্রতত্র চাহিবামাত্র নিজেকে বিকিয়ে দেবার অভ্যাস নেই। কখনো ছিল না।
বিনয়-বিগলিত সুরে বললেন, নো থ্যাঙ্কস। অ্যান্ড করডিয়ালি ইনভাইটেড টু ভিজিট বাংলাদেশ। অ্যা গ্রেট পেস টু ফিল দ্য নেচার!
মওকা পেয়ে নিজের দেশের খানিক সুখ্যাতি করলেন অলোকেশ। ইমিগ্রেশন শেষে কাছেপিঠে কোনো কফি পারলারে গিয়ে বসবেন ভাবছেন, সহসা আবার সেই ছাগদাড়ি মাইকেল পাশের কিউতে হাজির।
হাই চ্যাং! গলা তুললেন অলোকেশ। বেলারুশীয় ছোকরার প্রতি আসলে তার এক রকম নজর থুক্কু মায়া পড়ে গেছে। তাই চাইলেও পাশ কাটানো যাচ্ছে না।
কে চ্যাং? লেডি অফিসার সোজাসুজি অলোকেশের দিকে তাকালেন।
ওই তো, বেলারুশ থেকে এসেছে, মাইক চ্যাং। গান বাজনা করে! বললেন অলোকেশ।
আর ইউ শিওর মিস্টার রয়! ভ্রু নাচায় লেডি ইমিগ্রেশন অফিসার জিনিয়া নওরোজ।
কেন নয়! ও নিজেই তো বলল। সাথে গিটার দেখছেন না! নিজের কথার সপক্ষে যুক্তি দেন অলোকেশ।
জিনিয়া বললেন, বাই দ্য ওয়ে, হাউ লং ডু ইউ নো হিম? আগে কখনো দেখেছেন?
নট অ্যাট অল। আজই একটু আগে আলাপ হলো। একটু বোহেমিয়ান গোছের। চাল-চুলোর বালাই নেই। তবে ছেলেটার চেহারায় বিশেষত্ব আছে। জবাব বিস্তৃত করেন অলোকেশ।
সে নিশ্চয়ই আছে। বাট আই নো হিম। যদ্দুর জানি ওর নাম মাইক বা চ্যাং নয়। অন্য কিছু। এর আগেও ওকে দেখেছি।
তাই নাকি! কিন্তু সে আমাকে ভুল নাম বলবে কেন! সে যাচ্ছে কোথায়? একই সাথে বিস্ময় ও প্রশ্ন দুটোই ছুড়ে দেন অলোকেশ।

এবার তার দৃষ্টি জিনিয়ার থেকে সরে মাইক ওরফে অন্য কারও ওপর গিয়ে পড়ে।

মাইক বা ভুল নাম বলে যে বিভ্রান্ত করতে চায়, সে আসলে পাশের লাইনে দাঁড়ানো। জিনিয়ার পক্ষে তার পাসপোর্ট যাচাই করা সম্ভব নয়। তবে ইলেক্ট্রনিক ইনফরমেশন শেয়ারিং-এর মাধ্যমে এটুকু নিশ্চিত করতে পারল যে, ছোকরা বাংলাদেশেই যাচ্ছে,এবং তার ফ্লাইট নম্বর এমএইচ-১৯৬। অর্থাৎ সে অলোকেশের সহযাত্রী।
মোর দ্যান এনাফ মিস জিনিয়া। নাম জানার কোনো দরকার নেই। হোয়াটস ইন অ্যা নেম! ওটুকু আমি বের করে নেব। কিন্তু আমাকে লুকিয়ে ওর কী লাভ ঠিক বুঝতে পারছি না। নাকি স্রেফ খেয়ালিপনা!

কফি বিনস! সিঙ্গাপুরের জনপ্রিয় কফি চেইনশপ। প্রতি স্ট্যান্ডার্ড কাপ কফির দাম আরএম (রিঙ্গিত) ফিফটিন। প্রায় সাড়ে তিন শ' টাকা। একটু তেতো, তবে ঝাঁঝ আছে। ক্যাফে মোকা ও লাত্তের মিক্সড স্বাদ। অলোকেশ বিলেতে পড়েছেন। হরেক রকম কফির স্বাদ তার চেনা। ল্যাটিন আমেরিকান কফি ইজ দ্য বেস্ট। তবে কোস্তা কফির স্বাদ এখনও তার জিভে লেগে আছে। লন্ডনে ক্লাসের ফাঁকে অটোমেটিক কফি ভেন্ডিং মেশিন থেকে দেড় পাউন্ড দিয়ে খেতেন। আহ কী ফ্লেভার! সত্যি মন ভরে যায়!

কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে লাগেজ চেকিং ঢিমেতেতালা চলে। খুব একটা কড়াকড়ি নেই। এয়ারট্রাফিক মাঝারি মাপের। তাই জেএফকে বা হিথ্রোর মতো দীর্ঘ লাইন এখানে দেখা যায় না। কফি বিনসে এক বাঙালি মেয়ের সাথে আলাপ হয় অলোকেশের। ক্যাশ কাউন্টারে বসে। নাম লাবণ্য।

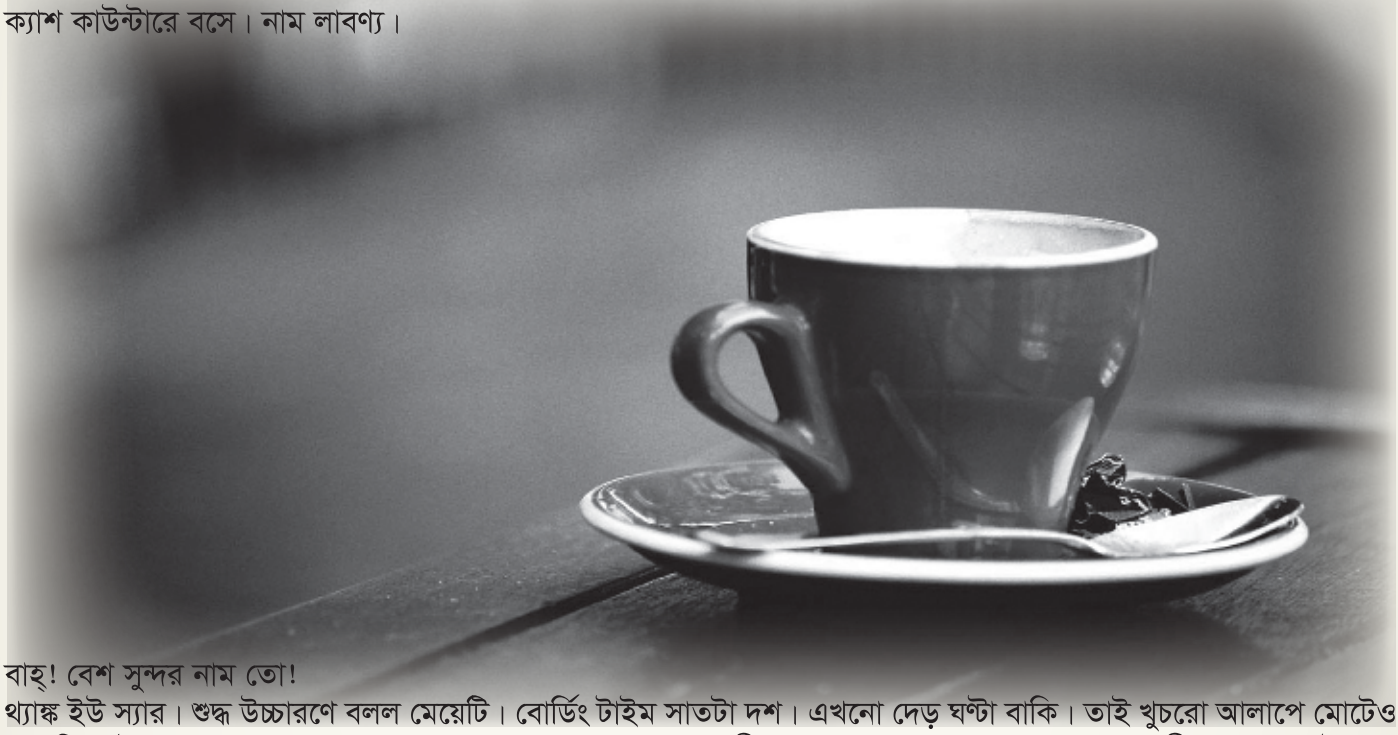

বাহ্! বেশ সুন্দর নাম তো!
থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। শুদ্ধ উচ্চারণে বলল মেয়েটি। বোর্ডিং টাইম সাতটা দশ। এখনো দেড় ঘণ্টা বাকি। তাই খুচরো আলাপে মোটেও আপত্তি নেই অলোকেশের। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, লাবণ্য ওর স্বামীর হাত ধরে এদেশে এসেছে। ওর স্বামী মারুফ একটা কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাজ করে। এয়ারপোর্টের কাছেই।
দেশ ছেড়ে তুমি কেন এসেছো এখানে? চাকরি পাওনি! হালকা চালে জানতে চান অলোকেশ।
জানি না তো! মারুফ বলল, বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বাঁচার নিরাপত্তা নেই। তাই চলে এলাম। লাবণ্যকে বড্ড করুণ দেখাল।
কোনো ভবিষ্যৎ নেই! মনে মনে আওড়ান আলোকেশ। লাবণ্য বা ওর স্বামী খুব একটা ভুল বলেছে কি! তেমন কোনো আশার আলো বা স্বপ্ন কি দেশকে নিয়ে দেখা যায়! এ প্রশ্নের উত্তর অলোকেশের জানা নেই। তাই চাইলেও খুব একটা আশাবাদী হতে পারছেন না। কে জানে, হয়তো নতুন প্রজন্ম তাদের বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে বদলাবে দেশটাকে। কবে! সে স্বপ্ন সুদূরপরাহত নয় কি! স্বপ্ন বুঝি স্বপ্নই রয়ে যায়! অধরা, অস্পৃশ্য!
দেশে যাবে না? এখানেই থাকবে? সারা জীবন! প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন অলোকেশ।
লাবণ্য নিশ্চুপ। তার মানে সে জানে না। খানিক বাদে ক্লিষ্ট হেসে বলল, গিয়ে কী হবে! কোন ভরসায় যাবো! এখানেই বেশ আছি।

খাই-দাই ঘুরে বেড়াই।
ভালো লাগে? বিদেশ বিভুঁইয়ে! আমি বলতে চাইছি এখানে পড়ে থাকতে তোমার আরাম বোধ হচ্ছে?
মন্দ তো নয়! বুদ্ধিমতী মেয়ে লাবণ্য। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল।
তার মানে ভালো লাগছে না তোমার! কী, ঠিক বলিনি! সমর্থনের আশায় লাবণ্যর চোখে চোখ রাখেন আলোকেশ।

লাবণ্য চোখ সরিয়ে নিল না। একরত্তি মেয়ে দার্শনিকের সুরে বলল, ভালো থাকা না থাকার ব্যাপারটা বড্ড আপেক্ষিক। সবচেয়ে বড় কথা, বেঁচে থাকলেই কেবল ভালো না থাকার কথা আসে। দেশে প্রতিদিন কত লোক স্রেফ রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় তার হিসাব খোদ সরকারই জানে না। দায়িত্বশীল কেউ কেউ মদ্যপ ড্রাইভারদের মাতলামিকে উসকে দিয়ে আইন পাসের প্রস্তাব দেন। ওরা নাকি খুনের মামলায় আসামি হতে পারে না। আমি বেঁচে থাকতে চাই ভাই, অকালে মরতে চাই না। লাবণ্যর ঠোঁটে ব্যঙ্গ। ও বলতে চাইছে, আপনি সরকারের লোক। শুঁড়ির সাক্ষী চিরকাল মাতালরাই হয়ে থাকে। এতে আর আশ্চর্য কী!

কিল খেয়ে কিলচুরি করেন আলোকেশ। লাবণ্য তো ভুল কিছু বলেনি! অলোকেশ নিজেই ফেডআপ। দীর্ঘ ট্রাফিক জ্যাম আর আমলাতন্ত্রের কামলা খেটে খেটে নিজেকে কেমন যেন ছিবড়ে মনে হয়! এই কি জীবন, না স্রেফ জেমস ওয়াটের অন্তর্দহন ইঞ্জিন! এবার তাহলে উঠি লাবণ্য। সময় হয়ে এল।
যাবেন! আরেকটু থাকুন না। এখন কাস্টমারের চাপ কম। লাবণ্যর কণ্ঠে বৃষ্টি ভর করে। তার মানে ওরা এখানে সত্যি ভালো নেই। ওরা বিদেশে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রেমিট্যান্স পাঠায়। বিনিময়ে আমরা ওদের এতটুকু স্বপ্ন দেখাতে পারি না। এই ব্যর্থতার দায় কার! জনগণ, সরকার নাকি অসুস্থ রাজনীতির!

লাবণ্য এক টুকরো কাগজে ওর মায়ের ঠিকানা লিখে দিল। ঢাকার মিরপুরে থাকেন। কত দিন দেখা হয়নি! মায়ের জন্য মনটা ভীষণ কাঁদে। সেলফোনে কথা হয়। তারপরও!

লাবণ্য চটজলদি এয়ারপোর্টের কোনো দোকান থেকে কিছু ফুড-সাপ্লিমেন্ট কিনে দেয় মায়ের জন্য। অলোকেশ সব মেনে নেয়, মায়ের প্রতি মেয়েটার দরদ দেখে। আপসোস! দেশের জন্য একটু ভালোবাসা যদি আমাদের থাকত! দেশটাও তো মায়েরই মতোন। দেশেরও বুঝি ফুড সাপ্লিমেন্ট দরকার। একটু ভিটামিন!

ঘ.
মাইকেল চ্যাং! ওই তো এদিকেই আসছে।
ডিসি আলোকেশ হ্যান্ডলাগেজ স্ক্যানারে দিয়ে অপেক্ষমাণ মালয়েশিয়ান কাস্টমস কর্মকর্তা জিলানির জন্য। তিনি মুঠোফোনে জানিয়েছেন, বোর্ডিং ব্রিজ ডিজলোকেট করার আগে আরো একবার পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা করবেন। বেশ মাইডিয়ার লোক এই জিলানি।

মাইকেলের হাতে সেই কিম্ভূত দেখতে গিটার, ব্র্যান্ড গিবসন ইউএসএ। আর একটা ছোট্ট পেটমোটা ব্যাগ। চেরি-ব্ল্যাক রঙের চামড়া বা উন্নতমানের সিনথেটিক রেক্সিনে তৈরি। ওর প্রতি অলোকেশের আগের সেই মহব্বতের ভাব আর এখন নেই। কারণ সে বিশ্বাসের ঘরে চুরি করেছে। অলোকেশের কাছে সে নিজের নাম ভাড়িয়েছে। কোনো কারণ ছাড়াই!
হাই মিস্টার রয়! নিজে থেকেই হাত তুললো লোকটা।
হ্যালো, মাইকেল চ্যাং এইলিয়াস হাইডিং ম্যান? অলোকেশ বললেন। তার কণ্ঠে বিজাতীয় ক্রোধের ছোঁয়া।
হাইডিং ম্যান কেন বলছো রয়?
কারণ তুমি আমাকে তোমার নাম ভুল বলেছো। সোজাসাপ্টা জবাব অলোকেশের।
অদ্ভুত চোখে তাকায় মাইকেল।
হোয়াই! কেন তুমি এ রকম করলে মাইক?
জাস্ট ফর নাথিং। মজা করলাম একটু। দিস ইজ মাই ফ্যাশন। সরি, ইফ আই অফেন্ড ইউ।
ইটস ওকে। অলোকেশ বললেন। খুব একটা রুড হতে পারলেন না তিনি।

ইতোমধ্যে জিলানি এসে পড়েছেন। নিজের চেকিং সেরে অলোকেশ আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ছেলেটার ওপর তার নজর রয়েছে। দেখছেন, গিটার নিয়ে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি অফিসারের সাথে তার টানাহেঁচড়া চলছে। খাটোমতোন

চাইনিজ অফিসার গিটার স্ক্যানারে তুলবেন, মাইকেল দেবেন না। এই নিয়ে রীতিমতো বচসা। মাইকেল সরোষে বলছে, আমরা তোমাদের অতিথি। আমাদের সাথে চোরের মতো আচরণ করছো কেন! আমার প্রিয় অর্গান মেশিনে দিলে এর টেম্পার নষ্ট হবে, সাউন্ড বিট্রে করবে, আরো কত কী!

অফিসারের আচরণে আলোকেশ অবশ্য খুব একটা খুশি নয়। তার সাথেও মাথাছিলা মিনি চাইনিজ ভালো ব্যবহার করেনি। 'অফিশিয়াল' পরিচয় দেবার পরেও মিছেমিছি তার কোট খুলিয়ে তবে ছেড়েছে। কোটের গায়ে নাকি সেমি-লিকুইড কোকেন থাকতে পারে! কুকুরের মতো শুঁকেছেও। পেয়েছে ঘোড়ার আন্ডা। বিশ্রী ঘামের দুর্গন্ধ ও হ্যাভকের বিদঘুটে ককটেল, আর পিপারমিন্ট! মাথামোটা বেয়াদব একটা!
লুক জিলানি, তোমাদের অফিসার লোকটা বড্ড খেঁকুরে! বাচ্চাদের মতো ওর গিটারটা নিয়ে কেমন টানাটানি করছে। যেন মার্কিন ক্রাফট কোম্পানির সুস্বাদু ললিপপ। শেষমেশ ক্ষোভ গোপন না করে বলেই ফেলল অলোকেশ। জিলানি তার বন্ধু বটে!
চায়নিজের কথা বলছো। ওরা অনেকটা শিশুদের মতোই খেয়ালি। আমি নিশ্চিত, বেলারুশীয় ছোকরা যদি নিজে থেকে গিটারটা মেশিনে দিত, তাহলে অফিসার স্ক্যানার থেকে ওটা সরিয়ে নিত। নিতই। তুমি যদি হ্যাঁ বলো, ও বলবে না, আর না বললে তাকে হ্যাঁ করিয়েই ছাড়বে। ওরা বড্ড সেন্টিমেন্টাল।
চালাকও। জুড়ে দেন অলোকেশ। ঢাকা এয়ারপোর্টে চায়নিজদের সামলাতে গিয়ে অলোকেশ রীতিমতো তিতিবিরক্ত! নিত্যই কোনো না কোনো চিনেম্যানের সাথে ব্যাগেজ ইন্সপেক্টরদের বচসা হবেই, কখনো কখনো যা হাতাহাতি অব্দি গড়ায়।

টাইম'জ ওভার। গুডবাই মিস্টার জিলানি। জিলানির সাথে সিনায় সিনা মেলান অলোকেশ। তার এই বিদেশ সফর কেবল মামুলি প্রশিক্ষণ নয়, কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিবাচক ক্ষেত্রও তৈরি করে, যা আমাদের অনেক অপেশাদার কূটনীতিক বোঝেন না। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পেলে যা হয় আর কী!

জিলানি মৃদু করকম্পন শেষে উষ্ণ হেসে বললেন, উইশ ইউ অ্যা সেফ জার্নি। বাই দ্য ওয়ে, বেলারুশীয় ছোকরার ওপরে খানিক নজর রেখো। হি মে নট বি অ্যা ভেরি গুড চ্যাপ। তোমার দেশেই তো যাচ্ছে!
রিয়েলি! ইউ মিন ইট, জিলানি? অলোকেশ বিস্ময় প্রকাশ করে। সত্যি বলতে কী, ছোকরাকে তার স্রেফ হটহেডেড বোহেমিয়ান ছাড়া কিচ্ছু মনে হয়নি। ওর মধ্যে মার্কিন 'ইয়াঙ্কিদের' প্রভাব এখনো রয়ে গেছে হয়তো।
জিলানি বললেন, ইয়েস, আই ডু। টেক কেয়ার মাই ফ্রেন্ড। স্টে গুড। কাম টু সি মি এগেন।

এবারে অলোকেশ নন, মাইকেল চ্যাং নিজেই এসে পথ আটকালো। এক্ষুনি বোর্ডিং শুরু হবে। ওরা ওয়েটিং রুমে। দরাজ হেসে বলল, তুমি কি কিছু মনে করেছো মিস্টার রয়, নিজের নাম ভুল বলেছি বলে!

নো, নট অ্যাট অল। ওসব ভুলে যাও। বাই দ্য ওয়ে, তুমি বাংলাদেশে যাচ্ছো! কোনো প্রোগ্রাম আছে নাকি? কনসার্ট! সরাসরি কাজের কথায় এলেন অলোকেশ। জিলানি যখন বলেছেন, ব্যাপারটা দেখতে হয়!
না, কোনো গানের জলসা নয়। জাস্ট তোমাদের দেশ দেখতে যাচ্ছি।
একা?
আমার কোনো সহযোগী নেই। একাই বেড়াই। দিস ইজ মাই ফ্যাশন। আই ফিল গুড।
তোমার গিটার? রেখে দিয়েছে নাকি? অলোকেশ লক্ষ করলেন, গিটার ওর সাথে নেই। ওটা কোথায়!
ওই তো, ওখানে। তুমি গিটার বাজাতে জানো? উল্টো প্রশ্ন করে মাইকেল চ্যাং।

বোর্ডিং-এর ঘোষণা হলো। অমনি তড়িঘড়ি গিটারখানা লুফে নিয়ে ব্রিজের দিকে হাঁটা শুরু করে মাইক। অলোকেশ দেখলেন, গিটারের প্রসঙ্গ উঠলেই বেলারুশ ছোকরা কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এনিথিং রং ইন ইট! গিটারের কাভারের সাথে চাকা লাগানো। থাকতেই পারে। কিন্তু ওটা তুলতে গিয়ে বেঁকে যাচ্ছে মাইকেল চ্যাং। অসম্ভব ভারী মনে হয়! গিটার, নাকি অন্য কিছু!

বিমানের ভেতরেও সেই একই কাহিনি। এয়ারবাস-৩৩০ যথেষ্ট কেবিনস্পেসের জোগান দেয়। কিন্তু মাইকেল তার গিটার নিজের কাছেই রাখবে। ওপরে তুলবে না। সুবেশা কেবিন ক্রু মিস লায়লা বারবার অনুরোধ করছে মাইক যেন ওর গিটার ওভারহেড কমপার্টমেন্টে তুলে রাখেন। একটু পরেই এয়ারবাস টেকঅফ করবে। অন্য যাত্রীদের সেফটির কথা ভেবে মাইকের গিটার ওপরে রাখা বাঞ্ছনীয় এটা বোঝানোর নিস্ফল চেষ্টা চালাচ্ছে লায়লা।

অলোকেশ জিলানির পরামর্শের কথা ভোলেননি। হি কিপ্‌স অ্যান আই অন চ্যাং। লায়লার সাথে বাগ্‌যুদ্ধ শেষে জয় মাইকের হলো। কারণ কেবিন ক্রু চাইলেও খুব একটা ক্রুড হতে পারে না। এটা আন্তর্জাতিক এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোশিয়েসনের (আইয়াটা কোড) স্বীকৃত নীতিমালা। কোনো অবাধ্য যাত্রীকে তুমি বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবে। না বুঝলে সে দায় যাত্রীর নয়, ব্যর্থতা তোমার নিজের। সো লিভ হিম অ্যালোন।

চ্যাং পুরোটা সময় সিটে বসে ছিল। একবার মাত্র টয়লেটে গেছে, সাথে সাথে ওর গিটারও গেছে। লায়লা আর ওকে বাধা দেয়নি। সে বুঝতে পেরেছে, হি'জ অ্যা হার্ড নাট টু ক্র্যাক। মচকাবে না, ভাঙার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। অলোকেশ তক্কে তক্কে আছেন, যদিও এখনো তেমন কোনো কারণ তিনি খুঁজে পাননি ওকে সাসপেক্ট করার। তবে সে নিজের নাম ভাড়িয়েছে। কেন করলো, ওনলি গড নোজ!

তবে বিমানে খাবার সার্ভ করার সময় একটা কাণ্ড হলো। কুয়ালালামপুর থেকে ঢাকা-মোট উড়ানসময় সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো। এক ঘণ্টা চলে গেছে। সামান্য টিটবিট শেষে এবার ডিনার সার্ভ করা হচ্ছে। লায়লার সাথে আরো আছে কিটি ফ্রম ভিয়েতনাম। ইনটেলিজেন্ট গার্ল। লায়লা এরই মধ্যে বেয়াড়া ছোকরার ব্যাপারে তাকে টিপ্‌স দিয়েছে। ট্রিট হিম কেয়ারফুলি। সে আমাদের চাকরি খেতে পারে। এসব ছোকরা বড্ড বদমাশ হয়। নো হার্ট টু অ্যাডমায়ার ইভেন বিউটি!
অরেঞ্জ, অ্যাপল জুস, সফ্‌ট অর হার্ড ড্রিঙ্কস? জানতে চায় লায়লা।
শ্যাম্পেন? ভ্রু নাচায় অসভ্য মাইক।

কিটি মনে মনে বলে, শালা দুটাকার ইকোনমি ক্লাসে টিকেট কেটে শ্যাম্পেইন খাবার শখ। বিয়ার আছে তাই ঢের! নিলে নাও, নইলে পানি পিলাও। কিন্তু মুখে সে বিনয়ের অবতার। মিষ্টি (হাসিটা অবশ্য কেবিন ক্রুদের ঠোঁটে সুপার গ্লু দিয়ে সাঁটা। সিনথেটিক। হাসি পেলেও হাসে, কাশি এলেও হাসে, আবার কিছু না পেলেও হাসতে হয়। মোটা মাইনে কি না) হেসে বলল, সরি স্যার। ইউ মে টেক বিয়ার।

নো বিয়ার! এনিথিং এল্‌স?

নো স্যার! সরি স্যার! (আবার হাসি! হাসিতে ট্যাক্স নেই কি না) কিন্তু মাইক ততক্ষণে রেগে আগুন। ইউ ড্যাম লায়ার! আই সি কনিয়্যাক, মাই ফেভারিট ফ্রেঞ্চ ব্রান্ডি। গিভ মি সাম! কিটির প্যান্ট্রি শেলফের এক কোণে এক বোতল কনিয়্যাক ছিল। চ্যাংকে সে ওটা দিতে চায়নি। পাজির পাঝাড়া, বদমেজাজি বানর! কিন্তু শকুনের চোখ বলে কথা। চ্যাং-এর ঠিক চোখে পড়েছে। কথায় বলে না, মাটির নিচে থেকেও শুঁড়ি মদের গন্ধ ঠিক টের পায়।
সরি স্যার! আই জাস্ট মিস ইট। এই নিন, দিচ্ছি। কিটি বলল। কিন্তু তাও থামে না মাইক। নিজের মনে গজর গজর করতেই থাকে।

কিটি যখন মাইকেল চ্যাংকে খাবার দিচ্ছে, ইচ্ছে করেই নয়তো অসাবধানে এক পেগ কনিয়্যাক ঢেলে পড়ে ওর গিটারের গায়ে। কাপড়ের কাভার। কনিয়্যাক হয়তো কাপড় চুঁইয়ে যন্ত্রের ভেতরে ঢুকে থাকবে। মাইকেল চ্যাং তেড়ে গেল কিটির দিকে। লায়লার ওপর পারলে যেন সে হাত চালায়। বলল, ডাকো তোমাদের ম্যানেজার কে আছে। আমার গিটার নষ্ট করেছে। এর ক্ষতিপূরণ চাই আমি, দিতে হবে। সে রীতিমতো লঙ্কাকাণ্ড। কিছুতেই থামে না চ্যাং। কিটির হাত থেকে কনিয়্যাক ছলকে পড়া মাত্র কিসের গন্ধ এল নাকে!

কোত্থেকে এল গন্ধ! এ তো অলোকেশের অচেনা নয়! তীব্র ঝাঁঝালো বিজাতীয় স্মেল! কনিয়্যাকের সাথে নিষিদ্ধ কিছুর কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন!

তাহলে এই কাহিনি! ডিসি অলোকেশ যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন। তার মানে জিলানির অনুমান মিথ্যে নয়। ডালমে মেলা কুছ কালা হ্যায়! অলোকেশ কিছু বললেন না। এমনকি গোঁয়াড় গোবিন্দ মাইকের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। শুধু ওই গিটার কোথায় থাকছে সেদিকে কড়া নজর তার।

৬.

এমএইচ-১৯৬ ঢাকায় ল্যান্ড করা মাত্রই সেলফোন অন করলেন ডিসি অলোকেশ। এক্ষুনি এয়ারপোর্ট শিফ্‌ট-ইন-চার্জ এসিকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। কিন্তু ওর নামটা এখনও জানা হলো না। মাইকেল চ্যাং তার ছদ্মনাম। অলোকেশ বেশ বুঝতে পারছেন ও আসলে একটা আন্তর্জাতিক মাফিয়া গ্রুপের সক্রিয় সদস্য বা অন-পেমেন্ট ক্যারিয়ার। চ্যাং এই গ্রুপের রিং-লিডার বা পালের গোদা না হলেও সমস্যা নেই, কান টানলে মাথা ঠিক আসবে। প্রয়োজনে ওর থেকে তথ্য নিয়ে ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশি চাঁইদের বিরুদ্ধে রেড অ্যালার্ট জারির ব্যবস্থা করতে হবে।

মাইক ফোরটিনের নম্বর তার জানা। ডেলটার মাধ্যমে এসি মারুফ খবর পৌঁছে দেন আলোকেশ। নতুন ব্যাচের মেধাবী অফিসার মারুফ। পুলিশেও চাকরি করেছে কিছুদিন। সুতরাং তার ওপর ভরসা করা যায়।

হ্যালো মারুফ, অ্যা পোটেনশ্‌ল সাসপেক্ট ফ্রম কুয়ালালামপুর, এমএইচ-১৯৬ ইজ জাস্ট গেটিং ইনটু দ্য এয়ারপোর্ট। প্লিজ টেক ইমিডিয়েট স্টেপস টু ক্যাচ হিম রেডহ্যান্ডেড।

ইয়েস স্যার। আমি এক্ষুনি ইমিগ্রেশনে যোগাযোগ করছি। নাম না জানলেও ক্ষতি নেই। আমরা এমএইচ ফ্রম কুয়ালালামপুর ফ্লাইটের সব ফরেন যাত্রীকে ওয়াচে রাখছি।

নো নিড টু ডু দ্যাট। হ্যারাসমেন্ট হবে। আমি ওর সাথে আছি। জাস্ট কল ফর মাইক ফোরটিন, ফিফটিন অ্যান্ড ওয়ান। হি হ্যাজ গট অ্যা গিটার। হোয়াট আই সাসপেক্ট।

ওকে স্যার। কী নিয়ে আসছে স্যার?

যদি আমার ভুল না হয়, ক্যারিয়ার নেশা বা ড্রাগ জাতীয় কিছু আনছে। মে বি মেনি মোর থিংস।

রিয়েলি! ও মাই গড! আর কী কী হতে পারে?

সামথিং! হেভি। হি কান্‌ট ক্যারি দ্য গিটার। আমি কিন্তু ওটা ধরে দেখিনি। আই মিন সুযোগ পাইনি। ব্রিজ লাগানো হয়েছে। জাস্ট কাম আপ মারুফ। গেট নাম্বার আলফা টু।

আসছি স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

অন-ডিউটি এসি কাস্টমসের সাথে বাতচিৎ সেরে অলোকেশ মুহূর্তে চ্যাং-এর পাশাপাশি এসে পড়লেন। তিনি জানেন পাখি এখন খাঁচার ভেতরে। চাইলেও পালাতে পারবে না। তাও সাবধানের মার নেই। জিনিসখানা কোথাও ফেলে দিতে পারলেই এ যাত্রা পার পেয়ে যাবে চ্যাং। অলোকেশ তা হতে দেবেন না। কিছুতেই না।

চ্যাং-এর কাঁধে হাত রেখে দুলামিয়ার মতো আদুরে সুরে বললেন অলোকেশ, চলো একসাথে এগোই। ।
ও মিস্টার রয়। থ্যাঙ্কস। আমার একটু দেরি হবে। ইউ ক্যারি অন প্লিজ। চ্যাং বলল।
ঘুঘু এখনো বুঝতে পারেনি, অলোকেশ তাকে টার্গেট করেছে। এত্ত বোকা? নাকি ভান ধরেছে! কুয়ালালাম এয়াপোর্টে চ্যাং তাকে কাস্টমস অফিসার জিলানির সাথে আলাপ করতে দেখেছে। সুতরাং তার সন্দেহ হওয়াটাই বরং স্বাভাবিক।
চলো চলো, তুমি আমার অতিথি। একা ফেলে যাই কী করে! বলেই বাঁ হাতের কনুই ধরে হ্যাঁচকা টানে অলোকেশ তার শিকার এগিয়ে নেন সামনে। ততক্ষণে এসি মারুফ সদলবলে হাজির। চ্যাংকে পারলে যেন চ্যাংদোলা করে নিয়ে যায়। কিন্তু 'আইআটা কোড' ওরা সবাই জানে। চাইলেই শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে কোনো ফরেন প্যাসেঞ্জারের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করা যায় না। এতে বহির্বিশ্বে সুনাম নষ্ট হয়। সম্মানহানি হয়!
রোক্‌কে! লেট হিম কনফেস। যদি না করে তখন দেখা যাবে। অলোকেশ বললেন।
মাসুম বাচ্চার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে চ্যাং। যেন সে কিচ্ছু বোঝে না।

হোয়াট ইজ দিস মিস্টার রয়! আই'ম ইওর গেস্ট। অ্যান্ড হু ইউ আর টু প্রেস মি! বিপন্ন বিরক্ত মাইকেল চ্যাং।
অন-ডিউটি ডেলটা অলোকেশের পরিচয় মেলে ধরেন। অলোকেশ একখানা ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দেন মিস্টার চ্যাং-এর নাকের ডগায়।

নাইস মিটিং ইউ এগেন মিস্টার রয়! আমাকে এবার যেতে দাও প্লিজ। আই'ম গেটিং লেট!
শিওর স্যার। মে আই চেক ইওর গিটার! ততক্ষণে চ্যাংকে ওরা কাস্টম্‌স লাউঞ্জে নিয়ে এসেছে। খবর রটে গেছে, চৌকস ডিসি অলোকেশ মালয়েশিয়া থেকে ড্রাগমাফিয়া পাকড়াও করে এনেছেন। জলজ্যান্ত জবরদস্ত মাল! সে নাকি আবার গানবাজনাও করে। গিটার বাজায়! এমন মজার কথা আগে কেউ শোনেনি! কেন বাবা! স্মাগলার বলে কি সে মানুষ নয়! সুরের সাধনা তার জন্য নিষিদ্ধ নাকি!
আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)-এর অতি উৎসাহী এক জওয়ান ঢুস করে চ্যাং-এর পেটে খানিক ঠুসি মেরে দিল।
পুলিশি ঠুসি খেয়ে কোঁৎ করে উঠল চ্যাং।
আহা হা, করো কী! করো কী! বাবাজির পেটটা ফেটে যাবে যে! নাটুকে ঢঙে বললেন সুরসিক ডেলটা।

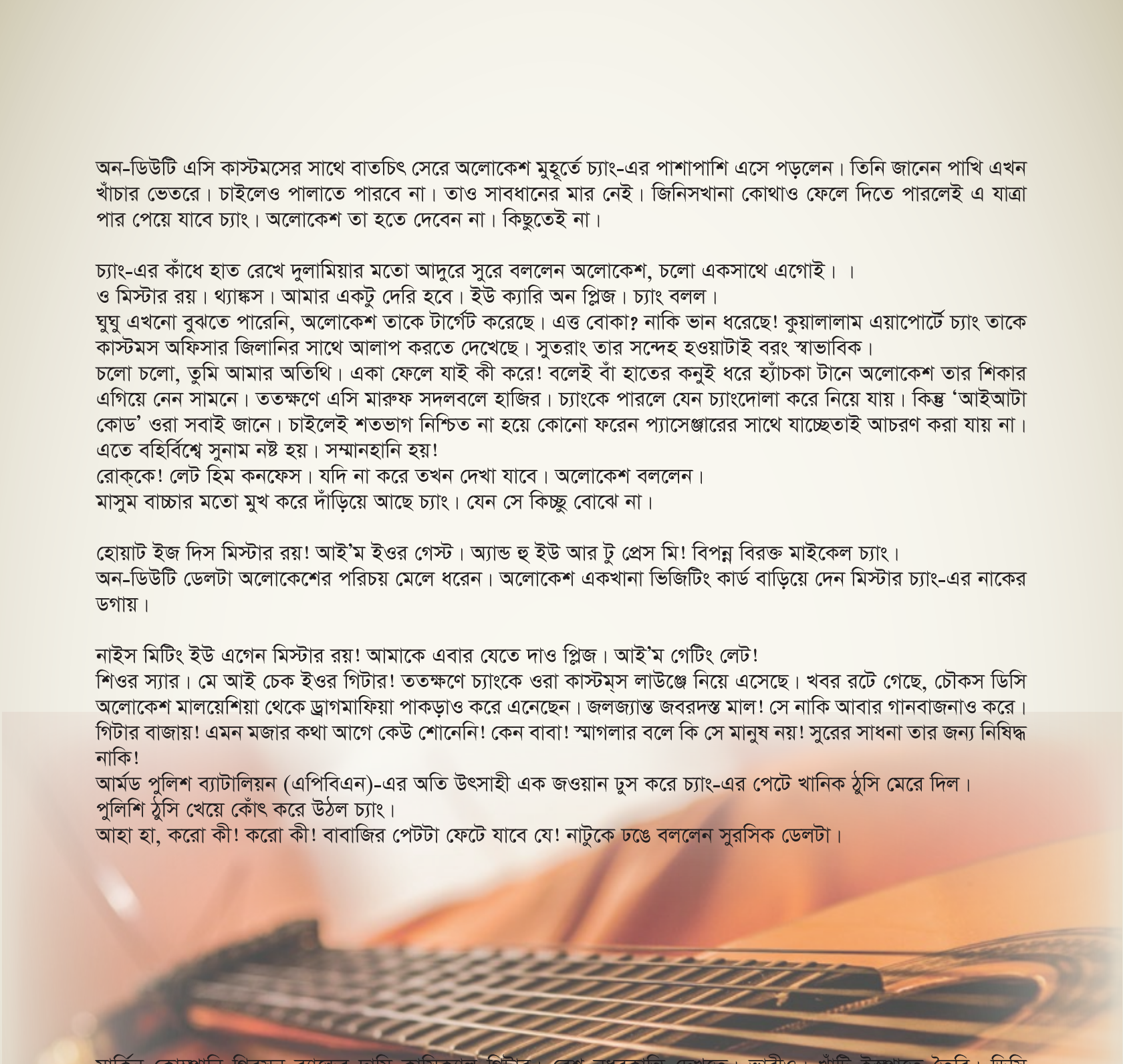

মার্কিন কোম্পানি গিবসন ব্র্যান্ডের দামি ক্লাসিক্যাল গিটার। বেশ নধরকান্তি দেখতে। ভারীও। খাঁটি ইস্পাতে তৈরি। ডিসি অলোকেশ ছাত্রজীবনে কিছুদিন গিটার নিয়ে টুংটাং করেছেন। তাতে সুর না বেরোলেও গিটারের খোলনলচে, তারটার বিষয়ে তার খানিক জ্ঞানগম্যি হয়েছে।
ক্লাসিক্যাল গিটারের সাম্রাজ্যে গিবসন ইউএসএ নামী ব্র্যান্ড তিনি জানেন। দামও অনেক। বাংলাদেশ কারেন্সিতে কম করে হলেও লাখ চারেক। চ্যাং-এর চেহারা দেখে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে বলেই মনে হয়। তবে দুটো ভুল সে করেছে। প্রথমত নাম ভাড়িয়েছে, তার সাধের গিটারখানা কখনো ঘাড়ে বহন করেনি, স্ক্যানিং করতে দেয়নি। সবচেয়ে জটিল হয়েছে যখন বিমানবালার হাত থেকে ছলকেপড়া কনিয়্যাক গিটারে ঢোকামাত্র অলোকেশ সেই চিরচেনা বিজাতীয় গন্ধ পান, তখনই মোটামুটি তিনি নিশ্চিত হন যে ইনি কোনো সুরের সাধক নন, বরং নেশাজগতের কুখ্যাত সদস্য।
বিখ্যাত ফরাসি ব্রান্ডি কনিয়্যাক, ফ্রান্সের কনিয়্যাক শহরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। লালচে দেখতে স্পেশাল জাতের আঙুর

সেন্ট এমিলিয়ন থেকে বানানো হয় এই ব্রান্ডি। ইংলিশ স্পেলিং সিওজিএনএসি। না জানলে তারা বলবেন কগন্যাক! এতে যথেষ্ট মাত্রায় অ্যালকোহল (প্রায় চল্লিশ ভাগ) থাকে যা মারিজুয়ানা বা ক্যানাবিসের সংস্পর্শে এলে বিক্রিয়া করে। এক রকম গন্ধ বেরোয়, অনেকটা যেন আলুপোড়া বা নিভিয়ে ফেলা তুষের আগুনের মতো। অলোকেশ ফরেনসিক ল্যাবে নিজে এমন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে দেখেছেন। লন্ডনে, নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এক ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে।

তার গ্রে-হাউন্ডের নাক। স্মেল চিনতে কখনো ভুল হয় না। দুর্ধর্ষ রহস্য বলে কথা!
শিফট ইন-চার্জ এসি মারুফকে বললেন, তুমি বরং গিটারখানা একবার স্ক্যান করিয়ে আনো।
অমনি হায় হায় করে উঠল মাইকেল চ্যাং। এখনো বোধ হয় সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে। এই নাটকের ক্লাইম্যাক্স কোথায়!

লেট'স ডু আওয়ার ডিউটি মিস্টার চ্যাং। বড্ড রূঢ় শোনায় অলোকেশের কণ্ঠ। নাচতে নেমে ঘোমটা টানার অবকাশ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্ক্যানিং-এ তেমন কিছুই ধরা পড়ল না। অপারেটর বললেন, সরি স্যার, ভেতরে কিছু নেই।
কিচ্ছু নেই? তাজ্জব আলোকেশ। এ হতেই পারে না। দেখেছেন গিটারখানা কত ভারী।

তিনি নিজে নেড়েচেড়ে দেখলেন। গিটারের পেটের দিকে ধাতব পেট। থাকতেই পারে। গিবসনের এ হয়তো নতুন সংস্করণ। চারখানা ক্যাটগাট (বিড়ালের ভুঁড়ি দিয়ে বানানো) স্ট্রিং-এর নিচে ছিদ্র দিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে দেখছেন অলোকেশ। কিছুর নাগাল মিলছে না।

একটু যেন দমে যান অলোকেশ। অন্য এজেন্সির কেউ কেউ মুখ টিপে হাসছে। যেন বলতে চাইছে প্রতি ডুবেই মুক্তো ফলে না। চৌকস ডেপুটি কমিশনার হাতির বদলে এবার অশ্বডিম্ব প্রসব করেছেন। কিন্তু যারা তাকে চেনে তারা এত সহজে হতাশ হননি। ওয়েট, অ্যান্ড সি। দেখি না কী হয়! অলোকেশ গিটার নিয়ে বড্ড কসরত করছেন। ওদিকে সাসপেক্ট মাইকেল চ্যাং তাড়া দিচ্ছে, আমার গিটার কই, গিটার দেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।
নাহ্ কিছু নেই। গিটারের পেটে ঢু ঢু! সত্যি বোকা বনে গেছেন অলোকেশ।
সত্যিই কি তাই!
এই কে আছো, জলদি এক বোতল কনিয়্যাক লে আও। লঘু সুরে নির্দেশ দেন ডিসি অলোকেশ।
কনিয়্যাক কী জিনিস ডেলটা জানেন না। এসি মারুফ তাকে বুঝিয়ে দেন। দোতলায় ডিউটি-ফ্রি শপে পাওয়া যায়। অলোকেশ নগদ রিঙ্গিত দিলেন ওটা আনার জন্য।
অনেক দিন বাদে অলোকেশ আবার সেই বিক্রিয়া করে দেখলেন। কনিয়্যাকের ছিপি খুলে পুরো বোতল ওপর করে দেন গিবসন কোম্পানির দামি গিটারের ওপর। বরং বলা যায় ফরাসি ব্রান্ডি দিয়ে গোসল করান নধরকান্তি সুডৌল পাছাঅলা গিটারটাকে। অমনি গন্ধ ছুটল। সেই চেনা আলুপোড়া স্মেল।
কী, কিছু লাগছে নাকে? উপস্থিত সবার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেন ডিসি অলোকেশ।
সবাই নাক ঝাড়ে, হাতির শুঁড়ের মতো শোঁ শোঁ শব্দে ফুসফুসে বাতাস টানে। ডেলটা বলে, হ্যাঁ, পাচ্ছি স্যার। তবে আলুপোড়া নয়, বেগুনপোড়া। কেউ বলে, সিসেপোড়া। এসি মারুফ এবার নিশ্চিত, স্যারের অনুমান মিথ্যে নয়। তিনি ডিবি পুলিশ ডাকেন। অলোকেশ মাইক ফোরটিনকে বললেন, নজরুল, ভাঙো তো, গিটার ভেঙে ফেলো। ভেতরে জিনিস আছে। আমি নিশ্চিত। না পেলে দায় আমার। চ্যাং নিজে থেকে কিছু বলবে না।
নির্দেশ পাওয়া মাত্র গিটার ভেঙে ন'টুকরো। অমনি গিটারের ডগার দিকে সূক্ষ্ম সেলোটেপে আঁটা দশ প্যাকেট সাদা গুঁড়ো বেরিয়ে এলো। নারকোটিক্স বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট তৎক্ষণাত টেস্ট করে রায় দিলেন, ইয়েস, দিস ইজ ক্যানাবিস পাউডার।
আর সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন, ডিসি অলোকেশ ইজ স্পেশাল, এক্সেপশনাল। তিনি স্মাগলার চেনেন। প্রশংসার বন্যা তার প্রাপ্য।

- লেখক **অরুণ কুমার বিশ্বাস**, যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর

Seeing behind the Scene...

Customs Intelligence

Cross-Border Trade and the Issues of Interconnectedness and Integration

Shakila Pervin

The trends of globalization accept interconnection and integration of trade and business, culture and communication, values and beliefs to be the key dynamics influencing the flow of economic growth and social development. Recognizing the importance of this interconnection and integration, the World Customs Organization (WCO) through its 'Customs in the 21st Century' documents focuses on the issues like *'globally networked customs, better coordinated border management (CBM), intelligence-driven risk management, customs-trade partnership...'* along with many other concepts relating to the modernization, capacity building and integrity of the whole customs community as the most important factors for implementing customs departments' reform initiatives. With the familiarization of the concept of reform, issues and activities relating to the cross-border trade gains its momentum within the regime of free trade economy. Cross-border trade demands the development of both inter and intra communication, connection, integration and coordination at the same time. That is why considering the importance and sensitivity of cross-border trade a well-developed and better organized integrated border management system has been introduced emphasizing the involvement of all the stakeholders to ensure interconnectivity and integration between businesses, countries, nations and cultures.

The necessity of interconnectivity and integration brings forth the inevitability of enhanced coordinated border management for cross-border trade. Cross-border trade demands the involvement of all the concerned regulatory authorities to oversee, examine and facilitate the movement of goods, passengers and vehicles at the same time. Considering the reality, WCO focuses on enhanced integration and coordination among the concerned border authorities by mentioning that-

i) The recognition of customs or the agency responsible for the Customs functions as the lead front-line administration at national borders for controlling the movement of goods. According to the UN Trade Facilitation Network, Customs administrations are usually best suited to develop integrated procedures for processing goods at points of entry; and

ii) The introduction of the electronic Single Window concept that allows a trader to provide all necessary information and documentation once to the designated agency that, in turn, distributes the information to all relevant agencies.

The responsibility of the customs authority to lead the front-line authority at national borders for monitoring and regulating the movements of goods, passengers and vehicles along with the importance of initiating a single window information availability electronically have been emphasized through the abovementioned references. Both the points replicate a commonly accepted proposition that the inevitable role of customs authority in facilitating cross-border trade can always be enhanced and accelerated by initiating electronic reform initiatives. These reform initiatives have already been accepted as a common phenomenon in the trade and business culture of Bangladesh after receiving the membership of WTO as well as some other regional trade and business treaties and initiatives. So, after realizing the fact that when combined with liberal trade regimes and business-friendly activities, efficient and effective customs and border management can remarkably improve the condition of trade and economic growth, Bangladesh as a member of the WCO is very much concerned about developing a better coordinated border management system. When the issues of cross-border trade along with the importance of interconnectivity and integration appear in front of the trade bodies as well as in front of the other stakeholders, some common issues like simpler customs procedures, transparency in customs and all the other related activities and ensuring corruption free business environment gain the status of the most debatable factors. Political and economic condition, balance of trade, level of infrastructure development and some other relevant issues relating to the trade and businesses of the concerned countries have been brought under discussion through a comparative analysis.

For example, recently referring to the speech of the current commerce minister of Bangladesh Tofail Ahmed it has been published that *'Trade deal with India to be renewed soon'* (The daily Star 2015). The most remarkable part of this news is that *'The government is set to renew the India-Bangladesh trade agreement soon, with the provision to allow Bangladeshi transports to use the Indian corridor for transit to Bhutan and Nepal.'* Signifying the fall of the cost of business between India, Bangladesh, Nepal and Bhutan, it has been mentioned that the trade and business related connection and relationship of these neighbouring countries will be enhanced with the renewal of this trade agreement. But actually it is not all about the news. By mentioning the point of the balance of trade between India and Bangladesh it has been clarified how *'the balance of trade between the two countries is heavily in favour of India'.* Apart from this issue of balance of trade some other sensitive issues like proper coordination and integration between the regulatory authorities, transparent and corruption free effective and efficient participation, simplification of policy level resolutions are still in a position to be decided on.

Through the replication of the abovementioned example it has been clarified that cross-border trade requires such a sound condition of interconnectivity and integration where every single stakeholder will have the opportunity to perform effectively and efficiently so that they can be made responsible for their authorized function as well. For this purpose, referring to Georgia's success over managing an enhanced coordinated border management while performing cross-border trade, Central Asia Regional Economic Cooperation Program in its *"At the Border and Behind the Border: Integrated Trade Facilitation- Reforms and Implementation"* which is published from the Asian Development Bank mentions that:

i. *A fair and efficient tax system characterized be low taxes, clear and simple deduction rulesand fair administration;*

ii. *Liberal labour markets;*

iii. *Low crime and corruption (according to Transparency International's Global corruption Barometer for 2010-2011, only 3% of respondents said they had paid a bribe in Georgia over the prior 12 months in contrast to 5% for the EU);*

iv. *A solid sovereign balance sheet and good foreign credit ratings;*

v. *A stable and conservatively managed banking sector;*

vi. *A multimodal maritime and land transport infrastructure that is well developed for logistics, manufacturing and trade; .....* have been shaped and reshaped to ensure better border management system.

The example of Georgia can be a good example in developing cross-border relationships among the neighbouring countries. But the reform and implementation initiatives may not always be applicable for every country because of the diversified social, political and economic condition of different countries. So, every country must have its own agenda and propositions in developing cross-border trade relationships. To be more specific, it is worth saying that the developing countries like Bangladesh need to be more conscious and specific relating to the policy level agenda setting and development while signing a bilateral treaty for cross-border trade.

References

Asian Development Bank 2014, "At the Border and Behind the Border: Integrated Trade Facilitation- Reforms and Implementation, Workshop Proceedings, Tbilisi, Georgia, 10- 13 April, 2013.

Gordhan, P 2007, 'Customs in the 21st Century', *World Customs Journal,* vol. 1, no 1, pp. 49-54.

Marenin, O 2010, 'Challenges for Integrated Border Management in the European Union', *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed forces.*

Polner, M 2011, 'Coordinated Border Management: from theory to practice', *World Customs Jounal,* vol. 5, no. 2, pp. 49- 64.

The Daily Star 2015, 'Trade deal with India to be renewed soon', viewed on 14 May 2015, viewed from <http://www.thedailystar.net/business/trade-deal-india-be-renewed-soon- tofail-75262>

World Customs Organization 2008, 'Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade facilitation and Border Security', Annex II to Doc SC 0090E1a, viewed on 15 May 2015, viewed from <http://www.wcoomd.org/en/topics/keyissues/~/media/3EE76BC165B9409CBE6E31F9923CABB8.ashx>

- Author **Shakila Pervin**, Deputy Commissioner, Large Taxpayers' Unit (VAT)

(Un)customary Musings

Nusrat Jahan Shompa

I wanted to define the essay as ‘musings’ only. But hard thoughts should not be called ‘musings’! So musing is not an appropriate word for hard and not-so-peaceful thoughts. But peaceful thoughts need not be registered and written for publication. Writing about customs and VAT is not easy. It is even tougher to write it in pleasant-to-read manner. And it is perhaps impossible to make it interesting. So when a ‘write-up’ is required which should be relevant enough to be published in yearly publication of ‘Customs Intelligence’, situation can get worse only. Because whatever I am planning to write is neither soft nor sweet, it is rather centrifugal. Musings are supposed to be very sweet and comforting; thoughts are brought into a calm center of your mind but centrifugal thoughts head towards all possible direction landing you nowhere with restlessness. Am I getting anywhere!!!!?

Anyway, before I get

all of you confused with my confusion let's plumb into the point; the point of mathematics, the point of no-return (perhaps). The budgetary and fiscal target of this year is BDT 1530 crores which have been marked down lately into 1311 crores. Why mathematics? Wait and watch!!!

Castle in the air (or flat in Gulshan!)……

My bariwala was informed initially that I work in NBR and did not quite apprehend what does that mean! But the day he saw the monogram in my office vehicle he 'understood' the cadre I work in. Hmmmmmm…… Later on when the question of raising the house-rent came then he judiciously surmised "why can't you pay the increased rent? Your daughter work in customs!!!!!" He asked my father jokingly (perhaps!). 1530 crores taka……a big sum hits me suddenly…..what does this sum signify……yes I remember……the target of the custom house I work in…..now that has been lowered to 1311 crores….stream of consciousness process….perhaps!!

I met my friend many-many years later who is happily married and is a proud university teacher. She (jokingly perhaps!) asked me that have I already bought flat in Gulshan or planning for one? That was the first question that surfaced in her head about my 'well-being'! I did not answer and argue. I ironically remember an astronomical sum……114429 crores taka……...target of something…...perhaps NBR…….for the fiscal year of 2014-15. Don't I work in NBR…..yes…yes…I do……I remember!!!

I went to see/meet a potential 'patro' who of course does not belong to this cadre and perhaps have all sorts of ideas about this cadre. His father and my father sat amicably along with 'Mr. patro' and told me to order the menu since the meeting was arranged in a Chinese restaurant. I ordered very light food which made the father of my potential bridegroom use the exclamatory tone *'Eto kom order dile! Customs' er lokjon to khai khai kore'!!!!* He said so jokingly (perhaps!). Mathematics hits me again! This time 116500 crores…… …target of….. …..NBR again…….for the fiscal year……..yes 2015-16…….haven't I already confessed that I work under NBR?!?

Mary goes round and round:……

Everything goes round…….. and round…….. and round…….. and round…….. and therefore we don't seem to reach anywhere …… any custom house will give you this non-productive circular feeling as if things-has-to-be-done are getting generated with double-speed than the things-has-been-done. I despairingly infer at the end of the day. People are impatient outside to get their files done (within 5 minutes of course!) and if you have dealt with one set another set arrives! Then what actually we keep doing? So I let the files enter my room, pour my attention into it, let myself get lost in the labyrinth of H S Code, wrestle with BCT to find the relevant chapter, try to entertain myself with various H S code related samples , or give 'jhari' to the C & F for not bringing in the appropriate samples, try to find the irregularities in paper, ensure that every single electronic item does not get the benefit of SROs, enter into the value database, change the red lane to yellow, jump out of the room anxiously if commissioner sir calls me, rush down if any senior officer gives me 'salaam', jumps out again to collect the latest revenue figure, prepare letters to be sent to NBR, attend the telephone call that has been ringing impatiently because the baggage of some biggies has arrived ICD and ready for disposal, occasionally find ourselves into the container in the time of re-examination…….and

what not? Let me gasp for breath……! Does any of my acquaintances/friends is familiar with this scene? Or do these scenes anyway signify my non-existent flat in Gulshan?

'Sound and Fury'……:

After Five I decide to call it a day and plan to wind up for today. Another eager-to-down-the-file customer arrives; *'Madam, ei file ta pash kore den….ekta shoi diye den'…..* that's keeps happening as long as I will remain in the office. And I also keep complying to their sign anxiety up to 7 AM not because I was enjoying delivering service but because I had to. Otherwise all sorts of 'bad behavior' rumor will spread. People will happily indulge in all sorts of rumor that will be believable as well because people already want to believe stories about you. Prejudice kills your credit, robs the credit of hard-work you put behind every file or service delivery and highlights your short-comings. I imaginatively try to step into other people's perception about us. Set aside all the 6-digit-crores and figures that keeps hitting me occasionally; earning money for the government is not easy and perhaps a hugely thankless job. When you walk out of the office feeling tired and exhausted and thoughts like these hit you whether all the signatures and files were proper, was the LC right, was the B/L properly checked, was the value rightly judged, were all the H S Codes rightly chosen, was I mindful enough to check 3-pages-long H S Codes properly? All these questions plague you day after day. Does people humorously enquiring or hinting at my imaginary flat at Gulshan knows about any of these anxiety? Do they know or care to know that the technical complexity of the job itself makes you vulnerable to a lot of mistakes! It is almost two-third of the time that the mistake is unintentional. It is almost half-the-time that the volume of work and the subsidiary fatigue makes this humanly impossible to go through all the details. It is almost one-third-of-the-time that overlooking many things is the best possible approach.

Blowing hot, blowing cold:……

Working in any custom house can be a rich source of study or philosophical pondering about human psychology. It is so interesting and despairing to witness the possible and impossible reaction, over-reaction and under-reaction but all these for a single goal called 'profit' or 'money-making'. Is it actually possible to maintain a 'good-relationship' with client while discharging my customary duties? The answer cannot be provided in definitive term like 'yes' or 'no'. The reaction can vary from simple negation to heavy duty histrionics attitude depending on the profit they have supposed to have garnered from a single consignment. *"Apni aamake gali dilen keno"…* you get hear this when you possibly have not uttered a single word! *"Sir 'Madam to eto (!!) taka chai"….*these are the another customary approach we regularly get 'rewarded' with. In fact suspension of disbelief is not enough, you need to have complete dislocation of your creative faculties! How many people outside know these? You will be a 'good officer' only if you keep pandering to their interest. They will completely forget all the good consideration and 'aantorikota' we regularly shower on them. They will purposely forget I have done their files even when I was exhausted and on my way out. They will conveniently overlook all the good-talk we occasionally have with them. Believe me, they are going to catch you unaware with the all the 'good-talk' you have/had with them. Does anyone know how

much diplomacy we have to employ to change the H S Code so that the duty-tax is raised? Does any report about you consist of your personal endeavor to increase revenue collection? How many people know about the amount of heat and pressure we feel if we raise the value? How many people know how hot that is within a container where we find ourselves in times of re-examination? How many people care to know about human impossibility to examine all the goods in exact quantity? Will they ever experience the fatigue we feel after every physical examination of goods in the container?

Dokhiner Janala, 'Neem' gaach against tie-dye sky

There was a little poem that named 'Tree at My Window' which I found in my school syllabus but had no idea what that meant or however deep that might impact on our psyche. After many years I found a tree in my window with so many private and deep implications. Amidst all the hustle-bustle I have found a little oasis in my window-sight; a 'neem' tree. This 'neem' tree is like little private oasis for me. A little green contrasting sharply the heavily-peached-jetty, containers, trucks, and bizzare-looking cranes. But if I crane my neck a little left and look at the window I find my neem-tree along with its tiny 'neemphool' swinging comfortably in south-breeze and saying 'everything is alright' providing my soul a deep relief. My neem-tree is also ably accompanied by a middle-sized 'bot-gaach' with tiny red but inedible bot-fruits. My window-view is not only a comforting relief for me but it also has become a place of my private and uncommon friends, unusual companies: a half-drum with 'puishak chara', a little guava-tree over concrete-shade, and a 'bot-chara' over the concrete (again!) and water-tank of cement. But don't think only inanimate objects people my private world! A cute black-cat who loves to sleep on the cemented hot-shade has been befriended with me. There is another black-and-white shaded cat that also has acknowledged and loved my presence (perhaps!) which also comes to take sun-bath with its 'don't-disturb-me' attitude. To make the assortment of silent friends more lively some 'shalik pakhi' regularly visit the place with their 'kichir-michir'.

Every day I look several times at my unusual companions and feel the unusual out-of-the-world serenity they exude. They are not worried about the revenue targets, revenue leakage or shortfalls! They hardly care about misdeclaration and punishmen! They remain in oblivion about section 32 or section 156. They are entitled not to care about the astronomical sum of 1530 crores or 1311 crores of taka. I struggle to hide my jealousy about their care-free, non-challant existence. They live in a kind of oblivion about the pitfalls of human nature. They seem to be blithely unaware of CDs, SDs, ATVs, CPCs, AITs, red or yellow lanes or deliveries or whatever term we keep using all the day long. Nor do they have to wrestle with re-examination, revenue leakage, SROs, 20/40 feet containers or container carrying trains or cranes. They are just there providing solace to my fatigued conciousness. What a cute little world at my window! What a lovely state of innocence beside crude mundane concerns! I take a cup of tea and keep looking at them wistfully.

A Point of Solace……

My favourite place in this concrete ambience is the place popularly known as ‘aamtola’ adjacent to the mosque. There is also a ‘majar’ lying adjacent to the mosque pervading a solemnity over the place. Though I never visited the place myself but always looked down from the window of my 3rd floor-room and savored in the solemn quietness of the ‘namaj’ after the ‘Zohur ajan’. Perhaps I never will be successful in ridding myself from the desire of visiting the place and the holy quietness of that time. Enjoying the sun, rain and the ‘dokhin hawa’ turning into ‘bheshoj hawa’ as it passes through the neem-tree seem to be my favourite leisure-time activities making me take a zoom-out view of the meaningless scramble around. Do we really need all the money? Do we always need the profit we are running after? Can we always capitalize on all the profit that we have garnered in? Have we been endowed with the infinite consuming capacities? How much do we actually need? My hard musings get themselves released and find some solace into metaphysical musings. A zoom-out view of our existence makes life much more bearable and even more lovable (perhaps!). The ‘neem-gaach’ in my southern window against the backdrop of blue-white or blue-ash tie-dye sky has never failed to put a temporary solace to my weary soul.

- Author **Nusrat Jahan Shompa**, Assistant Commissioner (28th Batch), Custom House (ICD), Kamalapur *(For opinions Email:jhn.nusrat@gmail.com.This essay is based on author’s personal opinion and done in good humour. She is apologizing in advance if anybody gets hurt by her opinion.)*

Vanguard of Revenue Protection

Customs Intelligence

তৃতীয় নয়ন

মো: তারেক মাহমুদ

সবাই যা দেখে, আমিও তাই-ই দেখি। কিন্তু ভিন্নভাবে দেখি। সবাই দুচোখ দিয়ে দেখে। আমি দুচোখের সাথে তৃতীয় আরেকটি চোখ দিয়ে দেখি। গোয়েন্দার চোখ দিয়ে। সবাই ঘটনা দেখে, আমি ঘটনার আড়ালের ঘটনা দেখি। সবাই অন্ধের হাতি দেখার মতো একেকটি অংশ একেকবারে দেখে। অন্ধের মতো কেউ হাতির পা ধরে সেটিকে গাছের গুড়ি ধরে নেয়, কেউ হাতির পেট ধরে সেটিকে দেয়াল হিসেবে চিন্তা করে, কেউ বা আবার লেজ ধরে হাতিকে চাবুক হিসেবে দেখে। আমি হাতিকে হাতি হিসেবেই দেখি।

অগণিত মানুষের ভীড়ে আমি ওই মানুষটিকে দেখি যে হাতে-পায়ে চোখে-নাকে অন্য দশজনের মতোই মানুষ, কিন্তু আমার চোখে ভিন্ন মানুষ। অসংখ্য ট্রাকের ভীড়ে আমি ওই ট্রাকটিই খুঁজে নিই, যেটি চোরাচালানকৃত বা শুল্ক ফাঁকি দেয়া মালামাল বহন করছে। খেচর হয়ে আকাশে ভেসে ভেসে মাটিতে বিচরণরত প্রাণীগুলোর মধ্যে থেকে চিল যেমন ঠিক প্রাণীটিকেই বেছে নেয় শিকারের জন্য, আমিও ঠিক তেমনিভাবে অগণিত মানুষের ভীড় থেকে বেছে নিই আমার টার্গেট। কী স্থলে, কী জলে, কী অন্তরিক্ষে! আনাচে-কানাচে সদা আমার বিচরণ।

আমার শিকারি চোখ বিস্তৃত দেশের প্রতি প্রান্তরে। সুতীক্ষ্ণ নেত্র খুঁজে ফেরে কখনো শরীরের নিভৃত অঞ্চলের সোনার খনি, কখনো পাদুকা বা ব্যাগে সন্তর্পণে লুকানো মুদ্রা, কখনো বাসা-বাড়ির তোশকের তলায় লুকানো কোনো মোহাম্মদ আলীর অবৈধ টাকা বা দেয়ালে লাগানো তাকের ভাঁজে সন্তর্পণে লুকানো সোনার খনি, কখনো বন্ড সুবিধার অপব্যবহারকারী কোনো অসাধু ব্যবসায়ীর পণ্যবাহী ট্রাক বা গোডাউন, কখনো ভেজাল প্রসাধনীর উৎপাদকের কারখানা, কখনো কন্টেইনারের কোণে লুকানো কোনো দামি হোন্ডায়, কখনো আবার শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা কোনো দামি গাড়ি, অথবা কোনো ভিনদেশি নাগরিকের রেস্তোরাঁয় অনুমতিবিহীনভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বিক্রয়ের জন্য আনা মদ বা আমদানি নিষিদ্ধ যৌন উত্তেজক ওষুধের সেলফে। প্রযোজ্য শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে আনা পণ্য চালান, অপঘোষণার মাধ্যমে আনীত পণ্য চালান দেশের প্রতিযোগিতামূলক বাজার যেন নষ্ট না করতে পারে, সেজন্য সেগুলোর অনুপ্রবেশ রোধে আমার সে চোখ নির্ঘুমভাবে পাহারা দেয় প্রতিনিয়তই।

নিষিদ্ধ পণ্য, অস্ত্র, মাদক যাতে আমার দেশ ও মানুষের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করতে না পারে সেটি নিশ্চিতে আমার সেই তৃতীয় নয়ন সদা জাগ্রত। সে নিশ্চিত করতে চায় গুণগতমান পরীক্ষা ব্যতীত কোনো ওষুধ বা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোনো পণ্যসামগ্রী যাতে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে না পারে।

আমার এ নয়নের চেয়ে ক্ষমতাধর কোনো স্ক্যানার আজও আবিষ্কৃত হয়নি! বিমানের টয়লেট থেকে শুরু করে বোর্ডিং ব্রিজ, লাউঞ্জ, প্যাসেজ, পণ্যের কন্টেইনার, পণ্যবাহী ট্রাকসহ সর্বত্রই প্রতিনিয়ত স্ক্যান করছে সে। তীক্ষ্ম দৃষ্টি বিমানের টয়লেট কিংবা দেয়াল ভেদ করে বের করে এনেছে সোনার খনি, হুইল চেয়ার থেকে সোনার বার, পর্দানশীল নারীর চুলের খোপা বা বিদেশি কূটনীতিকের ব্যাগ থেকে কেজি কেজি স্বর্ণ, তিন প্রস্থ কাপড়ের স্তর ভেদ করে বিপুল পরিমাণে অনুমোদনবিহীন ওষুধ, কন্টেইনারের নিভৃত কোণ থেকে ৫০ সিসি ঘোষণা দিয়ে আনা ৪০০ সিসির মোটরসাইকেল। অর্থ পাচার, পুরাকীর্তি পাচার, বিরল বন্যপ্রাণী পাচার রোধে তৎপর সে সব সময়।

চোরাচালানের সাথে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থসংস্থানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। চোরাচালানের মাধ্যমে যাতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন না হতে পারে, সেজন্য আমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সার্বক্ষণিকভাবেই রয়েছে। আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে কার্যকর দৃষ্টি রাখি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

পাশাপাশি শুল্ক বিভাগের প্রতিটি ঘটনায় আমার তৃতীয় চোখ খুঁজে ফেরে কে, কী, কেন, কখন, কীভাবে প্রশ্নের উত্তর। নির্মোহভাবে প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ ও কারণ অনুসন্ধানে সদা তৎপর আমার সে চোখ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কোনো তদন্তের নির্দেশ পেলে অনুসন্ধিৎসু চোখ বের করে আনে ঘটনার আড়ালের প্রকৃত ঘটনা। যথাযথ তদন্ত ও যাচাই করে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়, সম্ভাবনা ও সুযোগের দ্বার উন্মোচন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনে সহযোগিতা করা আমার অন্যতম দায়িত্ব।

আমার তৃতীয় নয়ন ঘুমায় না, জেগে থাকে 'ভ্যানগার্ড' হয়ে। বিশ্বাস করে এ পি জে আবদুল কালাম-এর সেই উক্তি 'আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যা দেখি তা স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন হচ্ছে সেই জিনিস যা

আমাকে ঘুমাতে দেয় না।' আমার তৃতীয় নয়ন স্বপ্ন দেখে চোরাচালান নির্মূল হবে, শুল্ক ফাঁকি বন্ধ হবে, অপঘোষণা রোধ হবে সম্মিলিত কর্মতৎপরতায়, । জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর পণ্য আমদানি রোধ হবে, সঠিক শুল্ক ও কর আহরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব আমরা। গড়ে উঠবে স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ। হৃদয়ে থাকবে মাস্টারদা সূর্যসেনের সাহসী উচ্চারণ 'সব মরে, স্বপ্ন মরে না।'

- লেখক **মোঃ তারেক মাহমুদ**, সহকারী পরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে...
রাজস্ব সুরক্ষায় সদা তৎপর

কাস্টমস গোয়েন্দা

দ্য ওয়ান ম্যান আর্মি

উম্মে নাহিদা আক্তার

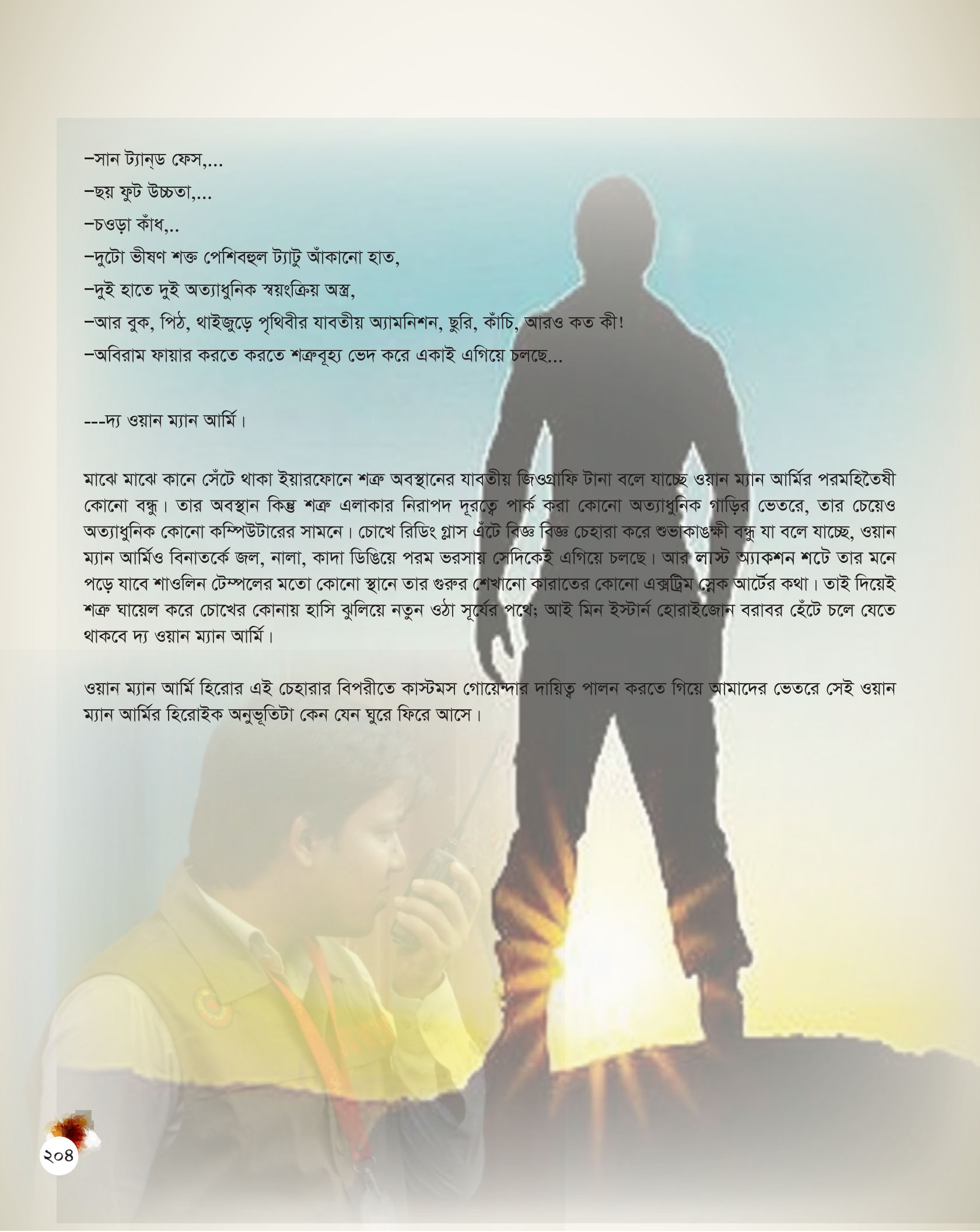

–সান ট্যান্ড ফেস,...

–ছয় ফুট উচ্চতা,...

–চওড়া কাঁধ,..

–দুটো ভীষণ শক্ত পেশিবহুল ট্যাটু আঁকানো হাত,

–দুই হাতে দুই অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র,

–আর বুক, পিঠ, থাইজুড়ে পৃথিবীর যাবতীয় অ্যামনিশন, ছুরি, কাঁচি, আরও কত কী!

–অবিরাম ফায়ার করতে করতে শত্রুবূহ্য ভেদ করে একাই এগিয়ে চলছে...

---দ্য ওয়ান ম্যান আর্মি।

মাঝে মাঝে কানে সেঁটে থাকা ইয়ারফোনে শত্রু অবস্থানের যাবতীয় জিওগ্রাফি টানা বলে যাচ্ছে ওয়ান ম্যান আর্মির পরমহিতৈষী কোনো বন্ধু। তার অবস্থান কিন্তু শত্রু এলাকার নিরাপদ দূরত্বে পার্ক করা কোনো অত্যাধুনিক গাড়ির ভেতরে, তার চেয়েও অত্যাধুনিক কোনো কম্পিউটারের সামনে। চোখে রিডিং গ্লাস এঁটে বিজ্ঞ বিজ্ঞ চেহারা করে শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু যা বলে যাচ্ছে, ওয়ান ম্যান আর্মিও বিনাতর্কে জল, নালা, কাদা ডিঙিয়ে পরম ভরসায় সেদিকেই এগিয়ে চলছে। আর লাস্ট অ্যাকশন শটে তার মনে পড়ে যাবে শাওলিন টেম্পলের মতো কোনো স্থানে তার গুরুর শেখানো কারাতের কোনো এক্সট্রিম স্লেক আর্টের কথা। তাই দিয়েই শত্রু ঘায়েল করে চোখের কোনায় হাসি ঝুলিয়ে নতুন ওঠা সূর্যের পথে; আই মিন ইস্টার্ন হোরাইজোন বরাবর হেঁটে চলে যেতে থাকবে দ্য ওয়ান ম্যান আর্মি।

ওয়ান ম্যান আর্মি হিরোর এই চেহারার বিপরীতে কাস্টমস গোয়েন্দার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের ভেতরে সেই ওয়ান ম্যান আর্মির হিরোইক অনুভূতিটা কেন যেন ঘুরে ফিরে আসে।

কেনই বা আসবে না? যেমন আমার ব্যাপারটিই ধরুন ।

সহকারী পরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা...

ঠিক এই মুহূর্তে কোনো একটি গোয়েন্দা সার্কেলের দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। কাস্টমস কর্মজীবনের শুরুই হয়েছে গোয়েন্দাগিরি দিয়ে। অনেকে এ ব্যাপারটি নিয়ে কৌতুক করে বলেন-'জীবনে টিকটিকিগিরি ছাড়তে পারবে না'। তবে এর বিপরীতে আমার অনুভূতিটা ঠিক এ রকম; গোয়েন্দা সুলভ এই মাইন্ডসেট, এই আউটলুক, বুদ্ধি খরচ করে ঘটনার নেপথ্য ঘটনা বোঝার আকুলতাটা আমি ছাড়তে চাই না।

অফিসার হিসাবে আমার শুরুটা এই কাস্টমস গোয়েন্দায়

-নরম একতাল কাদামাটি থেকে কাস্টমস গোয়েন্দা আমাকে মূর্ত করে তুলেছে...

-আমাকে রূপ দিয়েছে এক ভিন্ন রূপে...

-আমাকে ভাবতে শিখিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নতুন আঙ্গিকে...

-আমাকে ট্রেইন্ড আপ করেছে প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধের জন্য;

-এই যুদ্ধ কাস্টমস সংক্রান্তযাবতীয় অন্যায়, অপরাধ আর চোরাচালানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আমরা সার্বক্ষণিক চোখ রাখি Asycuda-এর স্ক্রিনে। কোথায়, কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটে যাবে বা ঘটতে যাচ্ছে তা আঁচ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাই আমাদের অন্যতম কাজ। কাস্টমস-সংক্রান্ত সবাই কাস্টম হাউসের দায়িত্ব বা কর্মবণ্টন সম্পর্কে জানেন।

-যিনি মাঠ পরীক্ষণ সম্পন্ন করেন তিনি শুল্কায়নের দায়িত্বে থাকেন না।

-আবার যিনি শুল্কায়ন করেন তার মাঠ পরীক্ষণে উপস্থিত থাকার সুযোগ নেই।

- কেবল তাই নয়, যিনি জুতো দেখেন, তিনি সুতো (ফেব্রিক্স) দেখেন না,

- যিনি ফুডস দেখেন তিনি অন্যান্য অনেক গুডস দেখেন না।

সুতরাং, কর্মকর্তা হিসেবে তাদের বিচরণের একটি সীমারেখা আছে। নিজ সীমার ভেতর তারা স্বমহিমায় বিচরণ করে থাকেন। কিন্তু কাস্টমস গোয়েন্দা হিসেবে আমার কোনো সীমারেখা নেই।

এই আমি

- টার্মিনাল বিল্ডিং-এ...,

-তো এই আমি মাঠে...,

-এই মাঠের এক্সামিন করলাম তো...,

-এই আমি লোডিং পয়েন্ট কিংবা ডেলিভারি গেটে....

-মুহূর্তে উঠে যাই ভেলমেটের মাথায় ওজন দেখতে...

-আবার মুহূর্তে ৪০ ফুট কন্টেইনারের শেষ অন্ধকার কোনায়...

- আমার সীমারেখা কোথাও সীমাবদ্ধ নয়...,

-নিজেকে 'ওয়ান ম্যান আর্মি' মনে না হওয়ারও তাই কোনো কারণ নেই।

মধ্যরাত পর্যন্ত কার্টনের পর কার্টন কেটে আমরা ক্লান্ত নই। সন্দেহজনক গতিবিধিসম্পন্ন যেসব কার্টন কেটে চাক্ষুষ পণ্য দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি; তাদের গতিবিধির ওপর ভার্চুয়াল নজরদারি চলে। পণ্যচালানটির চলন যদি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে কোনো কারণেই আইনবাঁধা পথে সম্পন্ন না হয় তখুনি কাস্টমস গোয়েন্দার ডেঞ্জার এলার্ম বাজতে শুরু করে।

- কত খাজনা দেয়ার দরকার ছিল,

- কত দেয়া হয়নি,

- কত টাকা অতিরিক্ত খাজনা আদায় করা সম্ভবপর

ইত্যাদি যাবতীয় হিসাব নিয়ে ছোটবেলার মতো যোগ-বিয়োগ করতে বসি। কন্টেইনার আগমন থেকে কন্টেইনার নির্গমন প্রতিটি ধাপেই আমাদের অবারিত বিচরণ।

শুধু চলাফেরা বা কার্যক্রমই নয়, পুরো কাস্টম হাউসের কোথায় কী হচ্ছে, কিংবা কী হতে যাচ্ছে, হাউসের সাথে তার স্টেকহোল্ডারদের সম্পর্কের কেমিস্ট্রি কেমনভাবে চলছে বা পরিবর্তিত কোনো চলনে মোড় নিচ্ছে কি না তারও দৃশ্য গোয়েন্দার চোখে দেখতে হয়।

সোজা হিসেবে বলতে গেলে,

- কাস্টম হাউসে কবে, কখন, কোন কন্টেইনার, কী পণ্যসহ প্রবেশ করছে;

- ঠিক প্রবেশ মুহূর্তে তার কী স্টাটাস ছিল,

- সেটি বিশাল ইয়ার্ডের কোন স্থানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে,

তার এভরি সিঙ্গেল ডিটেইল আমাদের গোয়েন্দার ঝুলিতে থাকতে হয়। অনেকটা ঠাকুরমার ঝুলির মতো, গল্প বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই... গল্প আর ফুরোয় না।

আমাদের গোয়েন্দা গল্পও তাই ফুরোয় না। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা নিরীহ কন্টেইনারের পেছনেও গোয়েন্দাগিরি করতে হয় ।

- কন্টেইনারটি কেন দাঁড়িয়ে আছে?
– কেন মাঠে তার রহস্য দরজা উন্মোচিত হচ্ছে না?
– কত দিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে?
– এত দিনের পোর্ট ড্যামারেজ হিসাব করেও কত লাভ, কিংবা কী প্রকৃতির লাভ ওই কন্টেইনার হতে আসতে পারে?
ইত্যাদি যাবতীয় শিশুসুলভ প্রশ্ন এই গোয়েন্দা ফরম্যাট দেয়া ব্রেইন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারি না।

শুধু তাই নয়,
– এই নিরীহ কন্টেইনারের সঙ্গী আরও কত আছে, যারা তারই মতো দরজা খোলার অপেক্ষায় দিন গুনছে?
– কাস্টমস অভিজ্ঞতায় অ্যাপ্রোক্সিমেট হিসাবে কোন FCL (Full Container Loaded) কন্টেইনারের সিবিএম হিসাব অনুযায়ী পণ্যের ঘোষণা কত বেশি থাকা উচিত ছিল?
– এই অতিরিক্ত ঘোষণা বহির্ভূত পণ্য হতে ঠিক কত বেশি খাজনা আদায় হতে পারে? এবং
– সেই খাজনা দিয়ে কতটি পদ্মা সেতু বানানো যেত?
এত দূর পর্যন্ত গোয়েন্দা ভাবনা দৌড়াতে থাকে।

কিছু করার নেই, স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে যে কোনো ঘটনার নেপথ্য ঘটনা আর সম্ভাব্য ঘটনা দুটো নিয়েই মাথা ঘামানোর জন্য আমাদের সেভাবে ট্রেইন্ড আপ করা হয়েছে। ***প্রতিনিয়ত যা হচ্ছে তার চেয়েও, যা হতে পারত কিংবা যা হতে যাচ্ছে তা নিয়েই আমাদের ভাবনা বেশি।***
যে কোনো জটিল সিচুয়েশনে, কিংবা যে কোনো জটিল সিদ্ধান্ত নিতে মনে পড়ে যায়, গোয়েন্দা হিসেবে আমরা যাঁর ব্রেইন চাইল্ড তাঁর গুরু মন্ত্রের কথা
- ডেলিকেটলি এবং ডিপ্লোম্যাটিক্যালি সিচুয়েশন হ্যান্ডলিং করতে হবে...
– চুপিসারে অপারেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে...

– যথাসম্ভব, পানিতে ঢেউ না তুলে ঢিল ছোঁড়ার মতো...
– এমন অসম্ভবকে সম্ভব করাই কাস্টমস গোয়েন্দার কাজ !

আমাদের ছোট্ট অ্যানালাইটিক্যাল সেল আছে।
ওয়ান ম্যান আর্মির কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো। ওদের জোড়া জোড়া চোখ রাডারের মতো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত খুঁজে ফেরে Asycuda-এর এক পেজ থেকে অন্য পেজ। কন্টিনিউয়াস রিপোর্টিং কাঁধে ভর করেই কাস্টমস গোয়েন্দা, দ্য ওয়ান ম্যান আর্মির মতো এগিয়ে চলে সামনে।

আমাদের মিশন একটাই...
- রক্ষা করতে হবে দেশকে....
- রক্ষা করতে হবে দেশের অর্থনীতি
- নতুন সূর্যের আলোকরেখা ধরে আমাদের দেশও এগিয়ে যাবে দূর....বহুদূর....
- তার এগিয়ে চলার পথে আমরা.... কাস্টমস গোয়েন্দা...
---- গর্বিত অংশীদার।

- লেখক **উম্মে নাহিদা আক্তার**, সহকারী পরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

গোয়েন্দার চোখ ও একটি কালো পুঁটলি

রাহমান ওয়াহিদ

ডাগর ডাগর চোখ, টানা টানা চোখ, পটলচেরা চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, অন্তর্ভেদী চোখ, মায়া ভরা চোখ-এ রকম কত ধরনের চোখের কথাই না আমরা জানি, দেখেছি। কিন্তু 'গোয়েন্দার চোখ'? এমন চোখের কথা কেউ কি কখনো শুনেছেন? মনে হয় না। এ বড় অদ্ভুত ধরনের চোখ। প্রথম যেদিন এই ধরনের চোখের কথা শুনলাম, সেদিন সত্যিই খুব চমকে উঠেছিলাম। এ যেন চোখের ভেতরে আরেকটি অসাধারণ চোখ-যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যে কারও ভেতরের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত দেখতে পায়। যদিও এটি তদন্ত দপ্তরের নিজস্ব পত্রিকার নাম কিন্তু আমার বিবেচনায় এ নামটি শুধু পত্রিকার পাতার ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকে নি, এটি এ দপ্তরের গোয়েন্দা কার্যক্রমের মূল ফোকাস হিসেবেও প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে নিবন্ধটির পরবর্তী পর্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে আরও কিছু কথা আসবে। তাই এবার শিরোনামের দ্বিতীয় অংশে যেতে চাই। এতে আমার দায়িত্ব পালনকালে ব্যক্তিগত কিছু আশা-নিরাশার কথা বিধৃত হলেও শেষ পর্যন্ত এটি ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনাকে ছাড়িয়ে ছোটখাটো একটি রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা গল্পও হয়ে উঠেছে।

কালো হোক, ধলো হোক, বড় সড় একটা পুঁটলির খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তখন। আমার নিজের জন্য তো বটেই, শুল্ক গোয়েন্দা দপ্তরের জন্যেও বিশেষ করে। এই একটা পুঁটলির জন্য যে কতটা হা-পিত্যেশ করতে হয়েছে আমাকে, তা বোঝানোর মতো নয়। তার আগে পেছনের কিছু কথা না বললেই নয়। কারণ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর তখন আমার কাছে এক অচেনা অধ্যায়। এ অধ্যায়েই কেটেছে আমার চাকরি জীবনের শেষ দু'টি বছর। প্রথম পোস্টিং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সেখানে দায়িত্ব পালনের প্রায় একটি বছরে যে আলো-আঁধারির দেখা মিলেছে, তা-ও কখনো ভুলবার নয়। আজকের এই শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরকে আমরা যে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গকারী ও আশাতীত উজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে দেখে গর্ব অনুভব করছি, তা কিছুদিন আগেও ছিল কল্পনার অতীত। এ কথা সত্যি যে, বড় ধরনের সাফল্য

পাওয়ার আগে অনেক দীর্ঘ রজনী ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে আসতে হয়। এ দপ্তরের ক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছে। সেই আকাশচুম্বি সাফল্য পাওয়ার আগের সেইসব অনুজ্জ্বল দিনগুলোর একজন অসহায় সাক্ষী ও সরকারের বেতনভোগী একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে আমাকে যে আত্মগ্লানিতে ভুগতে হয়েছে তার কিছুটা শেয়ার করা আর সেই সুযোগে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরার ইচ্ছে থেকেই এই নিবন্ধটি লেখার প্রয়াস।

আমার চাকরি জীবনের তেত্রিশটি বছরের মধ্যে একত্রিশ বছরই কেটেছে বিভিন্ন এক্সাইজ/ভ্যাট অফিস ও কাস্টম হাউসগুলোতে। ওইসব অফিসে নির্দিষ্ট একটা পরিসরে কাজ করতে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম পালন করে কর্তৃপক্ষের মন রক্ষা করতে পারলেও গোয়েন্দা দপ্তরে, বিশেষ করে শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে কাজের ধরন দেখে এত বেশি অসহায় বোধ করতে থাকলাম যে, এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল-চাকরিটা হয়তো সম্মানের সাথে শেষ করতে পারব না। কারণ, একত্রিশটা বছরে যা করে এসেছি এ দপ্তরে এসে সেই অভিজ্ঞতা কোনো কাজেই আসছিল না। মনে হচ্ছিল নতুন চাকরিতে ঢুকেছি। যদিও বছর চারেক আগে এই বিমানবন্দরেই কাস্টমস ইনস্পেক্টর হিসেবে সাত মাস চাকরি করে গিয়েছিলাম, তবুও গোয়েন্দা কার্যক্রমের সাথে সেই অভিজ্ঞতাকে মেলাতে পারছিলাম না। বিশেষ করে কাজের ধরনটা। সেটা ছিল মূলত কাস্টমস বা অন্য কারও মাধ্যমে চোরাচালান বা শুল্ক ফাঁকি/অনিয়ম সংঘটিত হলে তা উদঘাটন করা, প্রয়োজনে মামলা করা ইত্যাদি। তার মানে এখানে চোখ কান খোলা রেখে কর্মরত সবার ওপর ছড়ি ঘোরানোর কাজ। কিন্তু কীভাবে তা করা যাবে? সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে আমি তখন একা। মাথার ওপর একজন রাজস্ব কর্মকর্তা আর সঙ্গে একজন সিপাই। আমার দুর্ভাগ্য যে, এ দুজনের কারও কাছ থেকেই কাঙ্ক্ষিত অনিয়ম উদঘাটনের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলাম না। পূর্বসুরি দুজন সহকর্মীর বিগত এক বছরের মাসিক পারফরমেন্স রিপোর্ট দেখেও হতাশ হলাম। কিছু মদের বোতল, কিছু সিগারেটের কার্টন আর দু একটি এল সিডি টিভি আটক ছাড়া স্বর্ণ বা এ ধরনের মূল্যবান সামগ্রী চোরাচালান বা বড় ধরনের শুল্ক ফাঁকি উদঘাটনের কোন রিপোর্টই নেই। অথচ প্রতিদিনই কানে আসছিল অঢেল স্বর্ণ আসছে, সিগারেট আসছে, মাদক আসছে আর সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বা কারো যোগসাজশে সেগুলো অবাধে চলে যাচ্ছে।

ভাবতে অবাক লাগছিল এত এত সরকারি এজেন্সি, কাস্টমস এর এতসব কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকতে এসব কথিত চোরাচালান সম্ভব হয় কীভাবে? সত্যি না গুজব-সেটাই বা যাচাই করা যাবে কী করে? মগজের ঝুলিতে তো এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত নেই। দু তিন মাস কেটে গেল-অথচ গোয়েন্দাগিরির কিছুই দেখাতে পারলাম না। তাহলে আমি করছি টা কি? এমন অসহায়ের মতো চাকরি তো কখনো করি নি। এদিকে হেড অফিস থেকে বার বার তাগিদ আসছে বড় বড় কেস চাই। কিন্তু কোথায় পাবো সে ধরনের কেস? কীভাবে পাবো? বিবেকের দংশন তো আছেই তার ওপর এত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়েও বেকুব বনে যাওয়ার লজ্জা

আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। পরিচিত অপরিচিত যাকেই সামনে পাচ্ছিলাম তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে জানবার চেষ্টা করছিলাম বড় ধরনের মামলার সূত্রটা কী। কিন্তু সবাই কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন প্রশ্নটি। আগে গোয়েন্দায় কাজ করেছেন এমন অফিসারদের পরামর্শমতো কাজ করেও কোনো ফল পাচ্ছিলাম না। কাজেই আমাকে ধরেই নিতে হলো কারো কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার কোন আশা নেই। যা করার একাই করতে হবে। বিদ্যে-বুদ্ধি যেটুকু আছে, তা নিয়েই আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকলাম। রবি ঠাকুরের সেই কথাটিও মাথায় রাখলাম 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিবে তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন'। তাতে কিছু যে হলো না, তা নয়। চোখ কান খোলা রাখতে রাখতে এটা অন্ততঃ আন্দাজ করতে পারছিলাম যে, খুব কৌশলে কারও অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে কিছু না কিছু অঘটন ঘটছে। কিন্তু ঘটলেই বা কী? হাতেনাতে ধরতে না পারলে তো কোনো প্রমাণ মিলবে না। একা আমি ক'দিকেই বা নজর রাখতে পারি? নিচে উপরে পুরো বিমানবন্দর ঘুরে ঘুরে চোরাচালানের যে সম্ভাব্য সাত/আটটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লক্ষ্য করেছি সেখানে একা একজনের পক্ষে যত চেষ্টাই করা হোক তাতে যে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাবে না, তার সত্যতা পরবর্তীতে বিশেষ টিমের তৎপরতাতেই প্রমাণিত হয়েছে। ততদিনে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে তা হলো বড় মামলা পেতে হলে, হয় বড় অঙ্কের টাকার বিনিময়ে সোর্স জোগাড় করতে হবে, নয়তো চোরাচালানের সম্ভাব্য সবগুলো পয়েন্টে কড়া নজরদারি রাখতে হবে। এ দুটো ক্ষেত্রে আমার যে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ছিল, তা বলাই বাহুল্য। আমি যেটা করতে পেরেছি সেটা হলো সন্দেহভাজন যাত্রীর পাসপোর্ট দেখে তাঁর ফ্রিকোয়েন্ট ভিজিট পরীক্ষা, প্রয়োজনে তাঁর লাগেজ চেক ও দেহ তল্লাশি করা। এতেও কোনো ফল পাওয়া যায় নি, তার কারণ, কাকে সন্দেহ করতে হবে, পাসপোর্টে কিছু না পেলে আর কী দেখে সন্দেহ করা যাবে তখনও পর্যন্ত সেই কৌশলের চোখ আমার তৈরি হয় নি পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবে। এখনো যে তৈরি হয়েছে, তা ও বলা যাবে না। অন্য দুই শিফ্‌ট এর গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের অবস্থাও ছিল আমার মতোই শোচনীয়। তাই আবারো এসে যাচ্ছে সেই 'গোয়েন্দার চোখ' এর বিষয়টি। সাফল্য পেতে হলে এ ধরনের অসাধারণ চোখের কোনো বিকল্প নেই। গোয়েন্দার চোখ মানেই তো অনুসন্ধিৎসু চোখ, অন্তর্ভেদী চোখ, লক্ষ্যবস্তুতে স্থির নিবদ্ধ চোখ। এক ঝাঁক হরিণের মধ্যে ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন একটি মাত্র হরিণকেই টার্গেট করে ধাওয়া করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফল হয়, একজন গোয়েন্দাকর্মীর চোখও হতে হয় সেই বাঘের চোখের মতোই তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ। এ ধরনের চোখ নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া যারা আমার মতো এ দপ্তরে বদলি হয়ে আসেন, তাঁরা তো আকাশ থেকে পড়েন। আর এ দপ্তরের কাজের যে বৈশিষ্ট্য তাতে প্রথম থেকেই প্রয়োজন হয় গোয়েন্দার চোখ। কিন্তু সেই চোখ যে রাতারাতি তৈরি করা সম্ভব হয় না, সেটাও এক বাস্তবতা। এজন্য চাই অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ।

'বিশেষ' কথাটি এজন্যেই বলা যে, চোরাচালান সংঘটন বা শুল্ক ফাঁকির ক্ষেত্রে ঘন ঘন যে কৌশল/পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় বা হচ্ছে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার মতো

গোয়েন্দা কৌশল উদ্ভাবন ও তার যথার্থ প্রয়োগে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। মাঝে মধ্যে যে ইন হাউস ট্রেনিং এবং চট্টগ্রামে ট্রেনিং একাডেমিতে যে ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয় তাতে যে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা আগে বলেছি তার ঘাটতি টা থেকেই যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্যেই আমার প্রস্তাব হলো গোয়েন্দা দপ্তরের অধীনে 'শুল্ক গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নামে পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক। প্রস্তাবিত এই প্রতিষ্ঠানে বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ প্রদান তথা গোয়েন্দার চোখ তৈরির প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এটি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য ও ধীশক্তি সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী (আমাদের মতো বোকা বোকা চোখ ওয়ালাদের বাদ দিয়ে) বাছাই করে তাদের এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে যে চৌকস ও দক্ষ গোয়েন্দা চোখের দল তৈরি হবে তাদের যে কোন গোয়েন্দা কার্যক্রমে ব্যবহার করে দ্রুত ফিডব্যাক পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়া, ইতোমধ্যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা যেসব গোয়েন্দা চোখের সহকর্মীদের ঘাম ঝরানো অনন্য অবদানের জন্য ডিপার্টমেন্টের আজকের এই ঈর্ষণীয় সাফল্য, তাঁরা অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে, তা পূরণের জন্য এবং এই সাফল্য ধরে রাখতে হলেও এ ধরনের একটি দক্ষ টিম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

যাহোক, আবারো ফিরে যাই সেই কষ্টের জায়গাটিতে। আগের চার মাসে কিছুই করতে না পারার যে মর্মবেদনা আমাকে সইতে হচ্ছিল, তার মধ্যেই ঘটলো বজ্রপাতের মতো একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। কাস্টমস অফিসাররা সবাইকে চমকে দিয়ে তিন তিনটি মণ স্বর্ণ আটক করে ফেললেন। সারা দেশে পড়ে গেল প্রচণ্ড হৈ চৈ। আর আমার হতাশার আগুনেও পড়ল আরেক দফা গ্লানির ঘি। এ ঘটনা কানে যেতেই তদানিন্তন ডিজি মহোদয় দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমাদের অফিসাররা কী এই আটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না?' (একজন কর্মকর্তার মুখে শোনা) উত্তরটা স্বাভাবিকভাবেই ছিল নেতিবাচক। কারণ কাস্টমস তো তাদের মামলায় আমাদেরকে কখনই সংশ্লিষ্ট করেন না। তবু ভয় পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, ভীষণ রাগী ডিজি স্যার হয়তো আমাদের ডেকে নিয়ে এই ব্যর্থতার জন্য বকাঝকা করে দূরে কোথাও বদলি করে দিতে পারেন। কিন্তু সে ধরনের কিছু হলো না। তবে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কিনা জানি না, ডিজি মহোদয় বিমানবন্দরে চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য একটি বিশেষ টিম গঠন করে দিলেন। তার কিছুদিন আগে সহকারী পরিচালক জনাব রাশিদুল হাসান আইসিডি থেকে বিমানবন্দরের তিন শিফট এর দায়িত্ব নিয়ে বিমানবন্দরে বদলি হয়ে এলেন। তিনি আসাতে আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। তাঁর সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। তাঁকে বললাম, 'স্যার,আপনার অনেক অভিজ্ঞতা। একটা বড় কেস এর জন্য আমাকে যা যা করতে হবে বলুন, আমি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবো। ভীষণ একটা গ্লানিতে ভুগছি আমি।' স্যার আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'চিন্তা করো না। শিগগিরই একটা বড় কেস পেয়ে যেতে পারি।' আমি অনেকটাই আশ্বস্ত হলাম। ইতোমধ্যে ডিডিআই মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের নেতৃত্বে বিশেষ টিম প্রথম অভিযানেই (তারিখটা ৩০.৭.১৩) স্বর্ণ আটকের তিনটি মামলা করে ফেললেন।

তা-ও আমার শিফটেই। এতদিন এ ধরনের মামলার যে খরা চলছিল তা কেটে যেতে শুরু হলো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই অভিযানেই আমি মুস্তাফিজ স্যারকে প্রথম দেখলাম। আইন কানুনে এত দক্ষ, এত পরিশ্রমী আর এত চৌকস অফিসার সারা জীবনে খুব কমই দেখেছি। প্রথম দেখাতেই তাঁর প্রতি আমার এত আস্থা জন্মালো যে, তাঁর ডিকটেশনে লেখা আমার জীবনের প্রথম এজাহারে কিছু না পড়েই বাদী হিসেবে স্বাক্ষর করেছি। তারপর থেকে স্যারও আমাকে জানি না কেন নির্ভরযোগ্য অফিসার হিসেবে মূল্যায়ন করতে শুরু করেন এবং চাকরির শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালো জেনেছেন। এটাও আমার একটি বড় পাওয়া। যাহোক, পুরো এক মাস ধরে বিশেষ টিমের অভিযান চলেছে, উল্লেখযোগ্য স্বর্ণবার আটকও হয়েছে, যদিও তা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্ট হবার মতো যথেষ্ট ছিল না। আর আমি যে পুরোপুরি খুশি হতে পারছিলাম না তার কারণ, স্বর্ণ আটকে আমি তখনও কেবলই সহায়তাকারীর ভূমিকায়। অর্থাৎ নিজে স্বর্ণ ধরার ক্রেডিটটি তখনও আমি অর্জন করতে পারিনি বলে মনে একটা দুঃখ কাজ করছিল। সহকারী পরিচালক রাশিদুল স্যারকে দুঃখটা জানালাম। তিনি আগের মতোই আবারো আমাকে আশ্বস্ত করলেন। শুধু একটি কথা যোগ করে বললেন, 'ফোনটা খোলা রেখো। দিনে বা রাতের যে কোনো সময় কল দিলেই চলে আসবে।' আমার বাসাটা উত্তরায় বলে খুব অল্প সময়ের নোটিশে এয়ারপোর্টে উপস্থিত হওয়ার সুযোগটা ছিল।

অপেক্ষার পালা যেন আর শেষ হয় না। আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু পরের দিনই যে চমকটা অপেক্ষা করছিল সেটা রাতেও বুঝতে পারিনি। স্যার বুঝতে দেনও নি। পরের দিন ৩০ আগস্ট, ২০১৩। সেদিন ছিল আমার দিনে ডিউটি। নয়টায় শুরু হবে। ভোরে ঘুম ভাঙলেও একটু দেরিতে উঠবো ভেবেছিলাম। তখন সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা। হঠাৎ রাশিদুল স্যারের কল এল। বললেন, 'আটটার মধ্যে চলে এসো।' আমি তড়িঘড়ি করে দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। রিক্সায় বিশ মিনিটের পথ। এয়ারপোর্টে পৌঁছেই ফোনে স্যারের অবস্থান জেনে নিলাম। স্যার তখন ৩ ও ৪ নম্বর বোর্ডিং ব্রিজ এর মাঝামাঝি জায়গায় মোবাইলে নিচু স্বরে কথা বলছিলেন আর অস্থির মনে পায়চারী করছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'আমার সাথে সাথে থাকো আর চারপাশে লোকজনের চলাফেরা লক্ষ্য করো।' সময় বয়ে যায়। আমার ভেতরে তখন আনন্দ মিশ্রিত ভীষণ এক উত্তেজনা। আবার ভয়ও ছিল যে, কেসটা হাতছাড়া হয়ে যাবে না তো! এদিকে গতকাল ডিজি মহোদয় (খন্দকার আমিনুর রহমান স্যার) বদলি হয়ে দায়িত্ব দিয়ে চলে গেছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ড. মইনুল খান স্যার। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ঘড়ির কাঁটা তখন পৌণে ন'টা ছুঁই ছুঁই করছে। স্যার হঠাৎ আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বললেন, 'নিচে চল'। আমি আর স্যার। আর কেউ নেই। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে উল্টো দিকের গেট দিয়ে সোজা রানওয়ের পূর্ব প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। স্যারের দৃষ্টি তখন সামনের দিকে। তাঁর মুখে কথা নেই। এপিবিএন এর এক পুলিশ এগিয়ে এল। স্যার তাঁর সাথে টুকটাক কথা বলছেন আর বেশ কিছুটা দূরে ৯ নম্বর বে'তে দাঁড়িয়ে থাকা ইউনাইটেড এয়ার লাইন্স এর একটি বিমানের দিকে লক্ষ্য রাখছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না স্যার আসলে কীসের অপেক্ষা করছেন।

এই বিশাল রানওয়ের মধ্যে সোনা পাওয়া যাবে কীভাবে? উত্তর পেতে দেরি হলো না। ওই বিমানের গোড়া থেকে দুটো যাত্রীবাহী বাস ছেড়ে আমাদের দিকে আসতে দেখেই স্যার আমাকে পেছনে টেনে এনে বললেন,'শোনো, ওই যে দুটো বাস আসছে তার প্রথমটি সার্চ করবো আমি আর পরেরটি করবে তুমি। খুব ভালো করে দেখে আমাকে ডাকবে। 'কিছুক্ষণের মধ্যে দুটো বাসই এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। স্যার প্রথম বাসটির গেটের কাছে দাঁড়ালেন। আর আমি পরেরটার গেটে। যাত্রীরা একে একে নেমে সামনের গেট দিয়ে পোর্টের ভেতরে চলে গেলেন। প্রায় একই সময়ে দুটো বাসই খালি হয়ে গেল। স্যার ও আমি একই সময়ে বাসে উঠে পড়লাম। আমি উঠেই কী যেন ভেবে বাঁ দিকের বন্ধ গেটের দিকে গেলাম। গেটের নিচের দিকে খানিকটা গর্ত। সেখানে একটা ছোট ড্রামের ওপর রাখা কালো একটা পুঁটলি চোখে পড়ে। প্রথমে পুটলিটাকে কোনো গুরুত্ব দেই নি। ভেবেছিলাম-ড্রামটির নিচে কিছু থাকতে পারে। এই ভেবে পুঁটলিটা সরাতে গিয়েই অনুভব করি ভীষণ ভারী সেটা। পুঁটলির মুখটা বাঁধা। গায়ে হাত দিয়ে টিপতেই বুঝতে পারলাম-সোনার বার'এর মতো কিছু একটা। আমি তখনও নিশ্চিত না যে, এটাই সেই আরাধ্য ধন। পেছনে তাকাতেই দেখি স্যার দাঁড়িয়ে। মিটিমিটি হেসে বললেন, 'আরে পাগল, দেখছ কি? ওটাই তো সেটা। টেনে তোলো তাড়াতড়ি।' আমি তো হতবাক! সোনা পেয়ে গেলাম তাহলে?! তা-ও একেবারে হাতের মুঠোয়! বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কিন্তু স্যারকে নিশ্চিন্ত দেখে আস্থা ফিরে পেলাম। প্রচণ্ড উত্তেজনা আর আনন্দে কাঁপছিলাম তখন আমি। বিশ কেজির মতো ওজনের সোনার পুঁটলিটা টেনে তুলতে তুলতে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ***আমি যেন আমার ডিপার্টমেন্টের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকেই টেনে তুলছি।*** বাসের ড্রাইভারসহ পুঁটলিটা পোর্টের ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম যদিও কৃতিত্বটা সম্পূর্ণ স্যারেরই, তবুও তিনি যে শুধু আমাকেই সঙ্গে নিয়ে এত বড় একটা কেস'এ সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিলেন এবং সেই সাথে 'সোনা উদ্ধারে কিছুই করতে পারলাম না' এমন একটা আত্মগ্লানি থেকেও আমাকে মুক্ত করলেন, সেজন্যে তাঁকে মনে মনে জানালাম অশেষ কৃতজ্ঞতা। তারপর যথারীতি পুঁটলি খুলে পাওয়া গেল ১৮ কেজিরও বেশি ওজনের ১৫৫ টি স্বর্ণের বার। খবর পেয়ে আমাদের সবাই আসতে শুরু করেছেন। এলেন আমাদের নতুন ডিজি মহোদয়ও। সবার চোখেমুখেই যেন আনন্দের ঝলকানি! এল মিডিয়ার কয়েকটি দল। সারি সারি স্বর্ণের বার'এর ওপর ক্যামেরার আলো ঝলসে উঠলো। সুনাম ছড়িয়ে পড়ে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরের, যে নামটি এতদিন অনেক মিডিয়ার জানাই ছিল না। সবচেয়ে যে কথাটি সবার মুখে মুখে শোনা গেল, তা হলো, 'ডিজি মইনুল খান যেন সোনার ভাগ্য নিয়েই শুল্ক গোয়েন্দায় এসেছেন। এসেই একেবারে বাজিমাৎ করে ফেললেন!' ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করার মতো সাফল্যের অগ্রযাত্রাও শুরু হলো সেই কালো পুঁটলি থেকেই...।

- লেখক **মো. ওয়াহিদুর রহমান**, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর *(তিনি রাহমান ওয়াহিদ নামে লেখালেখি করে থাকেন)*

রাজস্ব আহরণে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির ভূমিকা

মো. হেলাল হাওলাদার

আমাদের সালাম স্যার। নাম ডাক ছিল খুবই তাঁর। বিশেষ করে তাঁর রসায়নের প্রাকটিক্যাল ক্লাস ছিল আমাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। কীভাবে কোনো অজানা পদার্থ সহজে শনাক্ত করা যায় অতি সহজে তার টিপ্‌স দিতেন তিনি। কীভাবে হাতে ঘষেই অ্যামোনিয়াম লবণ বলে দেয়া যায়, কীভাবে বর্ণ দেখে অবস্থান্তর মৌলগুলি চেনা যায়, এসব আমাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। এইচএসসি রসায়নের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় আমাদের সবার ধারণা ছিল, যে নমুনাই দেয়া হোক না কেন সালাম স্যারের পদ্ধতি ব্যবহার করে সহজেই আমরা মৌল শনাক্ত করতে পারব।

একবার সালাম স্যারকে নিয়ে ঘটল এক মজার ঘটনা। ঘটনাটি যদিও পারিবারিক কিন্তু স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ুয়া আমার বন্ধুরাই প্রথমে জেনে ক্লাসে ফাঁস করে দিয়েছিল। তা হলো একবার স্যার অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের সাথে ভ্রমণসঙ্গী হয়ে গেলেন শিল্প ও শিক্ষাসফরে। কক্সবাজার থেকে কিনে আনলেন চারটি মুক্তার মালা। এর মধ্যে সাদা মালাটি স্যারের ছোট মেয়ের বেশি পছন্দ। এ জন্য সাদা মালাটিই সে বেছে নিল। কিন্তু বিপত্তি ঘটল মালাটি মুক্তার কি না? কেউ কেউ বলল, এটি মুক্তার মালা না। আবার কেউ কেউ বলল খাঁটি মুক্তার না। স্যারের মেয়ে বায়না ধরল মালাটি খাঁটি মুক্তার কি না তা পরীক্ষা করতে। অনেক পীড়াপীড়ির পর স্যার মালাটি নিলেন এবং পাঁচটি পুঁতি খুলে পরীক্ষা করে দেখলেন মূল উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বনেট। কিন্তু চুনাপাথরও ক্যালসিয়াম কার্বনেট। খবরটি পদার্থ বিজ্ঞানের জালাল স্যারের কানে গেল । তিনি বললেন, একই ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে চুনাপাথর, মোজাইক পাথর, লাইম স্টোন, এমনকি শামুক ও ঝিনুক ইত্যাদির খোলস তৈরি হলেও সবগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব, উজ্জ্বলতা এবং ভৌতধর্ম একই হয় না। ফলে শুধু কেমিক্যাল টেস্টের মাধ্যমেই কোনো পদার্থের সঠিকতা নির্ণয় করা যায় না।

এজন্য পদার্থটির ভৌতগঠন ও তার সাথে মিশ্রিত অন্যান্য পদার্থের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বিপত্তি বাধল স্যারের মেয়ের ওই পাঁচটি পুঁতি চাই- ই। পাঁচটি পুঁতি কেন নষ্ট করা হলো তার কৈফিয়ত তলব করা হতো বার বার। সেই থেকে ক্লাসে স্যারের নাম হলো মুক্তা স্যার। এটি ছিল সালাম স্যারের একান্ত পারিবারিক ঘটনা। কিন্তু যদি কোনো কেমিস্ট-এর এমন ধরনের ঘটনা পারিবারিকভাবে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হয় তাহলে কেমন হবে?

কাস্টম হাউসের ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কেমিস্টদের এ ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় অহরহ। সরকার সঠিকভাবে শুল্ক আদায়ের জন্য বিভিন্ন কাস্টম হাউসে স্থাপন করেছে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি। যেখানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির পরীক্ষা করা হয় এবং অপঘোষণাকৃত পণ্যগুলির সঠিক এইচ এস কোড নির্দেশনার মাধ্যমে শুল্ক আদায় করা হয়। অনেক সময় পণ্যের অপঘোষণা এমনভাবে করা হয় যে, পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন হয়। যেমন- ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিনকে অ্যামাইনো রেজিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু অ্যামাইনো রেজিন অনেক প্রকার হয়। ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিন, থায়ো ইউরিয়া রেজিন, ম্যালামাইন রেজিন-এ সবগুলিই অ্যামাইনো রেজিন। কিন্তু ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিনের রয়েছে একটি নিদিষ্ট এইচ এস কোড, যার শুল্কহার ২৫% এবং অন্যান্য অ্যামাইনো রেজিনের শুল্কহার ৫%। ফলে কাস্টম হাউস ভিন্ন অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রেরণ করে যদি জানতে চাওয়া হয় প্রেরিত নমুনাটি অ্যামাইনো রেজিন কি না? তাহলে উত্তর হওয়া স্বাভাবিক যে, নমুনাটি অ্যামাইনো রেজিন। কিন্তু ভুলটা হয় শুল্কসংক্রান্ত আইন ও এইচ এস কোড সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে। এ জন্য স্বাভাবিকভাবেই অনেকে মনে করেন একই পদার্থের দুটি ভিন্ন রিপোর্ট হলো কেন? এমন ধরনের হাজারো প্রকারের সমস্যায় পড়তে হয় কাস্টম হাউসে কর্মরত কেমিস্টদের। যেমন- ধরুন কোনো পিভিসি ফিল্ম যদি ব্লিস্টার প্যাকেজিং এর জন্য হয়, তাহলে শুল্কহার ১০%, যদি পিভিসি শিট হয়, তাহলে শুল্কহার ২৫%। আবার পিভিসি শিট যদি রি-ইন-ফোর্স করা হয়, তাহলে শুল্কহার ২৫% ও সম্পূরক শুল্কহার ২০%। এসব পার্থক্যগুলো শুল্ক সম্পর্কিত আইন ও এইচ এস কোড সম্পর্কে সঠিক ধারণা

না থাকলে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। কাস্টম হাউসের ল্যাবরেটরিগুলো অপঘোষণা শনাক্তকরণ ও সঠিক এইচ এস কোড নির্দেশনার মাধ্যমে সরকারের জাতীয় রাজস্ব আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং স্বল্প সময়ে টেস্ট রিপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত শুল্ক আহরণে সহায়তা করে।

সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট আমদানিকৃত ফলের ক্ষতিকর রাসায়নিকদ্রব্য পরীক্ষার জন্য সব কাস্টম হাউস ও শুল্ক স্টেশনে ল্যাবরেটরি স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি বাস্তবায়ন করা সময় সাপেক্ষ হলেও অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমদানিকৃত ফল ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও সকল প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা করে আমদানি করা উচিত।

আবার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে কোন পণ্য রপ্তানি করা সময় সাপেক্ষ হওয়ায় অনেক সময় পরীক্ষা ছাড়াই পণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। তবে সেক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সকল দেশে রপ্তানি করা হয় সে সকল দেশ সকল প্রকার পরীক্ষা না করে আমদানি করেনা। ফলে অনেক সময় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা খাদ্যদ্রব্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মাঝে মাঝে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক হিমায়িত চিংড়ি, পান ইত্যাদিতে স্যালমোনিলা থাকার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু এ সকল পণ্য যদি সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে এবং পরীক্ষা করার পর রপ্তানি করা হয় তাহলে হয়তো নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়বে না।

কাস্টম হাউস ও শুল্ক স্টেশনসমূহে উপযোগী ল্যাবরেটরি থাকলে স্বল্প সময়ে এ সকল পণ্য পরীক্ষা করা সম্ভবপর হতে পারে। এ কারণে কাস্টম হাউস ও শুল্ক স্টেশনসমূহে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন।

- লেখক **মো. হেলাল হাসান**, সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, মংলা কাস্টম হাউস, খুলনা

9

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর